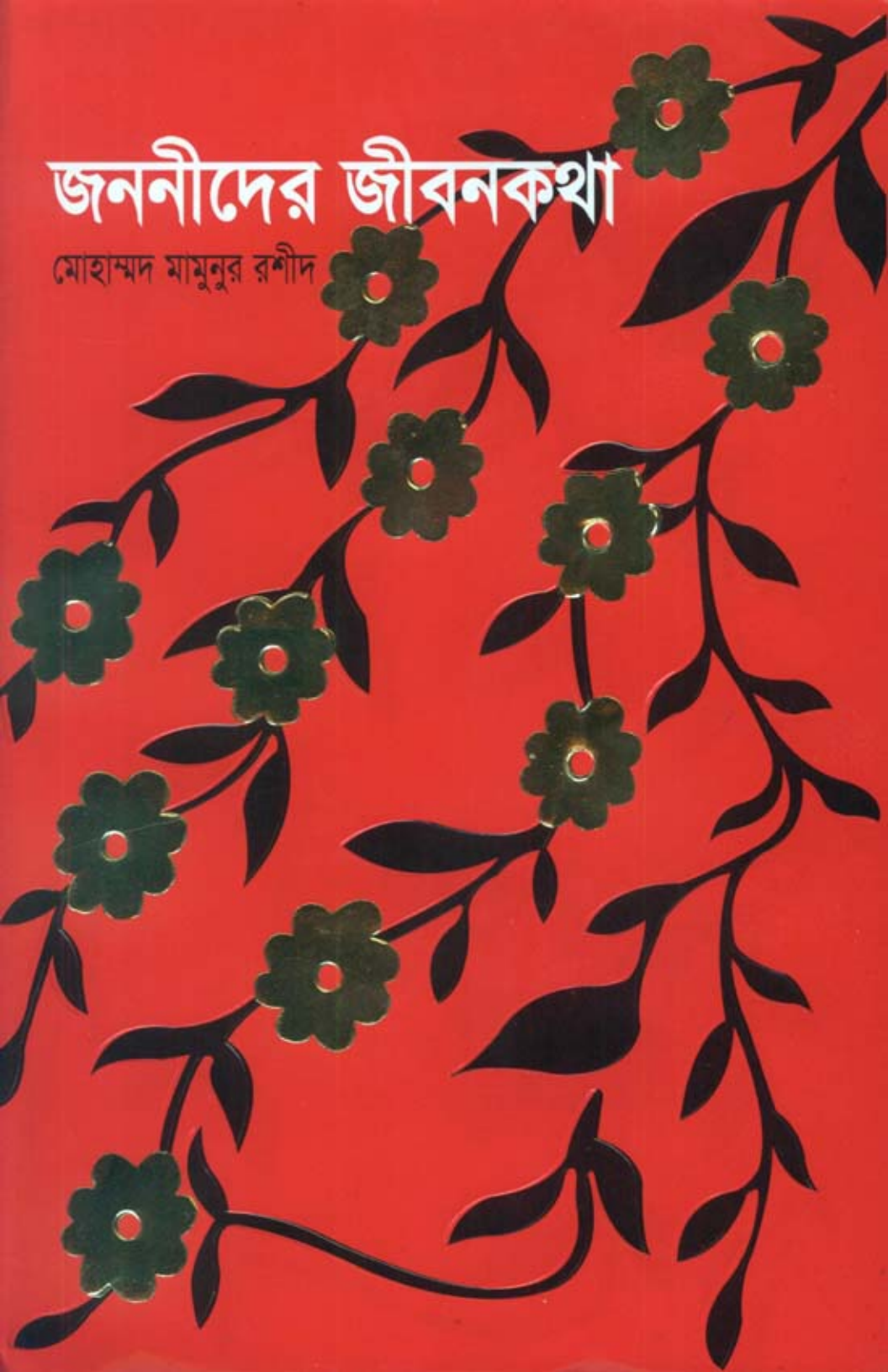
জননীদের জীবনকথা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ



জননীদের জীবনকথা

জননীদের জীবনকথা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

জননীদের জীবনকথা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১২ ইং

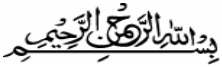
প্রচ্ছদ
সাবৃনা

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০।
ফোনঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
১৭০/- (একশত সত্তর) টাকা

Jananider Jibankatha: Written by Mohammad Mamunur Rashid and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk. 170.00 US $ 10

ISBN 984-70240-0064-3



মাতৃহীন পৃথিবী অবশ্যই অশ্রুময়। আমরা যারা পরে পৃথিবীতে এসেছি, তারা তো জন্মপূর্ব থেকে এবং জন্ম থেকে ওই অশ্রুময়তার বিষণ্ন চাদর দ্বারা আমাদের সত্তাগুলোকে আবৃত করে আছি। আর আমরা একথাও জানি যে, আমাদের অশ্রুময়তার অবসান এখানে ঘটবে না। আমরা আমাদের কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বৃদ্ধত্ব একে একে পার হয়ে যাবো— কিন্তু মাতৃমিলনের শুভক্ষণ কখনো পাবো না।

একজন মানুষের সামনে আর কোন্ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থাকে— মৃত্যু ছাড়া? অথচ সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট এই কথাটা আমাদের মনে থাকে না। মৃত্যুর পরেও রয়েছে ভয়াবহ সব ঘটনা। সমাধির প্রশ্নোত্তর পর্ব, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব, হিসাব, মীযান, পুলসিরাত, চিরস্থায়ী জীবনের স্থান নির্ধারণ। ওই সময় পাপিষ্ঠদের পাশে তাদের জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহের আর্তি নিয়ে যিনি দণ্ডায়মান হবেন, তিনিই যে আমাদের আপনতম ও প্রিয়তম— এই কথাটা কি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে মনে রাখতে হবে না?

আমাদের সকল খ্যাতি ও কৃতি, অর্জন ও উপার্জন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে— প্রবৃত্তিপিষ্টতার কারণে, পৃথিবীপ্রসক্তির কারণে এবং শয়তানের প্ররোচনাপ্রভাবিত হবার কারণে। আমরা বিশ্বাস ও ভালোবাসার দাবি পূর্ণ করতে পারছি না। এখনো বুঝতে পারছি না তাঁকে, যিনি বলেছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাসী হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জীবন-সম্পদ এবং সকল প্রিয়বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।

মহাবাণীতে নির্দেশ করা হয়েছে— বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' সুতরাং ভালোবাসার বিষয়টিই প্রধান বিষয়। মানুষ যাকে ভালোবাসে, তাকেই বিশ্বাস করে। নির্ভর করে তারই উপর। চাওয়া, পাওয়ার লক্ষ্যও থাকে তারই প্রতি। ভালোবাসা ছাড়া অনুসরণপ্রবৃত্তিও প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেতে পারে না। একটি কবিতায় বলা হয়েছে—

যে জন যাহার প্রেমে নিমজ্জিত হয়
সে জন তাহার বাধ্য হইবে নিশ্চয়।

প্রিয়তমজনকে তো ভালোবাসতেই হবে, তার সঙ্গে তিনি যাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদেরকেও ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার পূর্ণ ও প্রকৃত রূপ এরকমই। তাই আমাদেরকে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদের আপনতম ও প্রিয়তম নবীকে যেমন ভালোবাসতে হবে, তেমনি ভালোবাসতে হবে তাঁর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ (মোহেব ও মাহবুব)গণকে।

এ বিষয়টি নিশ্চয় সুপ্রমাণিত যে, মহানবী স. তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ, জীবনসঙ্গিনীগণ এবং সহচরগণকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। অতএব তাঁদেরকেও ভালোবাসতে হবে। তাঁরা আসক্তা রসুলপ্রেমে চিরনিমজ্জিত। পবিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন তাঁরা। মহানবী স. এর জীবনসঙ্গিনীগণকে তাই বলা হয় পবিত্র সহধর্মিণীগণ (আয্ওয়াজুম মুত্বহ্হারাহ)। আর তাঁরা আমাদের কে, সেকথাও আল্লাহ্পাক বলে দিয়েছেন এভাবে— 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলা হয়েছে, বিশ্বাসবানগণের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার চেয়ে নবীগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মতের ঘনিষ্ঠতা অধিকতর সুদৃঢ়। এ কারণেই তাঁদের আদেশ তাঁদের বিশ্বাসবান অনুসারীদের জন্য অবশ্যপালনীয়। জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী পিতামাতার আদেশ নবীর নির্দেশের পরিপন্থী হলে তা প্রত্যাখ্যান করাও অনিবার্য। হজরত ইবনে আব্বাস ও আতা বলেছেন, রসুল স. এর আদেশের বিপরীত প্রবৃত্তি অবশ্য পরিহরণীয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। প্রত্যাদিষ্ট না হয়ে তিনি কোনো নির্দেশ প্রদান করেন না। আরও বলা হয়েছে, যারা রসুলপ্রেমিক নয়, তারা ইমানদারও নয়। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সকল নবী-রসুল তাঁদের আপন আপন উম্মতের পিতাসদৃশ, আর তাঁদের সহধর্মিণীগণ তাদের মাতা।

মহানবী স. এই শিক্ষা বাস্তবেও দিয়েছেন। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক মুমিনজননীকে বিবাহ করার পর তিনি তাঁর চাদর ঝেড়ে কিছুসংখ্যক খেজুর বের করলেন এবং উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, খাও। তোমাদের মায়ের বিবাহের ওলীমা খাও।

হজরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন, চার দল লোককে দ্বিতীয়বার পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁদের একটি দল হচ্ছে রসুলুল্লাহ্র স্ত্রীগণ।

ইবনে আবী আওয়াফা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালকের কাছে এই মর্মে দোয়া করেছি যে, আমি আমার উম্মতের যে পরিবারে বিবাহ করি এবং যে আমার পরিবারে বিবাহ করে, তারা যেনো জান্নাতে আমার সাথে বসবাস করে। আল্লাহ্পাক আমার এই দোয়া কবুল করেছেন।

উম্মতজননীগণের পবিত্র মর্যাদাকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, সাহাবীগণের আমল থেকে সে শিক্ষাও আমরা পাই। যেমন— হজরত ইকরামা রা. বর্ণনা করেছেন, একদিন ফজরের নামাজের পর হজরত ইবনে আব্বাস রা.কে বলা হলো, রসুলুল্লাহ্র অমুক স্ত্রী পরলোকগমন করেছেন। এই সংবাদ শুনে তিনি কিছু নামাজ পাঠ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এ সময় আপনি কোন নামাজ পড়লেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্র

রসুল কি একথা বলেননি যে, যখন ভীতিকর নিদর্শন দেখবে, তখন নামাজ পড়ে নিয়ো? তাঁর সহধর্মিণীগণের পরলোকগমন অপেক্ষা অধিক ভীতিকর আর কী হতে পারে?

আর একটি বর্ণনায় এসেছে, অন্য এক উম্মতজননীর জানাযার নামাজ পাঠের পর যখন তাঁকে খাটিয়ায় উঠিয়ে বহন করা হচ্ছিলো, তখন হজরত ইবনে আব্বাস রা. খাটিয়া বহনকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, সাবধান! ধীরে ধীরে নিয়ে চলো। মনে রেখো, ইনি রসুলুল্লাহর জীবনসঙ্গিনী। আদবের সাথে চলো। বেশী ঝাঁকি যেনো না লাগে। ইনি তোমাদের মা।

খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সকল সাহাবী তাঁদের অনুগ্রহদৃষ্টি কামনা করতেন। কতোরকমভাবে এবং কতো পরিমাণে যে হাদিয়া উপহার পাঠাতেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমরা তো অনেক দূরের— স্থানের দিক থেকে যেমন, তেমনি সময়ের দিক থেকেও। এখন তাঁদের কাছে আমরা সওয়াব রেছানীর হাদিয়াই পাঠাতে পারি কেবল। আর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁদের স্নেহভাজন ও নৈকট্যভাজন তো হতে পারিই। পেতে পারি মমতাময়ী মায়েদের রূহানী আদর। কারণ, বলা হয়েছে— 'যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে।'

আদি ও অন্তের সকল প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি, মহিমা-গৌরব, উচ্চতা ও পবিত্রতা কেবলই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং আমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। যিনি স্বাধিষ্ঠ, স্বতিষ্ঠ, স্বয়ম্ভূ। আমরা তো তাঁরই জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের। হে আমাদের পরম প্রেমময় মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্! 'জননীদের জীবনকথা' দয়া করে আমাদেরকে দান করলে বলে আমরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী হলাম। এর জন্য তোমার উদ্দেশ্যে জানাই অজস্র-অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। আর এই শুভ প্রকাশ মুহূর্তে আমরা কামনা করি কেবল তোমার দয়া ও ক্ষমা এবং দ্বীনের খেদমত করবার যথার্থ সামর্থ্য। আমাদেরকে— লেখক-পাঠক-পাঠিকা ও সকল প্রকাশনাকর্মীকে দয়া করে মাফ করে দাও।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম অনন্তকাল ধরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হোক মহাবিশ্বের মহামমতার প্রতিভূ মোহাম্মদ মোস্তাফা স. এর প্রতি এবং তাঁর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদগণের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
অনডঙ চেরাই গ্রামের মসজিদ
কমপঙছেনাঙ প্রদেশ
কম্বোডিয়া।

নভেম্বর, ২০১১ সন ইং

আমাদের বই

তাফ্‌সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্‌বন্দ ◆চেরাগে চিশ্‌তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆আল্লাহ্‌র জিকির

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

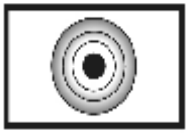
কাব্য সংকলন ◆সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

‘নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা
ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।’
— সূরা আহ্যাব, আয়াত ৬

সূচীপত্র

১. হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা./১৩
২. হজরত সওদা বিনতে জামআ রা./৪৯
৩. হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রা./৭১
৪. হজরত হাফসা বিনতে ওমর ফারূক রা./১১৭
৫. হজরত যয়নাব বিনতে খুজাইমা রা./১৩৩
৬. হজরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া রা./১৩৯
৭. হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রা./১৬৫
৮. হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ রা./১৭৭
৯. হজরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান রা./১৮৭
১০. হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা./১৯৯
১১. হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ রা./২১১

হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



এখানকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় খুব কম। বলতে গেলে হয়ই না। নির্বাক, নীল, সুবিশাল ও সুবিস্তৃত মহাকাশ তাই সারাক্ষণ সুপ্রকাশিত। দিবস সূর্যকরোজ্জ্বল। তপ্ত, তীব্র ও তীক্ষ্ণ। আর রাতে কোটি কোটি নক্ষত্রের কোমল আলোয় সিক্ত, স্নিগ্ধ ও শীতল। এখানে প্রকৃতি তার রুক্ষ ও কোমল দুই রূপই দেখায় স্পষ্ট করে। নিয়মিত আসে যায় নিশীথ, উষাশেষের দিবস, সায়াহ্ন। জেগে থাকে মহাকাল। বয়ে যায় মহানগরী মক্কার উপর দিয়ে।

মক্কা। মক্কাশরীফ। বিশ্বাসীগণের বিশ্বতীর্থ। এখানেই রয়েছে পৃথিবীর প্রথম উপাসনালয়। কাবাশরীফ। নির্মাণ করেছিলেন প্রথম মানুষ, প্রথম নবী— হজরত আদম আ.। বেহেশত থেকে নেমে এসে তিনি বসবাস করতেন ভারতে। সেখান থেকে মক্কার আরাফা প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে জাবালে রহমত পাহাড়ের পাদদেশে সাক্ষাত পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমার। তাঁদের ওই মিলনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সকল হজ্বযাত্রীকে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিত হতে হয়।

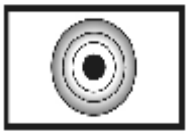
হজরত আদমই কাবাগৃহের প্রথম নির্মাতা। প্রথম জিয়ারতকারী ও হজ্বযাত্রী। বহু বছর ধরে তাঁর বংশধরগণ জারী রাখেন হজ্ব ও জিয়ারতের বিধান। তারপর এক সময় শয়তানের প্ররোচনায় তারা হয়ে যায় মুশরিক, মূর্তিপূজক। তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করতে আবির্ভূত হন মহানবী নূহ আ.। প্রায় নয়শত বছর অক্লান্ত চেষ্টা সাধনার পর তাঁর বিশ্বাসী অনুচরগণের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশে। অংশীবাদের অপবিত্রতা থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করবার জন্য তিনি প্রার্থনা জানান। শুরু হয় সর্বগ্রাসী ও ভয়াবহ মহাপ্লাবন। পৃথিবীর সকল জনপদ নিমজ্জিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রক্ষা পান কেবল তিনি এবং তাঁর নৌকায় আশ্রয় গ্রহণকারী বিশ্বাসী ও বিশ্বাসবতীগণ।

বিলুপ্ত হয়ে যায় কাবাগৃহের নিশানা। বয়ে চলে সময়। অতীতের উদরে বিলীন হয়ে যায় শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। একসময় বাবেল নগরে আবির্ভূত হন আল্লাহ্‌র বন্ধু (খলিল) হজরত ইব্রাহীম আ.। তিনি তাঁর প্রিয়তমা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে নির্বাসন দেন এখানে। তখন এস্থান ছিলো জনমানবহীন— শুধুই শূন্যতা।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বলেছেন, মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ্‌ কাবাঘরটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে হজরত ইব্রাহীম তা পুনঃনির্মাণ করতে চাইলে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এভাবে— হিজুজ নামে এক পশু পাঠানো হলো। সেই পশুটি মাটি উঠিয়ে কাবা শরীফের ভিত্তি চিহ্নিত করে দিলো। ওই ভিত্তির উপরেই হজরত ইব্রাহীম কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ করলেন। হিজুজ পশু, কিন্তু তার পাখির মতো দুটি ডানা ছিলো। আর আকৃতি ছিলো সরীসৃপের মতো।

নির্মাণকর্ম সমাপনের পর পিতাপুত্রের প্রার্থনার কথা পবিত্র বাণীসম্ভারে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলো তখন তারা বলেছিলো, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের উভয়কে একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মত কোরো। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়মকানুন দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ কোরো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকটে আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'

যে মহান রসুলের জন্য ছিলো হজরত ইব্রাহীমের এই আর্তি, সেই রসুল অবশেষে এসেছিলেন। তিনিই রহমাতুল্লিল আলামীন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এরশাদ করেছেন, আদম যখন পানি ও মাটিতে তখনও আমি নবী। আমি নবী ইব্রাহীমের প্রার্থনা, রসুল ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমার মাননীয়া মায়ের স্বপ্নফল। আমার জন্মের সময় আমার মা দেখেছিলেন একটি দিগন্তবিস্তৃত নূর। তিনি বলেছেন, আমার মধ্য থেকে এমন একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যার আলোকচ্ছটায় পরিদৃশ্যমান হচ্ছে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ।



সেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুত প্রত্যাদেশবাহকের মহাআবির্ভাবের সময় সমাগত হলো। অংশীবাদের অমারজনীর শেষ প্রহর। প্রত্যুষ প্রত্যাসন্ন। আলোর অপেক্ষায় অধীর মহামানবতা, মহানিসর্গ ও মহাইতিহাস।

পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হয়ে রইলেন তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান জীবনসঙ্গিনী, প্রাণের প্রিয়তমা পবিত্রতার প্রতিরূপিনী মহাসম্মানিতা উম্মতজননী হজরত খাদিজা। জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর পিতা খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদের গৃহে। তিনি ছিলেন মক্কার কুরায়েশ বংশের বনী আসাদ শাখার সন্তান। পিতৃবংশের ঊর্ধ্বপুরুষ কুসাই পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশপরম্পরা মিলিত হয়েছে রসুলুল্লাহ্ স. এর বংশপরম্পরার সঙ্গে এভাবে— খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই।

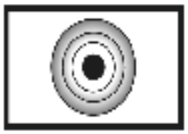
পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়ায় এবং স্বজন-পরিজনের আদরযত্নে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন হজরত খাদিজা। তাঁর মাতা ফাতেমা বিনতে জায়েদও ছিলেন কুরায়েশ কুলোদ্ভবা। সকলেই লক্ষ্য করলো, খাদিজা সাধারণ মেয়েদের মতো নন। তাঁর চাল-চলন, কথা-অভিব্যক্তি, ধারণা-ভাবনা, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুই শুদ্ধ, সুন্দর, শুভ্র ও পবিত্র। তাই সকলে তাঁকে ডাকতে লাগলো 'তাহেরা' বলে। তাহেরা অর্থ পবিত্রা।

বাদশাহ্ আবরাহা যখন কাবা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তার বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কার সন্নিকটে উপস্থিত হলো, তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। আবরাহার ভয়াবহ পরিণতির কথা পবিত্র বাণীসম্ভারে বলা হয়েছে এভাবে— 'তুমি কি দেখনি তোমার প্রভুপালক হস্তি অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন। তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন, যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।'

হাকীম ইবনে হিযাম বলেন, আমার ফুফু খাদিজা আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। হস্তিবছরে আমার বয়স হয়েছিলো ১৩ বছর।

খুওয়াইলিদ ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। তিনি মক্কায় এসে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের হালীফ (চুক্তিবদ্ধ) হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। বিবাহ করেন ফাতেমা বিনতে জায়েদকে। ফিজার যুদ্ধে তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের অধিনায়ক। তাঁর সংসারজীবন ছিলো সফল ও বর্ণাঢ্য। বহু সন্তানের জনক ছিলেন

তিনি। প্রথম পুত্র হিযাম— এই হিযামের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হাকীম। মূর্খতার যুগে মক্কার দারুল নাদ্ওয়ার পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় সন্তান খাদিজা। তৃতীয় সন্তান আওয়াম ছিলেন স্বনামধন্য সাহাবী হজরত যোবায়েরের পিতা। রসুলুল্লাহ্ স. এর ফুফু এবং হজরত হামযা রা. এর বোন হজরত সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন আওয়ামের স্ত্রী, অর্থাৎ হজরত যোবায়েরের মা হজরত খাদিজা রা. এর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। চতুর্থ সন্তান হালা। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর কন্যা হজরত যয়নাবের শ্বাশুরি। অর্থাৎ আবুল আস ইবনে রবীর মা। আর আবুল আস ছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর বড় জামাই। পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া। খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ বালাজুরী লিখেছেন, তাঁর আরো দু'জন কন্যা সন্তান ছিলো— খালেদা ও রাকীকা। খালেদার বিবাহ হয় ইলাজ ইবনে আবী সালমার সঙ্গে। আর রাকীকার পাণিগ্রহণ করেন আবদুল্লাহ্ ইবনে বিজাদ। উল্লেখ্য, হজরত খাদিজার ভাই বোনদের মধ্যে কেবল হালা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালিনী হয়েছিলেন।



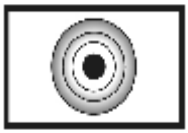
খাদিজা রা. যৌবনবতী হলেন। পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকগণ তাঁকে পাত্রস্থ করবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিলেন। পুতঃপবিত্র স্বভাবসম্পন্না রূপবতী খাদিজা রা. এর পাণিপ্রার্থী ছিলো অনেকেই। কিন্তু অভিভাবকগণ তাদের কাউকে তেমন উপযুক্ত মনে করলেন না। পছন্দ করলেন কেবল তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলকে। কারণ তিনি ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত, ধর্মপরায়ণ। ইঞ্জিল ও তওরাত কিতাবে ছিলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বিবাহ নিয়ে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়পক্ষের সাগ্রহ মতবিনিময় চললো কিছুকাল ধরে। তারপর কী এক অজ্ঞাত কারণে সে বিয়ে আর হলো না। অভিভাবকগণ শেষে তাঁর বিবাহ দিলেন আবু হালা হিন্দা ইবনে সুরারা আত্তামিমির সঙ্গে।

হজরত খাদিজা সংসার জীবনে প্রবেশ করলেন। একসময় মাতা হলেন দুই সন্তানের— এক ছেলে ও এক মেয়ে। নাম হিন্দা ও হালা। শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন হালা। আর হিন্দা বেঁচে ছিলেন বহুদিন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের শুরুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন সম্মানিত সাহাবীর মর্যাদা। মহানবী মোস্তফা স. এর মহাতিরোধানের পরেও বেঁচে ছিলেন তিনি। শেষে শহীদ হয়েছিলেন জামাল যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ হজরত আলী রা. এর পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে।

হজরত খাদিজা রা. এর সংসার ভেঙে গেলো অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। বিধবা হলেন তিনি। বৈধব্যের বিষণ্নতায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। ভাগ্যের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন নীরবে। এভাবে তাঁর জীবনের অভিঘাতসমূহকে বেষ্টন করে বয়ে চললো সময়। দিবস-রজনী। রজনী-দিবস।

এভাবেই এগিয়ে চললো জীবন। এক সময় অশান্ত শোক-দুঃখ মিলিয়ে গেলো দূরের স্মৃতিময় অতীতে। জীবনধর্মের নিয়মে ফিরে এলো স্বাভাবিকতা। হজরত খাদিজা তখনো যৌবনবতী। তদুপরি বিদুষী, সতী-সাধ্বী, বিত্তবান ব্যবসায়ীর কন্যা। পুনঃবিবাহের প্রস্তাব আসতে লাগলো একে একে। হজরত খাদিজা সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষে কী মনে করে সম্মতি দান করলেন বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণ আতিক ইবনে আবিদের প্রস্তাবে। যথাসময়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। কিন্তু তাঁর এ সংসারও ভেঙে গেলো অল্পকিছুদিনের মধ্যে। এক কন্যা সন্তান রেখে চিরতরে চলে গেলেন আতিক। কন্যাটির নাম হিন্দা।

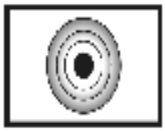
এরপর আরো বিবাহের প্রস্তাব পেলেন তিনি। কিন্তু কোনো প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। সংসারের প্রতি হয়ে পড়লেন অনাসক্ত। প্রবীণা রমণীদের মতো কেবল সারাক্ষণ ধর্মভাবে নিমজ্জিত রাখতে চাইলেন নিজেকে।



খুওয়াইলিদ তখন বৃদ্ধ। তবুও ব্যবসা বাণিজ্য নিজেকেই দেখতে হয়। আগে তিনি সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে সহজে সম্পন্ন করতে পারতেন। কিন্তু এখন বয়সের ভার বহন করতে হয়। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুভার ক্লেশকর মনে হতে থাকে। পুত্র সন্তান জীবিত নেই। দ্বিতীয় পুত্র আওয়ামও অনেক আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। খুওয়াইলিদ তাই তাঁর বিশাল বাণিজ্যের বোঝা বিদুষী ও বুদ্ধিমতী কন্যা খাদিজা রা. এর স্কন্ধে অর্পণ করলেন। তিনি আগেও ছিলেন তাঁর পিতার বাণিজ্যসহকারী। এবার হলেন সর্বেসর্বা। পিতার উপরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন ছিলেন তিনি। কীভাবে বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সচল করতে হয়, তা তাঁর অজানা ছিলো না। বাল্যবেলা থেকেই তিনি তাঁর পিতার বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারী পরিচালনার নিয়মনীতি তীক্ষ্ণচোখে পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। তাই সবকিছু সাহসিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করতে গিয়ে বিব্রত হলেন না মোটেও। ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে লাগলো। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সদয় ব্যবহার দেখে বাণিজ্যকর্মীরাও প্রীত ও তুষ্ট হলো

খুব। তখনকার প্রধান দু'টি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো ইয়েমেন ও সিরিয়া। উভয়স্থানে তাঁর বাণিজ্য চলতে লাগলো মহাআড়ম্বরে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, তিনি একা যেনো আর পারছিলেন না। প্রয়োজনবোধ করলেন এমন এক সক্রিয় পুরুষের, যার উপরে তিনি সকল দায়ভার অর্পণ করে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। সেরকম সক্রিয়, সজ্জন ও বিশ্বস্ত কে আছেন? কোথায় আছেন?



কুরায়েশ দলপতি হজরত আবু তালেবও মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। বাণিজ্য ব্যপদেশে তিনি কখনো কখনো সিরিয়ায় যাওয়া আসা করতেন। সঙ্গে নিতেন একান্ত আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। তাঁর জন্মের পূর্বে পিতা আবদুল্লাহ্ পরপারে চলে যান। মা আমেনা তাঁকে প্রতিপালন করেন। জুরহাম গোত্রের বিবি হালিমাকে তাঁর দুধমাতা নিযুক্ত করেন। এভাবে তাঁর সুন্দর ও শুদ্ধ ভাষাভঙ্গিমা ও বাগ্মিতা অর্জিত হয় অতি কৈশোরেই। কারণ সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবী ভাষার চর্চা ছিলো ওই জুরহাম গোত্রেই।

পিতৃহারা মোহাম্মদ স. এরপর তাঁর মাতাকেও হারালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তখন বৃদ্ধ। পরিবার পরিজনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন তাঁর এই পিতৃহারা পৌত্রকে। এরপর মাতৃহারা হওয়াতে তাঁর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ-মমতা আরো অধিক উদ্বেল হয়ে উঠলো। এবার তিনিই নিলেন তাঁর লালনপালনের ভার।

কিন্তু না। তিনিও বেশীদিন প্রিয় পৌত্রকে স্নেহ-মমতার আওতায় রাখতে পারলেন না। পরপারের ডাক এসে পড়লো। যাবার সময় হলে সকলেই যায়। যেতে হয়। তিনিও চলে গেলেন।

এবার এগিয়ে এলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেব। মোহাম্মদ মোস্তফা স. তখন কিশোর। এ বয়সের কাউকে লালনপালন করতে বেগ পেতে হয় না। শিথিল পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানই কিশোরদের প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আবু তালেব তা করেন না। তীব্র তীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ় মমতার মধ্যে সারাক্ষণ নিমজ্জিত রাখেন তাঁর এই প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

ব্যবসায়ী তিনি। কিন্তু হজরত খাদিজার মতো অতবড় ব্যবসায়ী নন। তিনি তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যবসায়ী হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হলো না। হঠাৎ উপস্থিত হলো দুর্ভিক্ষ। অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীরা বিপাকে

পড়লেন। বাণিজ্যযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনে টান পড়লো তাঁরও। বাধ্য হয়ে তিনি বললেন, মোহাম্মদ! এবার তো কোনো কর্মগ্রহণ করতে হয়। খাদিজার কাছে কর্মগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। মোহাম্মদ মোস্তফা স. প্রিয় পিতৃব্যের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। কিন্তু উপযাচক হয়ে কর্মের আবেদন জানাতে দ্বিধান্বিত হলেন।

সুব্যবস্থা হলো আল্লাহপাকের পক্ষ থেকেই। তিনি তাঁর হাবীব স.কে উপযাচকের ভূমিকায় দেখতে চাইলেন না মনে হয়। মাঝামাঝি ব্যবস্থা হয়ে গেলো একটা। হজরত আবু তালেবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন তাঁর বোন আতিকা। ভাইকে চিন্তিত দেখে তিনি তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত আবু তালেব বললেন, সে কথা পরে বলবো। আগে তোমার আগমনের কারণটা খুলে বলো। আতিকা বললেন, আমি তো মোহাম্মদের বিবাহের বিষয়ে আলাপ করতে এসেছিলাম। এবার তো সে পঁচিশে পড়লো। আর বিলম্ব করা কি ঠিক? হজরত আবু তালেব বললেন, না, তা ঠিক নয়। কিন্তু তার উপার্জনের একটা ব্যবস্থা হওয়া তো দরকার।

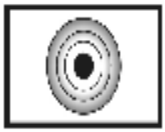
ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালো নয়। আতিকা পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদ স.কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি ভেবে দেখলেন, খাদিজার বাণিজ্যবহরই সবচেয়ে বড়। আর লোকমুখে একথাও হয়তো তিনি জানতে পেরেছিলেন, নির্ভরযোগ্য একজন বাণিজ্যব্যবস্থাপকের জন্য তিনিও অপেক্ষা করছেন। অনুসন্ধানে আছেন।

খাদিজাগৃহে উপস্থিত হলেন তিনি। হজরত খাদিজা তাঁকে অতি সমাদরে গ্রহণ করলেন। কুশল বিনিময়ের পর মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। হজরত খাদিজা বললেন, আমিতো ওই যুবকের অনেক সুনাম শুনেছি। লোকে তাকে আল-আমিন বলে। আপনার প্রস্তাব আমি সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। আগামীকাল আমাদের বাণিজ্যবহর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। কাফেলার অধিপতি হিসেবে আপনি তাঁকে আজই তাঁর দায়িত্ব বুঝে নিতে বলুন। তাঁকে বেতন দেওয়া হবে অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ।

সেদিনই কাফেলার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে নিলেন তিনি। সাক্ষাত করলেন খাদিজা তাহেরার সঙ্গে। প্রথম সন্দর্শনেই পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ ও অভিভূত হলো শুভ্রশুদ্ধ দুটি হৃদয়। আল-আমীন ও তাহেরা। ভিতরে ভিতরে সম্ভবত হজরত খাদিজাই চঞ্চলা হলেন অধিক। কারণটি অসাধারণ। তিনি জানতেন, সর্বশেষ নবী আবির্ভূত হবেন এই মক্কায়। ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে একথাও জানতে পেরেছিলেন যে, তওরাত গ্রন্থে তাঁর পবিত্র অবয়ব ও স্বভাববৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তিনিই কি মোহাম্মদ! জ্যোতির ঝড় যেনো বয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরে। কিন্তু বাইরে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দায়িত্বসচেতন।

পরদিন শুভযাত্রা। যাত্রার কালে হজরত খাদিজা তাঁর বিশিষ্ট পরিচারককে উপদেশ দিলেন এভাবে— মনে রেখো মায়সারা! এ যাত্রায় তোমাদের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে যাচ্ছেন মান্যবর আবু তালেবের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ। তোমাকে পাঠানো হচ্ছে তাঁর খাস সেবক হিশেবে। তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় কোনো ত্রুটি কোরো না। তাঁকে কখনো কোথাও একা থাকতে দিয়ো না।

মান্যবর আবু তালেব হৃদয়ে ধারণ করে আছেন স্বস্তি ও শোক দুটোই। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মানজনক কর্মসংস্থান হওয়াতে তিনি খুশী। খুশী খাদিজা তাহেরার প্রতিও। খাদিজাও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি। কর্মগ্রহণকারী হিসেবে তাঁকে দেখেননি। দেখেছেন আপনতম জন হিসেবে। কিন্তু প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিচ্ছেদ তাঁর হৃদয়কে যাতনা দিচ্ছে। পরদিন তাঁকে বিদায় জানাতে তিনি নগর তোরণ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। আতিকাও তাঁর সঙ্গী হলেন। সঙ্গী হলো হাশেমী বংশের আরো অনেকে। সকলের চোখ অশ্রুসজল। আতিকা কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছলেন মান্যবর আবু তালেবও। কেউ কেউ অভিমানাহত কণ্ঠে বললেন, বাপ মা বেঁচে থাকলে কি তাঁরা মোহাম্মদকে এভাবে অন্যের কর্মচারী হতে দিতেন।



যে দিকে দৃষ্টি যায়, ধু ধু মরুভূমি। দিগন্তের সকল সীমানা অসীম আকাশকে স্পর্শ করে আছে। মরুভূমির বুক চিরে পথ চলে গেছে দূরে। বহুদূরে। কখনো পথপাশে ছোট বড় পাথুরে পাহাড়। কখনো অল্পস্বল্প কাঁটাগাছ— বাবলা বৃক্ষ।

এগিয়ে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বাণিজ্য কাফেলা। সহযাত্রী হিসেবে যথাদায়িত্ব পালন করছে উষ্ট্রচালক কর্মচারীবৃন্দ এবং ভৃত্য মায়সারা। দিনের অতি উত্তপ্ততা এবং রাতের অবাধ স্নিগ্ধতা পেরিয়ে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় যাত্রাবিরতি ও বিশ্রামসহ চলেছে বাণিজ্যের বরকতময় বহর। যেতে হবে সিরিয়ার বসরা বন্দরে। পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রাবিরতি দিতে হলো। সে স্থানে ছিলো খ্রিস্টানদের একটি উপাসনালয় গীর্জা। গীর্জার অধ্যক্ষের নাম নাস্তুরা। তিনি দূর থেকে লক্ষ্য করলেন উট থেকে নেমে মোহাম্মদ মোস্তফা উপবেশন করলেন একটি পত্রপুষ্পহীন বৃক্ষের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পাতায় ভরে গেলো বৃক্ষটি। নাস্তুরা বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। মায়সারা

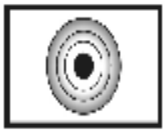
ছিলো তাঁর পূর্বপরিচিত। তিনি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট লোকটি কে? মায়সারা বললেন, মক্কার হারামবাসী কুরায়েশ কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি। নাস্তুরা বললেন, নবী ছাড়া অন্য কেউ ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করে না। নবী ঈসা ওখানে বসেছিলেন। আর বসলেন ইনি। সুতরাং ইনি যে নবী, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। নাস্তুরা আরো জানতে চাইলেন, তাঁর চোখ দুটি কি লালাভ? মায়সারা বললেন, হ্যাঁ। ওই লাল আভা কখনো দূর হয় না। নাস্তুরা বললেন, তিনি নবী। তিনিই সর্বশেষ নবী।

বিশ্রাম ও বিরতি শেষে কাফেলা পুনরায় চলতে শুরু করলো। গন্তব্যস্থান খুব বেশী দূরে নয়। সেদিনই বসরা বন্দরে উপস্থিত হলো কাফেলা। কেনা-বেচা শুরু হলো সেদিন থেকেই। পণ্য বিক্রয়ের সময় এক লোকের সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর কিছুটা বাদানুবাদ হলো। লোকটি বললো, আপনি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলুন। তিনি স. বললেন, আমি ওগুলোর নামে কখনোই শপথ করি না। ওগুলোর ধ্বংস কামনা করি। লোকটি আশ্চর্য ও ভীত হলো। সে মায়সারাকে লক্ষ্য করে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! ইনি অবশ্যই নবী।

কেনা-বেচা উভয় কাজেই প্রভূত বরকত-রহমত প্রত্যক্ষ করা গেলো। সবকিছুর মধ্যেই পরিলক্ষিত হতে লাগলো প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা ও প্রশান্তি। এবার ফেরার পালা। সকল বাণিজ্যবহর এবার পথ ধরলো মক্কার।

মায়সারা তাঁর মনিবের সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি করেন না। তাঁর পর্যবেক্ষণ যোগ্যতাও ছিলো সুতীক্ষ্ণ। বিভিন্ন জনের মন্তব্য তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিলো। তিনি যে একজন অসাধারণ পুরুষের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি সবকিছু নিখুঁত দৃষ্টিতে দেখেন। দেখেন আর অবাক হন। মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি হন অধিক, অধিকতর মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। কখনো দেখেন প্রখর রৌদ্রকিরণের সময় আল্লাহ্‌র নবীকে ছায়া দিচ্ছে মেঘমালা। কখনো আবার ছায়া দিচ্ছে দু'জন ফেরেশতা।

কাফেলা এসে পৌঁছলো জাহরান নামক স্থানে। সেদিনের মতো যাত্রাবিরতি দেওয়া হলো। রাতে বিশ্রামের সময় মায়সারা বললেন, মান্যবর মোহাম্মদ! এখান থেকে মক্কা তিন দিনের পথ মাত্র। আমি সবিনয়ে প্রস্তাব করছি, আপনি আগে মক্কায় উপস্থিত হন। মালিকান খাদিজাকে সফল বাণিজ্যের কথা জানান। আমাদের জন্য ভাববেন না। আমরা একদিন অথবা অর্ধদিন পরে সহজেই চলে আসতে পারবো।



হজরত খাদিজা পথ চেয়ে থাকেন। প্রতিদিন দুপুরের পর ঘরের ছাদে উঠে যান। যে পথ সিরিয়ার দিক থেকে এসেছে, সে দিকেই তাকিয়ে থাকেন সারাক্ষণ। রাত নামবার আগে নেমে আসেন। বাণিজ্যের লাভ লোকসানের কথা তাঁর তেমন মনেই হয় না। মনে পড়ে কেবল সৌম্য-শান্ত-শুভ্র পুরুষ মোহাম্মদের কথা। আল্লাহ্তায়ালা হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তনকারী। তিনি তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দিয়েছেন ওই মহাপুরুষের দিকে। তিনি ভালোভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছেন, এ আকর্ষণ প্রবৃত্তির (নফসের) নয়— হৃদয়ের। তাঁর প্রবৃত্তি তো পবিত্র। তাই তো লোকে তাঁকে নাম দিয়েছে তাহেরা। কিন্তু আত্মা তো তাঁর ইচ্ছানুসারে চলে না। পবিত্র সৌন্দর্যের দিকে পবিত্র হৃদয় তো আকর্ষণবোধ করবেই।

দ্বিপ্রহর বিগতপ্রায়। সেদিনও হজরত খাদিজা প্রতীক্ষারতা। হঠাৎ দেখতে পেলেন এক উষ্ট্রারোহী অস্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে আসছে। ক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হচ্ছে। তিনি দেখলেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দেখলেন, দু'জন ফেরেশতা তাঁকে ছায়াদান করছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহচরীগণ। তিনি তাদেরকেও দৃশ্যটি দেখালেন। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

হজরত খাদিজার মনে পড়ে অনেক আগের এক ঘটনার কথা। মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান চলছে। সকলে আনন্দমুখরা। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলো এক অপরিচিত ব্যক্তি। সে সুউচ্চ কণ্ঠে বললো, ওহে মক্কার রমণীকুল! শোনো- অতি শীঘ্র তোমাদের এই মক্কা নগরীতে এক নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। তোমাদের মধ্যে যে পারবে, সে যেনো তাঁর সহধর্মিণী হয়।

হজরত মোহাম্মদ স. এর উটটি ছিলো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই অনতিবিলম্বে তিনি উপস্থিত হতে সক্ষম হলেন খাদিজা রা. সকাশে। জানালেন ব্যবসার অভূতপূর্ব সফলতার কথা। হজরত খাদিজা অত্যন্ত প্রীত হলেন। পথবাহক উটটিকে তিনি তৎক্ষণাৎ দান করলেন তাঁকে। আলআমিন উপাধিধারী এই মানুষটি সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে ফিরে এসে তাঁর অন্তরের পবিত্র বিরহযন্ত্রণাকে প্রশমিত করেছেন, এটাই ছিলো তাঁর আনন্দের প্রধান কারণ। ব্যবসার লাভ সে আনন্দের একটি অংশ মাত্র। মূলের কিছু নয়।

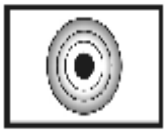
পরদিন এসে উপস্থিত হলো পুরো বাণিজ্যবহরটি। মায়সারার মুখমণ্ডল মুগ্ধতা ও প্রফুল্লতায় ভরা। তিনি উচ্ছ্বাসভরে অনর্গল মোহাম্মদ মোস্তফা স. সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গেলেন। ধর্মবেত্তা নাস্তুরার কথা, পণ্যক্রেতার কথা,

ফেরেশতাদের এবং মেঘমালার ছায়াদানের কথা— কোনোকিছুই তাঁর বিবরণবহির্ভূত রইলো না। আরো বললেন, তিনি হচ্ছেন মহানুভবতা, উদারতা, সততা, বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। তাঁর বরকতময় সাহচর্যে ছিলাম বলে আমাদেরকে কোনো রকম দুর্ভোগে পড়তে হয়নি। মুনাফাও হয়েছে দ্বিগুণ। যে তাঁকে দেখে সেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। প্রদর্শন করে সশ্রদ্ধ আনুগত্য।

হজরত খাদিজা নির্বাক হয়ে শুনে গেলেন সবকিছু। মহাপুরুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পবিত্র বিবরণ যেনো স্থায়ীভাবে জমা হয়ে গেলো তাঁর পবিত্রতাপিয়াসী অন্তরের গভীরতম কেন্দ্রে। কিন্তু বাইরে তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন না। সবাইকে বিদায় দিলেন যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে। প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন পরবর্তী যাত্রার জন্য।

যথাসময়ে প্রস্তুত হলো পরবর্তী কাফেলা। এবারও লাভ হলো প্রচুর। এভাবে আরো দুই এক বার চললো সর্বশেষ নবীর হালাল ব্যবসা। তিনি ও তাঁর বাণিজ্য সহকারীরা বিত্তবান হলেন না বটে, কিন্তু ঘুচে গেলো সকলের আর্থিক অনটন।

শেষে হজরত খাদিজা তাঁর হৃদয়ের আর্তিকে গোপন রাখতে পারলেন না। তাঁর বোন হালার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। তাঁর নৈকট্যভাজনা ও সহচরী নাফিসাকেও খুলে বললেন সব। নাফিসা বললেন, আপনার অন্তরের অবস্থা কিছুটা হলেও আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। এখন তবে বলুন, কী করতে হবে?



মহানবী মোহাম্মদ স. এর গৃহে উপস্থিত হয়ে নাফিসা প্রথমে কুশল বিনিময় করলেন। সাধারণ কিছু কথা বিনিময় হলো। মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো অল্পক্ষণ পরেই। নাফিসা বললেন, আপনি তো এখন পূর্ণ যুবক। সংসার শুরু করছেন না কেনো? মহানবী স. বললেন, তেমন অর্থ সম্পদ তো আমার নেই। তেমন মেয়ে কোথায় যে, আমার মতো স্বল্পবিত্তকে গ্রহণ করবে?

নাফিসা বললেন, তেমন কেউ যদি থাকে, যে কুরায়েশ বংশের, শুদ্ধ চরিত্রিনী, রূপবতী এবং বিত্তশালিনী, তবে আপনি তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত কিনা বলুন। মহানবী স. বললেন, সে কে? নাফিসা বললেন, যদি তিনি হন মাননীয়া খাদিজা? মহানবী স. বললেন, সে-ও কি সম্ভব? তিনি তো অগাধ সম্পদের মালিক। আর আমার অবস্থা তো জানোই। নাফিসা বললেন, সে দায়িত্ব আপনি আমার উপর অর্পণ করুন। মহানবী স. নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

নাফিসা মহাআনন্দে খাদিজার কাছে গেলেন। হজরত খাদিজা সেদিন তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ এবং চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলকে বিষয়টি জানালেন। তাঁরা একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু খুশী হলেন খুব। তাঁরা ভেবেছিলেন, খাদিজা রা. ও বয়সে আর সংসারে জড়াবেন না। বিস্ময়ের কারণ ছিলো, তিনি তাঁর মনোভাব বদলেছেন। আর আনন্দের কারণ হচ্ছে, তিনি এমন একজনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, যিনি শুদ্ধ পবিত্র একজন অসাধারণ পুরুষ। আল আমীন।

কথা পৌঁছানো হলো মহানবী স. এর প্রিয় পিতৃব্য এবং অভিভাবক হজরত আবু তালেবের কাছে। তিনি খুশী হলেন সবচেয়ে বেশী। আল আমীনের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী যে কেবল তাহেরাই হতে পারেন, সে সম্পর্কে তিনি যেনো নিঃসংশয় ছিলেন।

শুভবিবাহের দিন তারিখ ধার্য করা হলো। খাদিজা ভবন হলো আলোকমালায় সজ্জিত। নতুন বসন ভূষণে অলংকারে সুসজ্জিতা হলেন তাঁর নিকটাত্মীয়গণ। দাস-দাসীগণও সজ্জিত হলো নতুন পোশাকে। শুরু হলো মেয়েদের নৃত্য-গীত, বিবাহসঙ্গীত।

বর এবং বরপক্ষের লোকজন যথাসময়ে বিবাহ আসরে উপস্থিত হলেন। সাদর অভ্যর্থনা শেষে সকলেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। হজরত খাদিজার পিতা খুওয়াইলিদ তখন পরলোকগত। তাই কন্যা পক্ষের অভিভাবক হলেন চাচা আমর। তাঁর সহকারী হলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা।

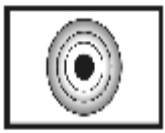
বিবাহ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। প্রথম মানব-মানবীর বিবাহ হয়েছিলো বেহেশতে। তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতিটি বিবাহে তাই ওই বেহেশতি বরকত ও নূর বর্ষিত হয়। আর আল আমীন ও তাহেরার বিবাহ অনুষ্ঠান শুধু পবিত্র নয়, মহাপবিত্র। আর তাঁরা তো হবেন ভবিষ্যতের মহামানবতার আত্মিক জনক-জননী। সুতরাং তাঁদের বিবাহ উৎসব মানে অনন্ত নূর ও অসীম বরকতের মিলন মেলা— এতে সন্দেহ মাত্র নেই।

হজরত আবু তালেব মহাপবিত্র এই বিবাহে মোহরানা নির্ধারণ করলেন চারশত দীনার এবং কুড়িটি উষ্ট্রী। ভাষণ দান করলেন দাঁড়িয়ে। বললেন, সকল প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি কেবলই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর এবং ঈসমাইলের ফসলের অন্তর্ভূত করেছেন। আমাদেরকে দয়া করে দান করেছেন মহামর্যাদাভূষিত এই শহর এবং মানুষের লক্ষ্যস্থল একটি পবিত্র গৃহ। আমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানবমণ্ডলীর উপর। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ কল্যাণময়, মহান ও ন্যায়নিষ্ঠ। যে কোনো যুবকের তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য বিত্তবৈভবে সে পশ্চাৎপদ। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, পার্থিব সম্পদ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ওগুলো ক্ষণস্থায়ী, ছায়া বা স্মৃতির মতো অপসৃয়মাণ।

আমি মনে করি মোহাম্মদ ও খাদিজা সারাজীবন পরস্পরের প্রতি গভীর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। আর উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলছি, অভিভাবক হিসেবে মোহরানা পরিশোধের দায় আমার।

এভাবে পঁচিশ বছরের পবিত্রতম এক যুবকের সঙ্গে চল্লিশ বছরের এক পূত পবিত্রা নারীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো নির্বিঘ্নে। আনন্দিত ও ধন্য হলো মক্কার মানুষ। নিসর্গ। মহা নিসর্গ।

শুরু হলো ভোজনপর্ব। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ভোজন শেষে হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন নিজ নিজ আবাসে। হজরত আবু তালেব নবদম্পতিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। হজরত খাদিজা তাঁর দাস দাসীদের অনেককে মুক্ত করে দিলেন। দরিদ্র জনতার মধ্যে বিতরণ করলেন অনেক অর্থ। সকলেই তুষ্ট হলেন। সুখময় জীবনের জন্য প্রার্থনা করলেন প্রাণভরে।



হজরত আবু তালেবের গৃহে নববধূর শুভপদার্পণ ঘটলো। কিন্তু কয়েকদিন মাত্র। আবার ফিরে আসতে হলো স্বগৃহে। কারণ তাঁকে চালাতে হয় বিরাট ব্যবসা। সামলাতে হয় বড় সংসার। তাঁর পূর্বস্বামীর সন্তান-সন্ততিরা তাঁরই গৃহে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। তাদেরকে দেখা শোনা করতে হয়। কর্মচারী, দাস-দাসীদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু তিনি এখন আর আগের কর্তৃত্ব করতে চান না। চান কেবল মহাপুরুষ মোহাম্মদের কর্মসহচরী হতে। তাঁরই সেবা-যত্ন ভালোবাসায় পূর্ণনিবেদিতা হতে। তাই করলেন তিনি। বিষয়-সম্পত্তি ব্যবসা এবং সাংসারিক সকল দায়িত্ব মহানবী স.কে বুঝিয়ে দিলেন। স্বামীকেই দিলেন সকল কিছুর ভার। আর নিজে ভার নিলেন কেবল একজনের। মহাকালের মহানতম পুরুষের।

সময় বয়ে চললো তার নিজস্ব নিয়মে নীরবে নিভৃতে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা মমতায় সারাক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন নবদম্পতি। তাঁরা যেনো সকল অবিশ্বাস, বচসা-কলহ, অনাবশ্যক মান-অভিমানের ঊর্ধ্বে। সকল নবীর মতো মোহাম্মদ মোস্তফা স.ও বৈভববিমুখ। সুতরাং তিনি কিছুকালের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। নিজের সঙ্গে রাখলেন কেবল অপার্থিব ভাবনা-বেদনাকে।

হজরত খাদিজাও স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, মহান ভাবনাবেদনার সাথে বিষয় সম্পত্তির সখ্য কোনোকালে হয়নি। এখনো হবে না। তিনি একে একে দরিদ্র মিসকিনদের মধ্যে দান করে দিলেন অলংকার, অর্থবিত্ত সবকিছু। এভাবে মিলিত হলেন— স্বামীর মহান ও পবিত্র ভাবনা-চিন্তার অগাধ সাগরে। সেখানেই হারিয়ে গেলেন। পেলেন অফুরন্ত শান্তির সাক্ষাত। অপেক্ষাগুলোকে জাগ্রত রাখলেন অনাগত কালের অবিনাশী কোনো আয়োজনের জন্য। তার প্রকৃতি ও স্বরূপ কী— তা তিনি জানেন না। কিন্তু বিশ্বাস করেন, সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন তাঁর প্রিয়তম স্বামীর দ্বারা সাধিত হবে মহাকল্যাণ। মহাকাল, মহাবিশ্ব ও মহামানবতা তাঁকে তাদের শিরোভূষণরূপে সাদরে স্বীকার করে নিবে।

জনক-জনকী হন তাঁরা। একে একে লাভ করেন ছয়জন সন্তান-সন্ততি— দুই পুত্র এবং চার কন্যা। দুই পুত্র— কাসেম ও তৈয়ব। দু'জনেই শিশুকালে পরপারে চলে যান। মহানবী স.কে অনেকে আবুল কাসেম বলে ডাকতে থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র তৈয়বের আর এক নাম ছিলো তাহের।

মক্কাবাসী সকলেই মহানবী স.কে ভালবাসতো। কিন্তু তাঁর সন্তান বিয়োগের পর এই প্রথম কতিপয় ব্যক্তি তাঁর নিন্দা করতে শুরু করলো। তাদের একজনের কথা তাফসীরে মাযহারীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে— বাগবী লিখেছেন— একবার রসুলেপাক স. কাবাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তখন সেখানে প্রবেশ করছিলো আস ইবনে ওয়াইল। বনী সাহাম তোরণে দু'জনের দেখা হলো। কিছু বাক্য বিনিময়ও হলো। কাবাপ্রাঙ্গণে বসে ছিলো কুরায়েশদের হোমরা চোমরারা। আস তাদের কাছে পৌঁছলে একজন বললো, কী নিয়ে আলাপ করলে? আস বললো, আলাপ করে আর কী হবে। সে তো নির্বংশ। তখন জননী খাদিজার সন্তান সদ্যবিগত হয়েছেন।

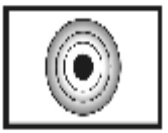
নির্বংশ গালি শুনে তিনি স. মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কেননা তিনি তো তাদের মতো নন। অন্যায়ের প্রতিশোধ তিনি অন্যায়ভাবে নিতে পারেন না। তিনি স. তো অশুভ কামনা থেকে পবিত্র।

চার কন্যার মধ্যে তিন কন্যা হচ্ছেন যয়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম। তাঁরা সকলেই ছিলেন রূপসী ও গুণবতী। বিবাহের বয়স হতে না হতেই তাঁদের সকলের বিয়ে হয়ে গেলো।

যয়নাবের বিয়ে হলো হজরত খাদিজার ছোটবোন হালার পুত্র আবুল আসের সঙ্গে। রুকাইয়া ছিলেন আরো অধিক রূপবতী। প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার আগেই তাঁর বিয়ে হলো আবু লাহাবের পুত্র উতবার সঙ্গে। কিছুদিন পরেই উতবার ছোটভাই উতাইবার সঙ্গে বিবাহ হলো উম্মে কুলসুমের। পরে ইসলামবিদ্বেষী আবু লাহাব

মহানবী স. এর ঘোর শত্রু হয়। সে তখন নবী কন্যাদ্বয়কে তালাক দিতে বলে। উতবা ও উতাইবাও ছিলো তাদের পিতার মতো কট্টর কাফের। তারা পিতার কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। মহানবী স. এর এই দুই কন্যা পরে তাঁর সাথে মদীনায় গিয়ে মিলিত হন। তিনি স. রুকাইয়াকে হজরত ওসমান রা. এর সঙ্গে বিবাহ দেন। তিনি বেশী দিন বাঁচেননি। হজরত ওসমান ছিলেন রসুলেপাক স. এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। তিনি স. উম্মে কুলসুমকেও হজরত ওসমানের সঙ্গে বিবাহ দেন। তখন থেকে হজরত ওসমানকে সকলে ডাকতে থাকে জিন্নূরাঈন (দুই নূরের অধিকারী) বলে।

মহানবী স. এর নবুয়তের গুরুদায়িত্ব লাভের এক বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর চতুর্থ ও শেষ কন্যা হজরত ফাতেমা যাহ্‌রা রা.। তাঁর বিবাহ হয় পরে, হিজরতভূমি মদীনায়। হজরত আলী রা. এর সঙ্গে।



নিজগৃহে বসবাস করলেও হজরত খাদিজা তাঁর শ্বশুর গোষ্ঠীর লোকদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। কুশল কামনা করতেন সকলের। কেউ এলে তাঁদেরকে অত্যন্ত সমাদর করেন। আপ্যায়ন করেন যথারীতি। হজরত আলী ইবনে আবু তালেব তখন বালক। তাঁকে নিয়ে আসেন নিজ সংসারে। প্রতিপালন করতে থাকেন পুত্রস্নেহে।

একবার এলেন মহানবী স. এর দুধমাতা হালিমা। হজরত খাদিজা তাঁকে আপন শ্বাশুরির মতো সম্মান ও সমাদর জানালেন। সেবা যত্ন করলেন। হালিমা দুগ্ধপুত্র ও পুত্রবধুকে জানালেন, আমাদের ওদিকে চলছে খরা। বৃষ্টি নেই। পানির অভাবে পশুপাখিরা মরে যাচ্ছে। অভাব অনটনে কষ্ট পাচ্ছে মানুষ। হজরত খাদিজা তাঁর স্বামীর মতামত নিয়ে তাঁকে দান করলেন চল্লিশটি ছাগল ও একটি উট।

আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুওয়ায়বাও ছিলেন মহানবী স. এর দুধমাতা। তিনিও মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি তাঁকেও ভালোবাসতেন খুব। আদর আপ্যায়ন করতেন হৃদয় দিয়ে। তাঁকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে ক্রয় করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবু লাহাব কিছুতেই তাঁকে বিক্রয় করতে সম্মত হয়নি। হাকীম ইবনে হিযাম ছিলেন তাঁর ভাইয়ের ছেলে। ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ার বাজারে গমনাগমন করতেন তিনি। একবার কিনে আনলেন কয়েকজন

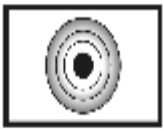
ক্রীতদাসকে। তাদেরকে নিয়ে তিনি হজরত খাদিজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ফুফু আম্মা! এদেরকে আমি সিরিয়া থেকে কিনে এনেছি। এদের মধ্যে আপনি যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি পছন্দ করলেন যায়েদ নামের এক দাসকে। তাঁকে মহানবী স. এর কাছে উপস্থিত করালেন। তিনি স. যায়েদকে দেখে খুশী হলেন। হজরত খাদিজা বললেন, একে আমি উপহার স্বরূপ দিলাম। তিনি স. আরো খুশী হলেন। তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন। গ্রহণ করলেন পালকপুত্র রূপে।

যায়েদ ছিলেন অভিজাত বংশের ছেলে। দাসব্যবসায়ীরা তাঁকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়। পরে তাঁর পিতা তাঁর সন্ধান পান। তাঁকে মুক্ত করতে উপস্থিত হন মহানবী স. সকাশে। কিন্তু যায়েদ তখন পিতার চেয়ে বেশী ভালোবেসে ফেলেছেন মহানবী স.কে। তাঁকে ছেড়ে যেতে তিনি রাজী হলেন না। থেকে গেলেন মহানবী স. এর বিশেষ সেবক হয়ে। এভাবে এক মহাপ্রশান্তির মধ্য দিয়ে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে যান হজরত খাদিজা। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামী সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি সংসার করেন বটে, কিন্তু সংসারাসক্ত নন। তাঁর সংসার বিশ্বসংসার। বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়ে তিনি ভাবেন। ভালোবাসেন দরিদ্র দুস্থ জনতাকে। দুঃখ দূর করতে পছন্দ করেন এতিম ও বিধবাদের। অত্যাচারিত, অবহেলিত যারা, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

শৈশবে তিনি সচক্ষে যুদ্ধ দেখেছিলেন। নিস্পৃহ অংশগ্রহণ করেছিলেন ফিজার যুদ্ধে। সেটি ছিলো এক ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতার রক্তপিপাসু রূপ দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। তখন থেকে তিনি কামনা করে আসছিলেন, কীভাবে স্থায়ী শান্তি, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সেই যুদ্ধ আবার শুরু হতে যাচ্ছিলো। তখন কুরায়েশদের প্রবীণ নেতারা এক সভা আহবান করলো। মহানবী স. এর চাচা হজরত যোবায়েরও ছিলেন তাদের অন্যতম। আর তরুণদের মধ্যে ছিলেন মহানবী মোস্তফা স. স্বয়ং। তিনিই প্রস্তাব করলেন প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করতে হবে। শান্তির পক্ষে স্বাক্ষর করতে হবে সকলকে। নাম হবে 'হিলফুল ফুজুল' (শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাপত্র)। শর্ত থাকবে এরকম— ১. দুস্থ ও বিপন্ন জনতার সেবা করতে হবে ২. দমন করতে হবে অত্যাচারীদেরকে ৩. অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়াতে হবে ৪. বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সদ্ভাব ৫. স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে এতিম ও বিধবাদের ৬. সব সময় থাকতে হবে শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুকূলে।

হজরত খাদিজা শান্তির সপক্ষে এই ঐতিহাসিক সংঘকে প্রায়শঃই অর্থ সাহায্য করেন। বলাবাহুল্য, এর পর থেকে যুদ্ধ আর সম্প্রসারিত হতে পারেনি।



কুরায়েশেরা কাবাগৃহের সংস্কার করতে চাইলো। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই সবিশেষ প্রয়োজন পড়লো পুনঃনির্মাণের । রোম থেকে আনা হলো এক নির্মাণ বিশেষজ্ঞকে। নাম তার ইয়াকুস। সে তার কাজ শুরু করলো। সকলে সহযোগী হলো তার। পাথর এনে জমা করতে লাগলো তার কাছে। নিজেদের পরনের লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপরে রেখে তার উপরে রাখলো পাথর। এভাবে উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ কিংবা কাবাগৃহের কোন কাজ করাকে তারা দূষণীয় মনে করতো না। ইসলামের যুগে এ অপপ্রথাটির মূলোচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু মহানবী স. তখনও এরকম অপকর্ম থেকে দূরে থাকতেন। তাঁকে এরকম করতে দেখে তাঁর চাচা হজরত আব্বাস তাঁকে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কাবার সম্মানে নির্বস্ত্র হতে বললেন। কিন্তু তিনি স. লুঙ্গি খোলার উদ্যোগ নিতেই বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পেতেই লুঙ্গি লুঙ্গি বলে চীৎকার শুরু করলেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— 'খম্‌মির আওরাতাকা' (সতর ঢাকাকে অপরিহার্য করে নাও)।

নির্মাণ কর্মশেষে আর একটি বিপত্তি দেখা দিলো— হাজারে আসওয়াদ (কৃষ্ণপ্রস্তর) দেয়ালগাত্রে স্থাপন করবে কে? প্রত্যেক গোত্রই দাবীদার হলো। এমতো মহান কর্মে অংশগ্রহণ করে সম্মানিত হতে চাইলো সকলেই। শুরু হলো বাদানুবাদ, বচসা, কলহ। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ উপস্থিত হবার উপক্রম হলো। এক পর্যায়ে সকলে এই মর্মে একমত হলো যে, আগামী কাল ভোরে সর্বপ্রথম কাবাপ্রাঙ্গণে যাকে দেখা যাবে, তাকেই সালিশ নিযুক্ত করা হবে। পরদিন সকালে সর্বপ্রথম কাবা প্রাঙ্গণে দেখা গেলো মহানবী স.কে। তাঁকে দেখে সকলে প্রসন্ন হলো। বললো, আল আমীনকেই এবার সিদ্ধান্ত দিতে হবে। মহানবী স. তাঁর উত্তরীয় খানি মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। হাজারে আসওয়াদ নামের পাথরটিকে মাঝখানে রাখলেন। বললেন, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে এগিয়ে আসুন। চাদরের কিনারা ধরুন। প্রতিনিধিগণ চাদরের কিনারা ধরলেন। তিনি স. বললেন, এবার চলুন দেয়ালের দিকে। তারা নির্দেশ পালন করলো। তিনি স. তখন স্বহস্তে পাথরটি নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন মহানবী স. এর বয়স হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর। তখন থেকেই তাঁর অভ্যন্তরীণ সংসার আসক্তির প্রভাব বাইরে প্রকাশ পেতে শুরু

করলো। সকলে দেখলো, তিনি স. সংসারসম্পৃক্ত থেকেও পৃথক। সারাক্ষণ, সারাবেলা তিনি স. যেনো কার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। কিসের জন্য যেনো তাঁর সতত প্রতীক্ষা। আশা ও অপেক্ষা।

গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন মাঝে মাঝে। আশে পাশের পাহাড়ের পাদদেশে কিংবা চূড়ায় নির্জনে বসে থাকেন। শেষে নির্বাচন করেন নিভৃততম এক ঠিকানা— হেরা পর্বতশৃঙ্গের নির্জনতম একটি গুহা। সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যান। চেষ্টা করেন নিজের সীমানা অতিক্রম করতে। স্পর্শ পেতে অসীমের। অনুভব করতে চান তাঁকে, যিনি দৃশ্যের অতীত। উপস্থিত হতে চান সেখানে, যেখানে সময় ও সীমানা বলে কিছু নেই। এই যে পৃথিবী, মহাপৃথিবী— কার জন্য? কেনো? মানুষ আসছে। চলে যাচ্ছে। কার কাছে যাচ্ছে? নিসর্গ মহানিসর্গ জুড়ে সৃজন-নির্মাণের এই মেলা, খেলা, লীলা-রহস্য কেনো এতো নিখুঁত, নিয়মাবদ্ধ। কে এর নিয়ন্ত্রয়িতা? মহাজীবন কী? মহাসত্য কী?

হেরা পর্বতে তাঁর যাতায়াত চলতেই থাকে। কয়েকদিনের খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যান। সেগুলো ফুরিয়ে গেলে ঘরে ফিরে আসেন। কখনো আবার আসেনও না। তখন পর্বতগুহায় খাদ্য পানীয় নিয়ে উপস্থিত হন হজরত খাদিজা। তিনিও সর্বোতভাবে চান এই মহান পুরুষের সাধনা-আরাধনায় ছেদ না পড়ুক। আর অন্তর দিয়ে কামনা করেন, তিনি যেনো সফল হন। যা চান, তা যেনো পান।

নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাস আগে থেকে নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা ঘটলো। প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি স.। শুভ ও সত্য স্বপ্ন। যা দেখতেন, বাস্তবে তা-ই প্রতিফলিত হতো। এভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হলো। রমজান মাস এসে গেলো। ২৭ রমজানের রাত্রি। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন মহানবী স.। সহসা গুহামধ্যে প্রকাশিত হলো সুপ্রখর জ্যোতিচ্ছটা। ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। দেখলেন, সামনেই আবির্ভূত হয়েছেন এক জ্যোতিষ্মান ব্যক্তিত্ব। তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাইল। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে এই শুভ সংবাদটি জানাতে বলেছেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। সুতরাং আপনি জ্বিন ও মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার দাওয়াত দিন। এর পর তিনি বেহেশতি রেশমী বস্ত্রসদৃশ কোনোকিছুতে লিখিত বাণী বের করলেন, যা ছিলো মোতি ও ইয়াকুত দ্বারা কারুকর্মখচিত। বললেন, পাঠ করুন। মহানবী স. বললেন, আমি তো (অন্যদের মতো) পাঠক নই, (আমি তো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। জিব্‌রাইল তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, এবার পড়ুন। তিনি স. বললেন, আমি (অসাধারণ, তাই সাধারণদের মতো করে) পাঠ করতে পারি না। জিব্‌রাইল তাঁকে আবারও বুকে চেপে ধরলেন। অল্পক্ষণ পরেই ছেড়ে

দিয়ে বললেন, এবার পড়ুন। অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী এবার রসুলসুলভ নিয়মে উচ্চারণ করে গেলেন প্রথম প্রত্যাদেশ 'পাঠ করো তোমার প্রভুপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করো, আর তোমার প্রভুপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

জিব্‌রাইল এবার মাটিতে পদাঘাত করলেন। মাটি ফুঁড়ে ঝরনা বের হলো। ঝরনার পানি দিয়ে তিনি ওজু করলেন। কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, মস্তক মসেহ্ করলেন। দুই হাত ও দুই পা ধৌত করলেন। এভাবে রসুলে পাক স.কে ওজু করতে বললেন। তিনি স. ওজু করলেন। এরপর জিব্‌রাইল এক আঁজলা পানি নিয়ে রসুল স. এর পবিত্র চেহারার উপরে ছিটিয়ে দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। রসুল স. হলেন তাঁর অনুগামী। নামাজ শেষে বললেন, এভাবে ওজু করবেন এবং নামাজ পড়বেন। একথা বলেই তিনি অসীম আকাশের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নির্বাক নবী সেদিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রত্যাদেশের ভারে তিনি অবসন্ন। সমগ্র সত্তা জুড়ে বয়ে যাচ্ছে আনুরূপ্যবিহীন শিহরণ ও বিস্ময়। অনন্ত জ্যোতির অভিঘাতে কাঁপছে অন্তর বাহির। স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার চেষ্টা করলেন। মনে পড়লো প্রিয়তমা ভার্যার কথা। এখন প্রয়োজন কেবল তাঁর সান্নিধ্য।

সারাটা পথ জুড়ে তিনি স. পেলেন উদার প্রকৃতির প্রেমময় সম্বর্ধনা। চারিদিক থেকে উচ্চারিত হতে লাগলো, আংতা রসুলাল্লাহ্ (তুমি আল্লাহ্‌র রসুল)। বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরখণ্ডগুলো বলতে লাগলো, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্।

গৃহে প্রবেশের সাথে সাথে হজরত খাদিজা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। চিরচেনা স্বামী যে আজ ভিন্নরূপে জ্যোতিষ্মান। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নূর। শুধু নূর। তিনি বিস্মিত ও বিমোহিত হলেন। মহানবী স. বললেন, যাম্মিলুনী, যাম্মিলুনী (আমাকে কম্বলাবৃত করো, কম্বলে ঢেকে দাও)। হজরত খাদিজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলেন ঠাণ্ডা পানি। কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর মহানবী স. তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণীকে সবকিছু খুলে বললেন। শেষে প্রশ্ন করলেন, আমার ভয় হচ্ছে। আমি কি বিপদকবলিত? হজরত খাদিজা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তা কেনো হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আল্লাহ্ আপনাকে বিপদে ফেলবেন না। নিশ্চয়ই তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। আপনি মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। অনাথদের প্রতিপালন করেন। অতিথিদের সমাদর করেন। আরাধনা করেন কেবল আল্লাহ্‌র। নিরন্নদের অন্ন যোগান এবং

সাহায্য করেন শ্রমজীবিদেরকে। সদাচরণ ও কল্যাণকামিতা আপনার স্বভাব। মানুষকে শুভকাজ করতে বলেন। বিরত থাকতে বলেন অশুভ কাজ থেকে। আপনি পিতৃমাতৃহারাদের আশ্রয়। আপনি সত্যবাদী। আমানতদার।

হজরত খাদিজার সান্ত্বনা, শুশ্রূষা ও অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন মহানবী স.। কিন্তু অজানা এক বিহ্বলতা ও শঙ্কা থেকে কিছুতেই যেন মুক্তি পাওয়া যাচ্ছিলো না। হজরত খাদিজা তাঁকে নিয়ে গেলেন ধর্মবিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে। বললেন, মান্যবর ভ্রাতঃ! আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা একটু শুনে দেখুন তো।

ওয়ারাকা তখন বয়োবৃদ্ধ। কুরায়েশদের পৌত্তলিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। নবী ঈসা আ. এর ধর্মমতানুসারে জীবনযাপন করতেন তিনি। ছিলেন ইঞ্জিল শরীফের পণ্ডিত। ইবরানী ভাষা জানতেন। আরবী ভাষায় ইঞ্জিল তরজমা করে শোনাতেন। সব শুনে ওয়ারাকা আবেগ ও উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলেন, নামুস! নামুস! নবী ঈসার নিকটেও তিনি প্রত্যাদেশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে মোহাম্মদ! আপনাকে অভিনন্দন। আল্লাহ্পাক আপনাকে তাঁর প্রত্যাদেশবাহক বানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ওই রসুল, হজরত ঈসা যাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন। বলেছেন, আমার পরবর্তী রসুলের নাম হবে মোহাম্মদ। এবার শুনুন অচিরেই আপনাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম। অস্ত্রধারণ করতাম আপনার পক্ষে। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো আপনাকে এখান থেকে বের করে দিবে।

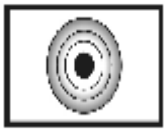
মহানবী স. বললেন, সত্যিই কি এরকম ঘটবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ। আপনি যা নিয়ে এসেছেন, ইতোপূর্বে কেউই তা আনেননি। হায়! তবুও আপনাকে শত্রু মনে করা হবে। আপনাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হবে। আল্লাহ্র বিধান যে এরকমই। সকল নবীর সঙ্গে এভাবেই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ওয়ারাকার শুভ আশা পূরণ হয়নি। অল্পকাল পরেই তাঁকে পাড়ি জমাতে হয়েছিলো পরবর্তী পৃথিবীতে।

উতবা ইবনে রবীয়ার ক্রীতদাস আদ্দাস ছিলেন খ্রিষ্টান। ছিলেন ধার্মিক ও জ্ঞানী। তাঁর জন্মস্থান ছিলো নিন্ওয়া (নিনেভ) নামক শহরে, যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী ইউনুস আ.। কৌতূহল নিবারণের জন্য হজরত খাদিজা তাঁর কাছেও গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, জিব্রাইল সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো? তিনি বললেন, কুদ্দুস! কুদ্দুস! (পবিত্র! পবিত্র!) হজরত খাদিজা বললেন, তাঁর সম্পর্কে আর কী জানা আছে বলো? তিনি জবাব দিলেন, জিব্রাইল হচ্ছেন আল্লাহ্ ও তাঁর নবীগণের সংযোগরক্ষক পরম বিশ্বাসী সত্তা। তিনি মুসা ও ঈসা নবীদ্বয়ের কাছেও এসেছিলেন।

হজরত খাদিজা আরো অধিক নিশ্চিতির জন্য বিষয়টিকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। একদিন একান্তে বললেন, হে আমার পিতৃব্যপুত্র! আপনার সাথী জিব্‌রাইল হয়তো আবার আসবেন। এলেই আমাকে জানাবেন।

মহানবী স. জিব্‌রাইল আমীনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু না। তিনি আর আসেন না। বেশকিছুদিন কেটে গেলো এভাবে। পাহাড়-পর্বতে নির্জনে বসে থাকেন তিনি। ভাবনার অতল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। একদিন মক্কার আজইয়াদ নামক পাহাড়ে বসে আছেন। অকস্মাৎ দেখলেন দিগন্ত রেখা জুড়ে এক পায়ের উপরে আরেক পা উঠিয়ে বসে আছেন এক অলৌকিক আকৃতি। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছেন, হে মোহাম্মদ! আমি জিব্‌রাইল। মহানবী স. ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ বাড়িতে গিয়ে হজরত খাদিজাকে বললেন, জিব্‌রাইল এসেছেন। ওই যে আকাশে। হজরত খাদিজা আকাশের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি মহানবী স.কে তাঁর ডান উরুর উপরে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাঁকে এখনো দেখতে পাচ্ছেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এবার তিনি মহানবী স.কে বসালেন তাঁর বাম উরুর উপর। জিজ্ঞেস করলেন, এখন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এখনও দেখতে পাচ্ছি। হজরত খাদিজা এবার শিথিলবসনা হলেন। খুলে ফেললেন বুকের ওড়না। তারপর বললেন. এবার? তিনি স. বললেন, না। তিনি এখন অন্তর্হিত। হজরত খাদিজা বললেন, নিশ্চয় তিনি ফেরেশতা। শয়তান নয়। কারণ ফেরেশতারা লজ্জাবান, আর শয়তান নির্লজ্জ।



নতুন প্রত্যাদেশের আশায় ব্যাকুল হয়ে থাকেন মহানবী স.। কিন্তু না। প্রত্যাদেশ আর আসেই না। ব্যর্থতার গায়ে বার বার বাড়ি খেতে থাকে তাঁর আবেগ, আশা ও অপেক্ষাগুলো। মনোকষ্টে জর্জরিত হতে থাকেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, এরকম নিষ্ফল জীবন আর রেখে কী হবে। জীবনাবসান না হওয়া পর্যন্ত শান্তির সাক্ষাৎ হয়তো আর পাওয়া যাবে না। পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করলেই ভালো। তিনি যখন আত্মহননের উদ্যোগ নেন তখন আবির্ভূত হন জিব্‌রাইল আমীন। বলেন, মোহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি আপনার ভ্রাতা।

মহানবী স. সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। প্রভুপালকের মহাবাণী লাভের আশাগৃহে আবার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতীক্ষাগুলোও প্রতীক্ষা করতে থাকে। এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় পুরো তিনটি বছর। মাদারেজুন্ নবুওয়াত গ্রন্থে আছে, নবী করিম স. এর বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার পর তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। তারপর তাঁর সাথে একটানা তিন বছর অবস্থান করেন ইস্রাফিল ফেরেশতা। তিনি তাঁকে স. কিছু কথা ও কতিপয় বিষয় শিখিয়ে দেন। তখন তাঁর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো। এভাবে তিন বছর অতিবাহিত হলো। এবার স্থায়ীভাবে তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করলেন জিব্রাইল ফেরেশতা। এরপর বিশ বছর ধরে তাঁর কাছে ওহী নাযিল হতে থাকে।

এর মধ্যে ঘটে যায় একটি বিশেষ ঘটনা। একদিন হজরত খাদিজা রসুলুল্লাহ্ স. এর খোঁজে নিকটস্থ পাহাড়গুলোর দিকে গমন করলেন। হঠাৎ দেখলেন সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্বেতশুভ্র বসন পরিহিত এক অপরিচিত লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মোহাম্মদের খোঁজ করতে যাচ্ছেন? হজরত খাদিজা ভয় পেলেন। লোকটির কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না। রহস্যময় লোকটির সহসা অন্তর্ধান ঘটলো। তিনি কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মহানবী স. এর সাক্ষাত পেলেন। তাঁকে খুলে বললেন সব। তিনি স. বললেন, ভয়ের কিছু নেই। জিব্রাইল দেখা করেছিলেন তোমার সঙ্গে। একটু আগে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। বলে গেলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিছু খাদ্য ও পানীয় নিয়ে একটু পরই আপনার কাছে আসবেন খাদিজা। আপনি তাঁকে আমাদের প্রভুপালক ও আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর এই সুসংবাদটি জানাবেন যে, আল্লাহ্ জান্নাতে তাঁর জন্য মণিমুক্তা খচিত একটি মহামর্যাদামণ্ডিত বাসভবন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সুসংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন মহাপুণ্যবতী খাদিজা। প্রত্যুত্তরে বললেন, ইন্নাল্লহা হুয়াস্ সালাম ওয়া আ'লা জিবরিলিস্ সালাম ওয়া আ'লাইকাস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

এক সময় মহানবী স. এর তিক্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। প্রত্যাদেশপ্রবাহ শুরু হলো পুনরায়। অবতীর্ণ হলো 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠো, আর সতর্ক করো, এবং তোমার প্রভুপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলো, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান কোরো না। এবং তোমার প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।'

'সতর্ক করো' এই নির্দেশানুসারে মহানবী স. তাঁর মহান ধর্মমত ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। প্রথমে আহবান জানালেন প্রাণের প্রিয়তমা সুখ-দুঃখের সাথী হজরত খাদিজা তাহেরাকে। বললেন, আমার ধর্মাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করো। বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। মহাসত্যের প্রথম আলো

সর্বপ্রথম হজরত খাদিজার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি বললেন, বিশ্বাস করলাম আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই, আর মোহাম্মদ নিশ্চয় আল্লাহ্র বাণীবাহক। তাঁর বয়স তখন ৫৫ বছর।

মহানবী স. তাঁর নিকটজনদেরকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরাও সাড়া দিলেন। নতুন এই ধর্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন মহানবী স. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথী প্রিয় বাল্যবন্ধু হজরত আবু বকর। ইমান আনলেন হজরত আলী। তিনি তখন দশ বছরের বালক। পালকপুত্র যায়েদও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন ইসলাম।

হজরত আবু বকরও হলেন প্রচারকর্মের সক্রিয় সহযোগী। তাঁর শুভপ্রচেষ্টার ফলে ইসলাম গ্রহণ করলেন সর্বহজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, যোবায়ের ইবনে আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্।

এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। মুসলমান হলেন আরো কিছুসংখ্যক সত্যান্বেষী ব্যক্তিত্ব। যেমন আবু উবায়েদ, আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাররাহ্, আবু সালামা ইবনে আবদুল্লাহ্। এই মহান কাফেলায় আরো শরীক হলেন আরকাম ইবনে ওসমান ইবনে মাযউন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, সাঈদ ইবনে যায়েদ। ক্রীতদাসগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন হজরত বেলাল। আর মেয়েদের মধ্যে হজরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মে ফজল এবং হজরত আবু বকর তনয়া আসমা।

নতুন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো 'যা কিছু করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে করো। আমন্ত্রণ জানাও প্রকাশ্যে। আর মুশরিকদের দিক থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো।' এবার মহানবী স. প্রকাশ্যে ও সুদৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মপ্রচার শুরু করলেন। বলতে শুরু করলেন, প্রতিমা ও প্রতিমাপূজারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

ক্ষিপ্ত হলো কুরায়েশেরা। প্রতিমাপূজার নিন্দা তারা সহ্য করতে পারলো না। কিন্তু তেমন কিছু করতেও পারলো না এজন্য যে, হজরত আবু তালেব তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্ষতি হোক— তাও কামনা করলেন না।

একদিন প্রতিমাপূজারীরা দল বেঁধে হজরত আবু তালেবের সঙ্গে দেখা করতে এলো। সেখানে উপস্থিত মহানবী স. তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তারা ক্ষেপে গেলো। বললো, আবু তালেব! মোহাম্মদের পক্ষ অবলম্বন করছেন কেনো? সে তো ধর্মদ্রোহী। পিতৃপুরুষদের ধর্ম অস্বীকারকারী। তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। হজরত আবু তালেব বললেন, উটনী যদি তার বাচ্চা ছেড়ে থাকতে পারতো, তাহলে আমিও মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে

পারতাম। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ এরকম— মোহাম্মদ! তোমার প্রতিপক্ষীয়রা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি নির্ভয়ে তোমার প্রচারকর্ম চালিয়ে যাও। তোমার চোখ চিরশীতল থাকুক। তুমি তো মানুষকে কল্যাণের দিকেই ডাকছো। নিশ্চয়ই তুমি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত। তুমি এমন এক ধর্মের প্রচারক, যে ধর্ম নিঃসন্দেহে সকল ধর্মাপেক্ষা উত্তম। মানুষের নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় যদি আমার না থাকতো, তবে আমিও প্রসন্ন অন্তকরণে তোমার ধর্মমত গ্রহণ করতাম।

কিছুদিন পর পর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে লাগলো। মহানবী স. ক্রমাগত হতে লাগলেন অধিক, অধিকতর উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত। তাঁর জ্যোতির্ময় ও সুবলিষ্ঠ বক্তব্য বার বার আঘাত করতে লাগলো পৌত্তলিক মতাদর্শের কঠিন দেয়ালে। কুরায়েশ কাফেররা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করলো বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন উপায়ে। কেউ বললো, মোহাম্মদ তো যাদুকর। কেউ বললো, কবি। আবার কেউ বললো, গণক, যাদুকর। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করলো, মোহাম্মদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

কোনো কোনো হতভাগা তাঁর শরীরে ময়লা নিক্ষেপ করতো। তাঁর ঘরের দরজায় রক্ত মাখিয়ে রাখতো। তাঁর চলাচলের পথে বিছিয়ে রাখতো কাঁটা। কখনো কখনো তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতো পাথর। কাবাপ্রাঙ্গণে তিনি স. যখন কোরআন আবৃত্তি করতেন, তখন দুই কান বন্ধ করে রাখতো তারা। কখনো হাততালি দিয়ে, শিস বাজিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

একদিনের ঘটনা। কাবাপ্রাঙ্গণে একদিন তিনি স. সেজদা দিয়ে ছিলেন। এক দুর্ভাগা তাঁর গলায় এমন চাপ দিলো যে, তাতে করে তাঁর দুচোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত আবু বকর। দুর্বৃত্তটিকে বাধা দিলেন। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করে বসলো হজরত আবু বকরকে। তাঁর দাড়ি ধরে সজোরে টান দিলো। ফলে উৎপাটিত হলো কয়েকগাছি চুল। এরপর সে মাথায় আঘাত করলো। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ্ই আমার প্রভুপালক। তিনি তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুপালকের দলিল প্রমাণসহই আগমন করেছেন।

আর একদিনের ঘটনা। মহানবী স. কাবা শরীফের সন্নিকটে নামাজ আদায় করছিলেন। কাফের কুরায়েশদের একজন বললো, তোমরা কি ওকে দেখতে পাচ্ছো। তোমরা কেউ কি যবেহকৃত উটের নাড়িভুঁড়ি এনে মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তার কাঁধের উপরে চাপিয়ে দিতে পারো? একথা শোনার সাথে সাথে উকবা ইবনে আবী মুঈত উঠে চলে গেলো। একটু পরেই উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে হাজির হলো। চাপিয়ে দিলো সেজদারত নবীর কাঁধের উপরে।

তিনি স. সেজদা থেকে মাথা ওঠাতে পারলেন না। এই দেখে তারা শুরু করলো হাসি তামাশা। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা। তিনি তখন বালিকা। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে দিলেন। গালমন্দ করলেন কাফেরদেরকে। পিতার হাত ধরে ফিরে এলেন বাড়িতে।

এভাবে দিন যায়। রাত যায়। কাফেরদের অত্যাচার বাড়তে থাকে। কিন্তু ইসলামের নূর তাতে নির্বাপিত হয় না। বরং অধিকতর প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নতুন নতুন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের স্বরূপ হয়ে ওঠে অধিকতর প্রকট। অবতীর্ণ হয়— 'বলো, তিনিই আল্লাহ্, এবং অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই'।

হজরত খাদিজা কষ্ট পান সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার তাঁর হৃদয়কে রক্তাক্ত করে দেয়। আঘাতে আঘাতে তিনি পাথর হয়ে যান। কিন্তু ভেঙে পড়েন না। প্রিয়তম নবী ও স্বামীকে সান্ত্বনা দেন। বলেন, আপনি সত্যাধিষ্ঠিত। আপনি আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। আপনার পূর্বের বাণীবাহকগণ সকলেই অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু কখনোই পশ্চাৎপদ হননি। আপনিও হবেন না। নিশ্চয় সম্মুখে রয়েছে সাহায্য ও বিজয়।

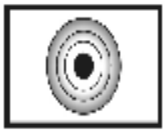
হজরত খাদিজাও তাঁর গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান। তাঁর আহবানে সাড়া দেন অনেকেই। তাঁর পিতৃকুল বনী আসাদ ইবনে আবদিল উয্যার পনেরো জন প্রভাবশালী ব্যক্তি জীবিত ছিলেন তখন। তাঁদের মধ্যে দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরকম ঘটে প্রধানতঃ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কারণে। তিনি ছিলেন বহুলোকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী।

অতি ধীরে হলেও মুসলমান জনতার সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তাঁদের মধ্যে প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন যাঁরা, তাদের উপর চলতে থাকে অকথ্য নির্যাতন। তারা বলতে থাকে, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করো। হজরত বেলালের মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ প্রায়শঃ তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে খালি গায়ে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। তাঁর শরীরে উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে দাগ দিতো। কখনো প্রহার করতো লাঠি দ্বারা। হজরত বেলাল উচ্চারণ করতেন, আহাদ আহাদ।

হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং তাঁর পিতামাতাকেও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করলো কাফেরেরা। একদিন তারা হজরত আম্মারকে প্রখর রোদে গরম বালির উপরে শুইয়ে নির্যাতন চালাচ্ছিলো। মহানবী স. সে দিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি স. বললেন, হে ইয়াসারের পুত্র! সবর করো। তাঁর মাতা হজরত সুমাইয়াকে নির্যাতিতা হতে দেখে বললেন, সুমাইয়া! তোমাকে জান্নাতের

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। একদিন মাতা-পুত্র দুজনকেই হত্যা করলো তারা। তাঁরা লাভ করলেন ইসলামের প্রথম শহীদানের মর্যাদা।

নির্যাতন-অত্যাচারের সকল সংবাদই হজরত খাদিজা রা. এর কানে পৌঁছে। তাঁর অন্তরে জ্বলতে থাকে দুঃখ-কষ্টের অসহনীয় আগুন। কিন্তু সে আগুনকে তিনি বাইরে প্রকাশ করেন না। ধৈর্য-সহিষ্ণুতার নীরব পর্বত হয়ে যান। ব্যথিত রসুলের পাশে গ্রহণ করেন সার্বক্ষণিক অবস্থান। হয়ে যান শান্তিবাণী, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা। বিশ্বাস করেন এবং মুগ্ধ হয়ে শোনেন মহান আল্লাহ্তায়ালার সুন্দর ও শক্তিময় বাণী— 'ওরা কি বলে, আমরা সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অধিকন্তু কিয়ামত তাঁদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর, নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সে দিন বলা হবে 'জাহান্নামের আস্বাদন গ্রহণ করো'। আমি সকল কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মতো। আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মতো দলগুলোকে। অতএব, এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'



সাহাবীগণের উপরে জুলুম-নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করলো, তখন মহানবী স. তাঁদেরকে হিজরতের আদেশ দিলেন। এগারো জন পুরুষ ও পাঁচজন নারীর হিজরতকারী দলটি মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন সঙ্গোপনে। সমুদ্র তীর পর্যন্ত পদব্রজে গেলেন তাঁরা। তারপর নৌকাযোগে যাত্রা করলেন আবিসিনিয়ার দিকে। সেখানকার সম্রাটের উপাধি ছিলো নাজ্জাশী। তাঁর আসল নাম ছিলো আসমাহা।

মহানবী স. এর প্রিয় কন্যা রুকাইয়া ও তাঁর স্বামী হজরত ওসমানও ছিলেন ওই দলে। হজরত খাদিজা গোপনে চোখের জল ফেললেন। কন্যা জামাতাকে সমর্পণ করলেন আল্লাহ্র কাছে। অনেক আশীর্বাদ করলেন বেদনাময় হৃদয় থেকে। মহানবী স. বললেন, আল্লাহ্র নবী লুতের পরে সস্ত্রীক হিজরতকারী ওসমান ইবনে আফ্ফান।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো অচিরেই। মুশরিকেরা ক্ষিপ্ত হলো খুব। মুসলমানদের উপরে আরো অধিক অত্যাচার শুরু হলো। কিন্তু এবার ঘটলো আশ্চর্য কিছু ঘটনা। ইসলাম গ্রহণ করলেন বীরশ্রেষ্ঠ হজরত ওমর

ও শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযা। মুসলমানেরা আনন্দিত হলেন। মুশরিকেরা হলো বিষণ্ন। মহানবী স. এবং হজরত খাদিজা আল্লাহ্পাকের দরবারে জানালেন অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। এবার প্রচারকর্ম চললো আরো জোরে সোরে। মুশরিকের দল প্রথম প্রথম একটু হতোদ্যম হলো বটে, কিন্তু পরে বিরোধিতা শুরু করলো পূর্বাপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী উৎসাহভরে।

এভাবে বহু বিপদ-মুসিবতের মধ্য দিয়ে কেটে গেলো সাতটি বছর। কুরায়েশ কাফেরেরা দেখলো, হজরত হামযা ও হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে নতুন এই ধর্মমতটির সম্মান ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় চলে যাচ্ছেন। এভাবে আরব দেশের বাইরেও ধর্মপ্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তারা হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলো। ঠিক করলো, এবার একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মহানবী স.কে হত্যা করার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলো। মান্যবর আবু তালেবের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাইলো তারা। দলবদ্ধভাবে তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাকে বলে দিন, সে যেনো আমাদের পরম পূজনীয় প্রতিমাগুলোর সমালোচনা আর না করে। তারা চলে যাওয়ার পর তিনি মহানবী স.কে ডেকে বললেন, তোমার গোত্রের লোকেরা এসেছিলো। তারা আমাকে এভাবে হুমকি দিয়ে গেলো। এবার তুমি তোমার জীবনের প্রতি একটু সদয় হও। আমরা তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি না। তিনি স. বললেন, প্রিয় খুল্লতাত! আপনি কি এরকম ভাবেন যে, আমি আপনার উপর ভরসা করে ইসলাম প্রচার করছি? কখনোই নয়। আমার প্রিয়তম প্রভুপালকই আমার প্রকৃত সাহায্যকারী। আমি তাঁরই উপরে নির্ভর করি। পরিচালিত হই তাঁরই নির্দেশে। সত্যের প্রচার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে একাজ চালিয়ে যেতেই হবে। আপনি যদি ইসলাম কবুল করেন এবং আমার অনুগামী হয়ে যান, তবে হবেন মহাসৌভাগ্যশালী। আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু তালেব তাঁর এই পুত্রাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রটির কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তবুও ইসলাম গ্রহণ করলেন না। কিন্তু বললেন, কাজ চালিয়ে যাও। কাবার প্রভুর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, কেউ তোমাকে অবনত করতে পারবে না। তোমাকে প্রতিহত করে এমন সাধ্য কারো নেই।

হজরত খাদিজাও একইভাবে মহানবী স.কে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন। এতো ভীতিপ্রদ হুমকি শুনেও দুঃশ্চিন্তিত হন না। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্পাক তাঁর নবীকে সফল করবেনই। সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয়, যেদিন মহাসত্যের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে বহুসংখ্যক মানুষ। আর শত্রুরা হবে পরাভূত। হবেই।

আবু লাহাব ছিলো মহানবী স. এর গোত্রের— হাশেমী বংশের। কিন্তু সে হয়ে গেলো চরমতম শত্রু। সে আবু জেহেল ও অন্যান্য কুরায়েশ সরদারদের নিয়ে শলাপরামর্শ করতে বসলো। একটি অশুভ ও অপবিত্র সভায় সকলে এই মর্মে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বনী মুত্তালিব ও হাশেমী গোত্রকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের সাথে কেউ বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, মেলা-মেশা ও ওঠা-বসা করতে পারবে না। কথাবার্তাও বলতে পারবে না। এরকম শর্তের উপর তারা লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হলো। চুক্তিনামাটি ঝুলিয়ে দিলো কাবাগৃহের দরজায়। প্রধান শর্তটি লিপিবদ্ধ ছিলো এভাবে— বনী হাশেম ও বনী আবদুল মোত্তালিবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যতদিন না মোহাম্মদকে হত্যা করা হবে।

মহানবী স. তাঁর প্রিয়তম ভার্যা হজরত খাদিজা, প্রিয় পুত্রী ফাতেমা, সকল মুসলমান ও ভক্ত অনুরক্তদের নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন শিয়াবে আবু তালেব নামক উপত্যকায়। হজরত আবু তালেব মুসলমান না হয়েও মহানবী স. এর পক্ষাবলম্বন করলেন। চরম দুঃখ-কষ্টে জীবন কাটতে লাগলো তাঁদের ।

ইবনে ইসহাকের বিবরণে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য খাদিজা রা. ছিলেন সত্য ও উপযুক্ত মন্ত্রণাদাত্রী। তিনি স. সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলতেন। পরামর্শ ও সান্ত্বনা কামনা করতেন। তাঁর নবুওয়াতের প্রচার দায়িত্বের সপ্তম বছরে মুহররম মাসে কুরায়েশেরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। তাঁরা শিয়াবে আবু তালেবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হজরত খাদিজা রা.ও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশেম দারুন অভাব ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। বেশীর ভাগ সময় তাঁদেরকে গাছের পাতা খেয়ে থাকতে হতো। স্বামীর সাথে খাদিজা রা. সেখানে হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য করেন। কখনো নিজের প্রভাব খাটিয়ে নানা উপায়ে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কখনো পারতেন না। তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র— হাকীম ইবনে হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুমআ ইবনে আসওয়াদ ছিলেন কুরায়েশদের নেতৃস্থানীয়। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো কখনো একঘরে করা মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠাতে সক্ষম হতেন।

একদিন হাকীম ইবনে হিযাম চাকরের মাথায় কিছু গম উঠিয়ে নিয়ে তার ফুফুজান হজরত খাদিজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পথে দেখা হলো নরাধম আবু জেহেলের সঙ্গে। সে রাগতঃ কণ্ঠে বললো, খাদ্য নিয়ে তুমি বনী হাশেমের কাছে যাচ্ছো? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে খাদ্য নিয়ে সেখানে যেতে দিবো না। যদি যাও, তবে আমি তোমাকে মক্কায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন আবুল বুখতারী ইবনে হাশেম। বললেন কী ব্যাপার! তোমরা ঝগড়া করছো কেনো? আবু জেহেল বললো, সে বনী হাশেমের কাছে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বুখতারী বললো, এ খাদ্য তো তার

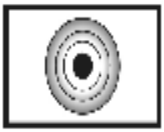
ফুফুর। ওর কাছে জমা ছিলো। ফুফুর খাদ্য সে দিতে যাচ্ছে। আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছো। ছাড়ো। পথ ছাড়ো। আবু জেহেল সরে দাঁড়ালো না। বচসা-কলহ শেষে মারামারি পর্যন্ত পৌঁছলো। এরকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও হাকীম কখনো কখনো খাদ্য পাঠাতে সক্ষম হতো।

একদিনের ঘটনা। মহানবী স. এর সঙ্গে অন্তরীণ তাঁর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস খাদ্যসংগ্রহের আশায় শিয়াবে আবু তালেব থেকে বের হয়ে এলেন। আবু জেহেল তাঁর উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করলেন। একথা হজরত খাদিজা জানতে পেরে তাঁর চাচা যুমআ ইবনে আল আসাদকে লোক মারফত বলে পাঠালেন, আবু জেহেল খাদ্যক্রয়ে বাধা দিচ্ছে। তাকে শাসিয়ে দিনতো। যুমআ হজরত খাদিজার কথায় সাড়া দিলেন। আচ্ছা করে তাকে শাসালেন। তখন থেকে সে কিছুটা সংযত হতে বাধ্য হয়।

সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেলো। সময়ের প্রভাবে পরিস্থিতির অদল বদল হলো কিছুটা। অবতীর্ণ হলো— 'তারা চায় আল্লাহ্র নূরকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে ফেলতে, আর আল্লাহ্ চান তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করতে, যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তা অপছন্দ করে।'

কুরায়েশ নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। তাদের কারো কারো মনকে আল্লাহ্পাক নরম করে দিলেন। তারা মন্তব্য করতে লাগলো চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলা হোক। শুরু হলো পক্ষীয়-বিপক্ষীয়দের তর্ক-বিতর্ক। শেষে সকলে সিদ্ধান্ত নিলো, ঠিক আছে চুক্তিনামাটি উপস্থিত করা হোক। তখন হজরত আবু তালেব বললেন, মোহাম্মদ কী বলেছে শোনো। বলেছে, আল্লাহ্ ওই চুক্তিনামার উপরে ঝি ঝি পোকাকে নিয়োজিত করেছেন। পোকাগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নাম ছাড়া সকল বিবরণ খেয়ে ফেলেছে। চুক্তিনামাটি সকলের সামনে আনা হলো। সকলে দেখলো, মহানবী স. এর কথাই ঠিক। তারা লজ্জিত হলো। কিন্তু আবু জেহেল ও তার অনুসারীরা শুরু করে দিলো হৈ চৈ। হজরত আবু তালেব তাঁর সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে দোয়া করলেন। হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপরে জুলুম করেছে এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো। এরপর আবু জেহেলের বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও নিকটাত্মীয়দেরকে আপন আপন ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন।

বন্দী ও বন্দিনীগণ তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। হজরত আবু তালেবের স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙে পড়ছে। হজরত খাদিজার অবস্থাও ততো ভালো নয়। তিনিও দুর্বল ও পরিশ্রান্ত।

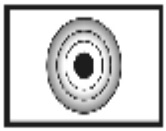


শিয়াবের বন্দীজীবন শেষে স্বগৃহে ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন হজরত আবু তালেব। কিন্তু শরীরে বল পেলেন না। শয্যাশায়ী হলেন। বয়সও হয়েছে অনেক। সাতাশি বছর। শীর্ণ শরীর নিয়ে তিনি হলেন মৃত্যুর মুখোমুখি।

মহানবী স. বললেন, প্রিয় খুল্লতাত! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ কলেমা পাঠ করুন। তিনি কলেমা পাঠ করলেন না। বললেন, বৎস মোহাম্মদ! তোমার কামনা আমি পূর্ণ করতাম। কিন্তু কুরায়েশেরা আমাকে মন্দ বলবে যে। বলবে, আবু তালেব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কলেমা পড়েছে। যথাসময়ে সাঙ্গ হলো তাঁর পৃথিবীর জীবন।

মহানবী স. এর সঙ্গে চিরতরে ছিন্ন হলো তাঁর পিতৃসম মমতার বন্ধন। আল্লাহ্‌র রসুলের জীবনে নেমে এলো শোক ও শঙ্কা। তিনি স. আশ্রয় নিলেন ধৈর্যের সুউচ্চ শৃঙ্গে। কিন্তু ওখানেও আঘাত লাগলো। তাঁর স. প্রিয়তমা পত্নী, সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুখ-দুঃখের সাথী, ছায়াসঙ্গিনী, অর্ধাঙ্গিনী খাদিজা তাহেরা শেষশয্যা গ্রহণ করলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের সবচেয়ে প্রিয়জন মহানবী স.কে শোকের অকুল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লাভ করলেন মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকের নিষ্ক্ষয় আশ্রয়। মহানবী স. ওই বৎসরকে আখ্যা দিলেন 'আমুল হুযন' (শোকবৎসর)।

তখন নামাজ ফরজ হয়নি। জানাযার নামাজের নিয়মও প্রবর্তিত হয়নি। হজরত খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন, আমরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে হাজুন কবরস্থানে নিয়ে গেলাম। কবর খোঁড়া হয়েছিলো আগেই। মহানবী স. নিজে তাঁকে কবরে শুইয়ে দিলেন। জানালেন চিরবিদায়।



হজরত খাদিজা রা. মহানবী স. এর ভালোবাসা এবং সঙ্গ পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তিনিই নবীপ্রিয়াগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুখ-দুঃখ তিনি সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অন্তরের গভীর ভালোবাসা ও সমবেদনা দিয়ে খেদমত করেছেন স্বামীর। যত্ন নিয়েছেন স্বামীর প্রিয়জনদের। এরকম বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিণী আর কেউ নেই।

তিনি ওহী অবতরণের আগেই মহানবী স.কে অসাধারণ ব্যক্তি হিসেবে জানতেন। নবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে কখনোই কোনো মলিনতা স্পর্শ করতে পারেনি। যখন ওহী অবতীর্ণ হলো, তখন তিনিই হলেন প্রথম বিশ্বাসিনী। মহানবী স. এর সঙ্গে প্রথম নামাজ পাঠ করার সৌভাগ্যও তাঁর। তাঁর জীবদ্দশায় নামাজ ফরজ হয়নি বটে, কিন্তু মহানবী স. নামাজ পড়তেন। আর তিনিও হতেন তাঁর সঙ্গী। কখনো গৃহমধ্যে এবং কদাচিৎ কখনো কাবাপ্রাঙ্গণেও। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, আফীফ আল কিন্দি কিছু কেনাকাটার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। মেহমান হলেন মহানবী স. এর চাচা হজরত আব্বাসের গৃহে। একদিন সকালে তিনি দেখলেন, এক সুন্দর যুবক কাবাগৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকালো আকাশের দিকে। একটি বালক দাঁড়ালো তাঁর পাশে। তাঁদের পিছনে দাঁড়ালো এক মহিলা। তারা নামাজ পড়লো। আফীফ হজরত আব্বাসকে ডেকে বললেন, বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে মনে হয়। হজরত আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যুবকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ। কিশোরটি আমার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র, নাম আলী। আর মহিলাটি মোহাম্মদের স্ত্রী। মোহাম্মদের ধারণা, তার ধর্ম মহাবিশ্বপালকের ধর্ম। আর সে যা কিছু করে, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করে। এই নতুন ধর্মের অনুসারী এখন পর্যন্ত এই তিনজনই।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, একদিন আলী রা. দেখতে পেলেন, তাঁরা দু'জন (হজরত মোহাম্মদ স. ও হজরত খাদিজা) নামাজ পাঠ করছেন। নামাজ শেষে তিনি এ প্রসঙ্গে যখন জানতে চাইলেন, তখনই পেলেন ইসলামের দাওয়াত।

ইবনুল আসীর বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্য এই যে, হজরত খাদিজা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম।

জুহুরী, কাতাদা, মূসা ইবনে উকবা, ইবনে ইসহাক আল ওয়াকিদি ও সাঈদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, আল্লাহ্‌ ও রসুলের উপর সর্বপ্রথম ইমান আনেন খাদিজা, আবু বকর ও আলী (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, নারীদের মধ্যে খাদিজা প্রথম মুসলিম।

হজরত হুজাইফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের উপর ইমান আনার ব্যাপারে খাদিজা বিশ্বের সকল নারীর অগ্রণী।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কামেল পুরুষ তো বহুসংখ্যক। তবে কামেল রমণী কেবল চারজন– আসিয়া বিনতে মাযাহিম, মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স.।

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর সকল রমণীর মধ্যে উত্তমা হচ্ছেন মরিয়ম, খাদিজা, ফাতেমা ও আসিয়া।

হজরত আলী রা. বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুলেপাক স. বলেছেন, নারীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান সর্বোত্তমা। আর আমাদের যুগের নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, বেহেশতিনীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশালিনী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স.।

মহানবী স. এর হৃদয়পটে হজরত খাদিজার স্মৃতি ছিলো অম্লান। ইমাম যাহাবী তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর ফযীলত অনেক। তিনি তাঁর সময়ের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতমা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী একজন পুতঃপবিত্র রমণী। তিনি জান্নাতিনী। রসুলেপাক স. তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর অন্য স্ত্রীগণের চেয়ে তাঁকে দিয়েছেন অধিকতর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর প্রতি প্রদর্শন করেছেন প্রভূত সম্মান। তিনি স. তাঁর পূর্বে ও জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। ছিলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর একাধিক সন্তানের জননী। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ছিলেন সর্বোত্তমা। তাঁকে হারিয়ে তিনি স. শোকাতুর হয়ে পড়েন।

মোহাম্মদ ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত খাদিজা রা. এর ইন্তে কালের পর রসুলুল্লাহ্ স. এতো অধিক শোকার্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর জীবনাশংকা দেখা দেয়। অবশেষে তিনি পুনঃবিবাহ করেন।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা বলেছেন, খাদিজার বোন হালা একদিন রসুলুল্লাহ্ স. এর সাক্ষাতপ্রার্থিনী হলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো হজরত খাদিজা রা. এর কণ্ঠস্বরের মতো। তিনি স. তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। একটু পরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন, ইয়া আল্লাহ্! এতো দেখছি হালা। হজরত আয়েশা রা. বলেন, এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। (অভিমান ভরে) বললাম, লাল গালের ওই প্রবীণা গত হয়েছেন কবে? এখনো তাঁকে মনে করতে হবে? আল্লাহ্ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম রমণী দান করেছেন।

মাতা মহোদয়া আয়েশা রা. আরো বলেছেন, আমি খাদিজাকে দেখিনি। তবু তাঁর প্রতি অন্তর্জ্বালা অনুভব করতাম। তাঁর অন্য স্ত্রীদের প্রতি এরকম করতামনা। কারণ, রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর কথা খুব বেশী বলতেন। গৃহে ছাগল জবেহ করা হলে বলতেন, তোমরা কিছু গোশত খাদিজার বান্ধবীদের বাড়িতে পাঠাও। আমি (খাদিজার জন্যই) তার বান্ধবীদেরকে ভালোবাসি। মাতা মহোদয়া আরো বলেন, খাদিজার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি স. তাঁর কোনো না কোনো গুণের কথা বলতেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হতেন না। একদিন আমি রাগান্বিত হলাম। বললাম, ওই অধিক বয়স্কা নারী তো বিগত হয়েছেন কবেই। আপনার

ঘরে তো এখন রয়েছে অধিকতর উত্তমাগণ। আমার একথা শুনে তিনি স.ও রেগে গেলেন। আমি অনুতপ্ত হলাম। মনে মনে বললাম, হে আমার আল্লাহ্! তোমার রসুলের রাগ দূর করে দাও। আমি আর কখনো এরকম বলবো না। তিনি স. আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আয়েশা! তুমি এভাবে আর কথা বোলো না। মানুষ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে তখন আমাকে দিয়েছে আশ্রয়। আল্লাহ্ই তার ভালোবাসা আমার অন্তরে স্থাপন করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই আমি সন্তান লাভ করেছি।

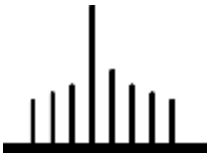
মহানবী স. এর প্রথম কন্যা যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবুল আস তখনো ছিলেন অমুসলমান। মহানবী স. মদীনায় হিজরত করলেন। কিন্তু যয়নাব রয়ে গেলেন স্বামীগৃহে। কিছুকাল পরে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। আবুল আস মুসলিমবাহিনীর হাতে বন্দী হলেন। অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে তাঁকেও আনা হলো মদীনায়। মহানবী স. সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। বন্দীদের স্বজনেরা মক্কা থেকে মুক্তিপণের অর্থ পাঠালো। যয়নাব স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ একটি সোনার হার পাঠালেন। ওই হার দেখে রসুলুল্লাহ্ স. কেঁদে ফেললেন। চিনতে পারলেন, হারটি খাদিজার। বিবাহের সময় তিনি হারটি যয়নাবকে উপহার দিয়েছিলেন। ভারাক্রান্ত অন্তরে তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, খাদিজার এই স্মৃতিনিদর্শনটি ছাড়াই কি তোমরা আবুল আসকে মুক্তি দিতে পারো না? তাঁর স. এর দুঃখে সাহাবীগণের অন্তরও ব্যাথায় ভরে গেলো। তাঁরা ছিলেন সকল অবস্থায় আল্লাহ্র রসুলের সন্তোষকামী। তাঁরা তৎক্ষণাৎ হারটি ফেরত দিয়ে আবুল আসকে মুক্ত করে দিলেন।

হজরত খাদিজার বিচ্ছেদব্যথা রসুলুল্লাহ্ স. কখনোই ভুলতে পারেননি। তিনি স. তো ছিলেন মহাবিশ্বের মহামমতার অপার পাথার। রহমাতাল্লিল আ'লামীন। সবাইকে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু হজরত খাদিজার জন্য তাঁর পবিত্র বিশাল হৃদয়ে ছিলো এক বিশেষ স্থান, যেখানে অংশী ছিলেন না কেউ। ছিলেন শুধু খাদিজা। শুধুই খাদিজা।

তিনি আমাদের জননী। আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন, 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।' সকল বিশ্বাসী তাঁকে এবং রসুলেপাক স. এর অন্যান্য সহধর্মিণীকে মা বলেই ডাকেন। বলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীন। কখনো বলেন উম্মতজননী। কখনো শুধুই জননী।

হজরত খাদিজা তাঁদের মতোই মহাসম্মানিতা। বরং তাঁদের চেয়ে অধিক। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। সালাম জানিয়েছেন ফেরেশতাদের প্রধান হজরত জিব্রাইল। আর আমাদের প্রিয়তম রসুলের অন্তরের সালাম তিনি মুহুর্মুহু পেয়ে চলেছেন নিশ্চয়। আমরাও বলি, হে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় জননী! আমাদের অন্তহীন সালাম দয়া করে গ্রহণ করুন।

হজরত সওদা বিনতে জামআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



সুখ ও শোক— এ দুটো ডানা নিয়েই জীবনপাখি ওড়ে। এভাবেই এক সময় হারিয়ে যায় মহাসময়ের অন্তহীন আকাশে। এ নিয়ম অনিবার্য, অনড়। 'প্রতিটি জীবনকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়'— এই মহাবাণীটিও অলঙ্ঘনীয়। সকল ক্ষেত্রে। সর্বত্র।

মহানবী স. একথা জানেন। মানেন। প্রচার করেন— মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকই জীবনদাতা, মৃত্যুপ্রদাতা। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁর। তিনি স. তো তাঁরই প্রত্যাদেশবাহক। তাঁরই প্রতি সতত সমর্পিত। তিনিই অনুগ্রহ করে খাদিজার মতো কল্যাণময়ী ও শান্তিময়ী সাথীকে দিয়েছিলেন। তিনিই তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর একান্ত সকাশে। ধৈর্য ধরতে হবে।

মক্কার দিবস ও রজনী এখনো আগের মতোই তপ্ত ও স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জনতা আছে। জনজীবন আছে। আছে জীবনসমর। সত্য-মিথ্যার নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব।

নবীজীবন শুধু বেদনাবিধুর। শোকাতুর। তাঁর সংসার এখন ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির নীড়ের মতো। বিপর্যস্ত। আর তিনি যেনো সাথীহীন পাখি।

সাহাবীগণ মহানবী স. এর শোককে শান্তি ও শক্তিতে পরিণত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু প্রথমে ভেবে পেলেন না, কীভাবে শুরু করতে হবে। আপনজনদের অনেকে এখনও শত্রু। তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতিপত্তিশীল। কিন্তু কেউ শুনুক— না শুনুক মহাসত্যের প্রচার তো তাঁকে করতেই হবে।

একদিন তিনি স. গেলেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বনী বকর ইবনে ওয়ায়েল নামক জনপদে। সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানলেন। তারা সাড়া দিলো না। সেখান থেকে তিনি স. গেলেন কাহাতানে। তারা অবশ্য প্রথমে তাঁর সমাদর করলো, কিন্তু পরে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো সম্ভবতঃ কুরায়েশ গোত্রপতিদের ভয়ে। তিনি স. কাহাতান থেকে অগ্রসর হলেন

তায়েফের দিকে। হজরত যায়েদ ছিলেন সফরসঙ্গী। তায়েফের পার্শ্ববর্তী জনপদ ছাকীফে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এক মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হলো। তিনি সেখানকার মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তারা শুনলো। প্রথমে উপেক্ষার মনোভাব দেখালো। পরে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো। শেষে শুরু করলো শত্রুতা। শুরু করলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার। ক্রীতদাস ও শ্রমিকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিলো তারা। তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। গালিগালাজ করলো। পাথর ছুঁড়ে মারলো। হজরত যায়েদ তাদেরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। প্রস্তরবৃষ্টি ঠেকাতে চাইলেন হাত ও শরীর দিয়ে। কিন্তু পারলেন না। রক্তাক্ত হলেন। মহানবী স. এর পবিত্র শরীরও রক্তসিক্ত হলো।

আঘাত-প্রত্যাঘাত তাঁর অপরিচিত নয়। প্রায় দশ বছর ধরে মক্কাবাসীরা তাঁকে কষ্ট দিয়ে এসেছে। এখনো দিচ্ছে। কিন্তু আজকের মতো এতো মুসিবত আগে তো কখনো আসেনি। তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছি তায়েফে। আমি সেখানে আবদ ইবনে লাইল ইবনে কেনানের কাছে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। আমি ব্যথিত হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। তারা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো । আমাকে রক্তাক্ত করেছিলো। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। জ্ঞান যখন এলো, তখন দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমার মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করে আছে। জিব্‌রাইল আবির্ভূত হলেন। বললেন, আপনার প্রভুপালক সর্বদ্রষ্টা। তিনি সবকিছুই দেখেছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন পর্বতের ফেরেশতাদের। তারা আপনার নির্দেশানুগত। আপনি যা চাইবেন, তারা তা-ই করবে। পর্বতরক্ষক ফেরেশতাদের নেতা আমার সামনে এসে আমাকে 'ইয়া রসুলাল্লাহ' বলে সম্বোধন করলো। সালাম দিয়ে বললো, আমি পাহাড় পর্বতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের নেতা। নির্দেশ দিলে মক্কার দু'পাশের দুটি পাহাড় এনে আমি তাদেরকে পিষে মারবো। আমি বললাম, আমি তো তা চাইনা। বরং কামনা করি, আল্লাহ্‌পাক হয়তো এদের বংশে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর ইবাদত করবে এবং কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।

ব্যাথা-বেদনা জর্জরিত মর্মাহত নবী মক্কার পথ ধরলেন। সামান্য বিশ্রামের আশায় প্রবেশ করলেন পথিপার্শ্বের একটি ফলের বাগানে। বাগানের তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেখে মমতাপরবশ হলেন। আঙ্গুরের একটি ছড়া তাঁর আদাম নামক এক খ্রিস্টান ক্রীতদাসের মাধ্যমে মহানবী স. এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি স. 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে আঙ্গুরের দিকে হাত বাড়ালেন। আদাম বিস্মিত হয়ে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো এখানকার কোনো লোককে এমন কথা বলতে শুনিনি। মহানবী স. বললেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বললো,

নিনওয়া (নিনেভ)। তিনি স. বললেন, তুমি তো দেখছি মহাপুণ্যবান ইউনুস ইবনে মুত্বঈর এলাকার লোক। আদাম বললো, আপনি তাঁর সম্পর্কে জানলেন কীভাবে? মহানবী স. বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা। আমার মতো তিনিও আল্লাহ্‌র নবী। আদাম বললো, আপনার নাম কী? বললেন, মোহাম্মদ। সে বললো, আপনার নাম আমি তওরাত গ্রন্থে অনেকবার পাঠ করেছি। পড়েছি— আপনি মক্কায় আবির্ভূত হবেন। মক্কাবাসীরা আপনাকে মানবে না। আপনাকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করবে। অবশেষে আপনাকে সাহায্য করা হবে এবং আপনার ধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

আদাম মহানবী স. এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করলো। চোখে মুখে তাঁর হাত পায়ের স্পর্শ বুলিয়ে নিলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি স. আনন্দিত হলেন। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানালেন মহান আল্লাহ্‌ সমীপে। দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে অনুযোগ করছি আমার শক্তিহীনতার, কৌশলহীনতার এবং অসহায়ত্বের। তুমিই অসহায়ের সহায়। তুমি আমাকে এমন শত্রুর কাছে সমর্পণ করেছো, যারা আমাকে দেখলেই রাগান্বিত হয়, অথচ আমাকে করেছো তাদের শুভাকাঙ্খী ও রক্ষক। তুমি যদি আমার প্রতি অতুষ্ট না হও, তবে আমি কোনো কিছুরই পরওয়া করি না। আমি তোমার আনুরূপ্যবিহীন অবয়বের নূরের আশ্রয়প্রার্থী— যার মাধ্যমে ঘুচে যায় সকল অন্ধকার। সকল দিক হয় আলোকিত। ঠিক হয়ে যায় পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সবকিছু। আমি পরিত্রাণ চাই তোমার অপরিতুষ্টি থেকে। দয়া করে আমার প্রতি তুষ্ট হও। হও করুণাপরবশ। তোমার দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে শক্তি যেমন নেই, তেমনি নেই সাহায্যও।

মহানবী স. উপস্থিত হলেন নাখলা নামের এক উপত্যকায়। রাতে নামাজে দাঁড়ালেন। আবৃত্তি করতে শুরু করলেন কোরআন। তখন ওই স্থান অতিক্রম করছিলো সিরিয়ার নসীবিন শহরের অধিবাসী সাতটি অথবা নয়টি জ্বিন। তারা থমকে দাঁড়ালো। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো কোরআন। তাদের কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে 'আমরা তো বিস্ময়কর কোরআন শুনলাম।'

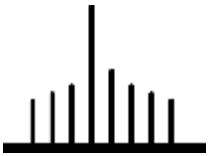
তিনি স. নামাজ শেষ করলেন। জ্বিনগুলো তাঁর সামনে প্রকাশিত হলো। তিনি স. তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

মহানবী স. এর কর্মপরিধি বেড়ে গেলো। মানুষের সাথে সাথে জ্বিনদের মধ্যেও প্রচার কার্য শুরু করলেন তিনি। এবার ফিরতে শুরু করলেন মক্কার দিকে।

শুনতে পেলেন অশুভ সংবাদ। মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তিনি। কুরায়েশদের অপবিত্র অন্তরে এরকম ভাবনার উদয় হলো যে, মোহাম্মদ তার দল বড় করতে চায়। এভাবে আশে পাশের লোকদেরকে দাঁড় করিয়ে দিতে চায় কুরায়েশদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে। তারা ঠিক করলো ওই ধর্মদ্রোহীকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

মহানবী স. বিস্মিত হলেন। বুঝতে পারলেন, প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেব এবং প্রিয়তমা পত্নী খাদিজা নেই বলেই তারা এরকম মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে পারছে। তিনি স্বজনবান্ধবদের কাছে নিরাপত্তার প্রস্তাব পাঠালেন। কেউ সাড়া দিলো না। এগিয়ে এলেন কেবল একজন— মুতঈম। তখনো তিনি ছিলেন অমুসলিম। কিন্তু মহানবী স.কে দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে। বলতেন, মোহাম্মদ তো কারো অনিষ্ট করে না। কাউকে মন্দ পথে ডাকে না। তবে কেনো তাকে শত্রু ভাবতে হবে। তিনি নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করলেন। নিজ গোত্রের লোকদের অস্ত্রসজ্জিত করে রাখলেন।

মহানবী স. মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে উপস্থিত হলেন কাবা প্রাঙ্গণে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। তওয়াফ শেষ করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর নিজ গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম কন্যাদ্বয় কবে থেকে তাঁর পথ চেয়ে আছে। নিতান্তই বালিকা তারা, মাতৃহারা। তাদের দিকে তাকালে শুধু খাদিজার কথাই মনে পড়ে। এইতো ক'দিন আগেই তাঁর সংসার ছিলো শান্তি ও জ্যোতিতে ভরপুর। খাদিজার সূক্ষ্ম সযত্ন তত্ত্বাবধান সারাক্ষণ ঘিরে রাখতো গৃহবাসীদেরকে। আর এখন? শূন্যতা। কেবলই শূন্যতা।



দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করবেন, এরকম ভাবনা মহানবী স. এর হৃদয়ে কখনোই স্থান পায়নি। একথাও তাঁর মনে কখনো উদয় হয়নি যে, জীবন কখনো খাদিজাবিহীন হবে। তাই তো হলো। প্রয়োজন আজ গৃহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। উপরোধ জানাচ্ছে, বিধ্বস্ত বাসা পুনঃনির্মাণ করতে হবে। ঝড়ে ঘর উড়ে গেলে সে ঘরকে আবার নতুন করে গড়ে নিতে হয়।

মহাদুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন সাহাবীগণ। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না, কী করলে বিষণ্ন নবীর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠবে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দ্যুতি। মহানবী স.

ভাবনামগ্ন হন। কিন্তু পরিহার করে চলেন ব্যগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা। বিশ্বাস করেন, সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা মহাপ্রভুপালকের পক্ষ থেকেই আসবে শান্তি ও সমাধান। তিনিই শান্তি এবং সমাধানপ্রদাতা।

মহানবী স. এর মাতৃস্থানীয়া খাওলা বিনতে হাকীম এলেন একদিন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য সাহাবী হজরত ওসমান ইবনে মাজউনের সহধর্মিণী। সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। তারপর মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এভাবে— হে আল্লাহ্‌র রসুল! সংসারকে তো সচল করতে হবে। একজন গৃহকত্রী ছাড়া এ কাজ আর কে করবে। জানি, খাদিজার মতো আর কাউকে আপনি পাবেন না। কিন্তু আপনার সংসারকে পুনর্বার সুরভিত করে তুলবে, এমন নারীও তো আছেন, তারা আপনার অনুপযুক্ত হবে না নিশ্চয়।

মহানবী স. বললেন, আমার এই শৃঙ্খলাহীন সংসারকে কে আবার জোড়া লাগাতে রাজী হবে? কে আছে এমন আত্মস্বার্থত্যাগিনী?

খাওলা বললেন, আছে। আপনি যেমন চান, তেমনই পাবেন। প্রবীণা, অথবা নবীনা।

মহানবী স. তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। খাওলা বললেন, সওদা বিনতে জামআ। আর একজন আপনার বাল্যবন্ধু ও আপনার সার্বক্ষণিক সহচরের কন্যা আয়েশা।

মহানবী স. মৌন সম্মতি জানালেন। খাওলা আর দেরী করলেন না। তখনই গিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত সওদার বসতবাটিতে। তাঁর পিতা তখন বয়োবৃদ্ধ। সাংসারিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে শিথিল সম্পর্ক বজায় রেখে অপেক্ষা করছেন পরপার যাত্রার।

খাওলা বললেন, আনঈম সাবাহান (সুপ্রভাত)।

বৃদ্ধ প্রতি-সম্ভাষণ জানালেন। বললেন, কে তুমি? খাওলা বললেন, আমি হাকীমের মেয়ে খাওলা।

বৃদ্ধ বললেন, ও, আচ্ছা। বসো, বসো।

খাওলা বসলেন। বললেন, আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল মুত্তালিব সওদাকে বিবাহ করতে চান।

বৃদ্ধ খুবই উৎফুল্ল হলেন। বললেন, উত্তম প্রস্তাব। পাত্র তো অভিজাত বংশের। তা সওদা কী বলে?

খাওলা বললেন, মনে হয় সে অমত করবে না। আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি।

হজরত সওদা যেনো প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন দু'টি শুভস্বপ্ন। তাঁর প্রয়াত স্বামী স্বপ্ন দু'টির কথা শুনে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ্‌র রসুলের গৃহিণী হবে।

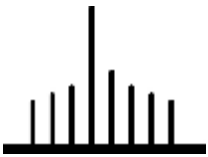
খাওলা হজরত সওদার পিতার কাছে এসে বললেন, সওদা রাজী। এখন আপনি বললেই আমি শুভ বিবাহের আয়োজন করতে পারি। পাত্রপক্ষকে জানাতে পারি।

হজরত সওদার পিতা ছিলেন খ্রিষ্টান। কিন্তু ছিলেন মহানবী স. এর গুণমুগ্ধ। বললেন, বিলম্ব করে কী হবে।

খাওলা খুবই আনন্দিত হলেন। মহানবী স. আবার সংসারী হবেন। অধিকতর প্রাণবন্ত হবে তাঁর প্রচারকর্ম। হবেন অধিকতর শুভ-সুন্দর। উদ্যমময়।

সেদিনই বিবাহ বাসরের আয়োজন করা হলো। পালিত হলো নিতান্ত আড়ম্বরহীন একটি অনুষ্ঠান। মহানবী স. কন্যাগৃহে উপস্থিত হলেন। হজরত সওদার পিতা নিজে উকিল হয়ে তাঁর একান্ত আদরের কন্যাকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের কাছে সমর্পণ করলেন। বেহেশতি বিবাহ সম্পন্ন হলো এভাবেই।

হঠাৎ বিপদ দেখা দিলো একটা। শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত সওদার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে জামআ। তখন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অমুসলিম। তিনি বিবাহের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হলেন খুব। ক্ষোভে দুঃখে মাথা কুটতে শুরু করলেন। কিছুদিন পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট সময় খেদমত করেন মহানবী স. এর। সেদিনের অপআচরণের জন্য তিনি সারা জীবন দুঃখ প্রকাশ করতেন।



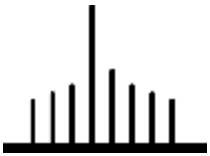
অনেক দুর্লভ গুণের অধিকারিণী ছিলেন হজরত সওদা। মহানবী স. যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখনই সত্যান্বেষী এই রমণী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন মহান ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো সাকরান। সকল সাহাবীর মতো তিনিও ছিলেন রসুল অন্ত প্রাণ। রসুলের নির্দেশক্রমে তিনি সস্ত্রীক হিজরত করেন আবিসিনিয়ায়। পরে তাঁরই নির্দেশক্রমে ফিরে আসেন মক্কায়।

সাকরান ছিলেন পুণ্যবান। ইসলাম গ্রহণের কারণে অন্য সাহাবীগণের মতো তিনিও কুরায়েশদের দ্বারা হন নিগৃহীত। হজরত সওদাও কাফেরদের আচরণে কম কষ্ট পাননি। এতদসত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন সুখী দম্পতি। মহানবী স. ছিলেন তাঁদের উভয়ের জীবনাপেক্ষাও প্রিয়।

এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন হজরত সওদা। দেখলেন, মহানবী স. তাঁর কাছে এলেন। নিকটতর হলেন। একখানি পা রাখলেন তাঁর কাঁধে। একটু পরেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তিনি বিস্মিত হলেন। হজরত সাকরানকে স্বপ্নের কথা জানালেন। তিনি বললেন, সওদা! তোমার স্বপ্নের অর্থ এরকম— অচিরেই আমার মৃত্যু হবে। আর তোমার বিবাহ হবে রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আর একটি স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন, তিনি বালিশে হেলান দিয়ে আছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে চাঁদ ভেঙে তাঁর কোলের উপর পড়লো। পরদিন সকালে তিনি এই স্বপ্নটির কথাও জানালেন হজরত সাকরানকে। তিনি বললেন, স্বপ্নার্থ এরকম— আমার মৃত্যু খুবই নিকটে। আর তুমি হবে সর্বশেষ রসুলের সহধর্মিণী।

তাই হলো। কয়েকদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজরত সাকরান। ইসলামের উপরেই সমাপ্ত হলো তাঁর পরকালযাত্রা। প্রিয় সাহাবীর অন্তর্ধানে দুঃখিত হলেন মহানবী স.। সর্বপুরোধা হয়ে অংশগ্রহণ করলেন তাঁর দাফন কর্মে।



হজরত সওদা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও মমতাময়ী। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে মহানবী স. এর জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন। দিলেন প্রগাঢ় ভালোবাসা। সার্বক্ষণিক সেবা ও শুশ্রূষা। নবীদুহিতাদ্বয় উম্মে কুলসুম ও ফাতেমাকে দিলেন অকৃত্রিম আদর-সোহাগ-মমতা। মায়ের মতো। নবীদুহিতাদ্বয়ও অকৃত্রিম মমতার পরশ পেয়ে মোহিত হলেন। সংসারের অন্য দু'জন সদস্য হজরত আলী ও হজরত যায়েদও মহানবী স. কে প্রসন্ন হতে দেখে স্বস্তি ফিরে পেলেন। সকল সাহাবী হলেন দুঃশ্চিন্তামুক্ত।

মহানবী স. এর উপরে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হতে শুরু করলো প্রত্যাদেশ। তিনি স. তা প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁর কথা শুনতেই চায় না। শুনলেও বিশ্বাস করে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস করে। মহানবী স. ভাবতে থাকেন, মক্কাবাসী নয়, হয়তো অন্য কোনো জনপদের অধিবাসীরা হবে ইসলামের প্রকৃত সেবক। তিনি মনস্থ করলেন, দাওয়াত ছড়িয়ে দিবেন মক্কার বাইরে। তিনি তো সকল মানুষের নবী।

একদিন মক্কায় উপস্থিত হলো বনী আশহাল গোত্রের কয়েকজন লোক। কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়াই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। মহানবী স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো তাদের । তিনি স. তাদেরকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালেন। যুবক আয়াস ইবনে মুআজ মুগ্ধ হলেন। বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! এই লোকের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও। আল্লাহ্‌র শপথ! এঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। তাঁর দলের লোকেরা দ্বিধান্বিত হলো। তারা মুসলমান হলো না। কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধও হলো না। মুসলমান হলেন কেবল আয়াস।

পরের বছর হজ্বের সময় মদীনা থেকে এলো খাজ্‌রাজদের একটি দল। তিনি স. তাদেরকে বললেন, মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালক আমাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তোমরা যদি ইমান আনো এবং দ্বীনের সাহায্যকারী হও, তবে পাবে দুনিয়া ও আখেরাতের মহাসৌভাগ্য। তারা তাঁর স. বক্তব্য শুনে একে অপরের দিকে তাকালো। একজন বললো, ইনি তো সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে ইহুদীরা আলোচনা করে। একথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখায়, আখেরী জামানার নবুওয়াতের সূর্য উদিত হবে আজ অথবা আগামীকাল। আমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবো। আর একজন বললো, হে আমার সম্প্রদায়! সাবধান হও। ইমানে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করো।

তাঁরা সকলেই ইসলামের বায়াত গ্রহণ করলেন। মহানবী স.কে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন। বায়াত গ্রহণের স্থান ছিলো মিনার সন্নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে।

মদীনার ঘরে ঘরে শুরু হলো ইসলামের আলোচনা। শুরু হলো রসুল প্রশস্তি। মক্কায় বসে মহানবী স. সকল খবর পেলেন। আল্লাহ্‌পাকের প্রতি জানালেন অগণিত কৃতজ্ঞতা। প্রসন্ন হলেন এই ভেবে যে, বহুদিন ধরে মক্কায় ইসলাম হয়ে আছে গতিহীন। স্থবির। এবার তার বান ডেকেছে মদীনায়। তিনি স. পরের বছর হজ্বের মওসুমের অপেক্ষায় থাকেন। আশা করেন, এবার আরো অধিক সংখ্যক মানুষ আসবে সেখান থেকে।

ভবিষ্যতের সফলতার আশায় ও আনন্দে যখন মহানবী স. মক্কায় সংকটতিক্ত কাল অতিবাহিত করছিলেন, তখনই একদিন মহারহস্যময় মেরাজের ঘটনা ঘটলো। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে অলৌকিক বাহন বোরাকে করে গভীর রজনীতে প্রথমে নিয়ে গেলেন বায়তুল মাকদিসে। সেখান থেকে সরাসরি আকাশ জগতে। সপ্তআকাশ ভেদ করে আল্লাহ্‌র আরশে উপস্থিত হলেন তিনি। আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যধন্য হলেন আনুরূপ্যবিহীনভাবে। মহান প্রভুপালকের সঙ্গে করলেন কথোপকথন। পেলেন চিররহস্যাচ্ছন্ন জ্ঞান, প্রেম ও ইবাদতের সুষ্ঠু বিধান। ফরজ করা হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

এ সকল ঘটনা যখন ঘটছে, তখন মহানবী স. এর একমাত্র জীবনসঙ্গিনী হজরত সওদা। হজরত খাদিজার মতো তাঁকে একাই নতুন নতুন প্রত্যাদেশের উত্তাপ সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। গভীর, গভীরতর ভালোবাসা ও সমবেদনার সঙ্গে দিতে হয় সংকট উত্তরণের যথাযথ সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা। সামলাতে হয় সংসারের অন্যান্য ঝক্কি-ঝামেলাও।

পরের বছর মক্কায় উপস্থিত হয় আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রের প্রায় পাঁচশত লোক। তাঁদের মধ্যে তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা অতি সঙ্গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গভীর রাতে মহানবী স. তাঁদের সাথে মিলিত হলেন আকাবায়। তাঁর স. এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু মহানবী স. এর প্রতি ছিলো তাঁর গভীর ভালোবাসা। তিনি বলেন, হে দূরাগত জনতা! তোমরা কী জানো, মোহাম্মদ কে? আমরা কিন্তু তাঁর নতুন ধর্মমতের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি অবশ্যই সত্যাধিষ্ঠিত। এখন যদি তোমরা তাঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও এবং সে অঙ্গীকারের উপরে যদি প্রতিষ্ঠিত থাকো তবে তোমরা অবশ্যই হবে কল্যাণাধিকারী। আর যদি অঙ্গীকার রক্ষা করতে না পারো তবে এখনই সে কথা তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও। অন্যথায় পরবর্তীতে আক্ষেপ করতে হবে। কারণ তখন তোমরা হবে আমাদের শত্রু।

আনসারগণের একজন বললেন, হে নেতৃপ্রবর! আপনার কথা আমরা শুনলাম। অনুধাবন করলাম। তারপর মহানবী স. এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যেভাবে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে চান করুন। মহানবী স. কোরআনুল করীমের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার হচ্ছে— তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক করবেনা। আর আমার সঙ্গে অঙ্গীকার হচ্ছে— তোমরা ইসলাম প্রচারে আমার সহযোগী হবে। কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করবে। প্রস্তুত থাকবে জেহাদের জন্য। আমি যা বলবো, তোমরা তা মেনে নেবে নির্বিবাদে। নির্দেশ পালন করবে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়। আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করবে তোমাদের জীবন ও সম্পদ। আমি শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। তখন তোমরা এমনভাবে আমাকে রক্ষা করবে, যেমনভাবে রক্ষা করো তোমাদের জীবন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে। আনসার পক্ষের নেতা বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আপনি ভালোভাবে জানেন যে, আমাদের পিতা-পিতামহদের কাজ ছিলো যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু আমরা মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে কিছু বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলাম। চির অনুগত হলাম কেবল আপনার। তবে একটি কথা— এমন তো কখনো হবে না যে, আপনি বিজয়ী

হবেন, তারপর আমাদেরকে ফেলে চলে যাবেন আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে? মহানবী স. মৃদু হাসলেন। বললেন, না। সেরকম হবে না। আমি তোমাদের সাথেই থাকবো।

হজরত সাওদা তাঁর প্রিয়তম স্বামীর সান্নিধ্যে সারাক্ষণ থাকতে চান। কিন্তু পারেন না। দায়িত্ব পালন করেন কেবল মহানবী স. এর গৃহবাসের সময়। কিন্তু মহানবী স. এর জন্য অপেক্ষা করেন সর্বক্ষণ। তাঁর গভীর রাতের গমন ও আগমন যে সত্যধর্মের প্রচার ব্যপদেশেই, তা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন। যা সঙ্গোপনে রাখবার, তা সঙ্গোপনেই রাখেন। শুনতে পান, ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, অনেক দূরে, মদীনায়। আরো ঈঙ্গিত পান, মহানবী স. সেখানেই হিজরত করে যাবেন। হিজরতের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলোই। এখনও তিনি হিজরতের জ্যোতিধারায় স্নাত হতে চান, যদি মহানবী স. নির্দেশ করেন।

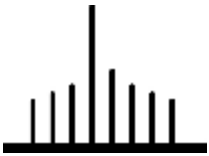
মহানবী স. সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, যে যেভাবে পারো হিজরত করে মদীনায় যাও। মক্কায় ইসলাম অবরুদ্ধ। সুতরাং হিজরতভূমিই হবে এবার ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র।

কাফের কুরায়েশেরা ছিলো দেশত্যাগের বিরুদ্ধে। তাই অধিকাংশ সাহাবীকে গোপনে মক্কা ত্যাগ করতে হলো। হিজরত করলেন হজরত হামযা, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, ওসমান ইবনে আফ্ফান, যায়েদ ইবনে হারেছা, আমর ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত বেলাল রদ্বিআল্লাহু আনহুম। হজরত আয়াস ইবনে রবীআ গেলেন বিশজন প্রধান সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে। হজরত ওমর তাঁর ভাই জায়েদ ইবনে খাত্তাবকে নিয়ে হিজরত করলেন প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রথমে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ভাইকে নিয়ে উপস্থিত হলেন কাবাপ্রাঙ্গণে। কাফেরদের অনেকে সেখানে বসে ছিলো। তিনি তাওয়াফ করলেন। মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। বললেন, যারা পাথরের টুকরাকে মাবুদ মনে করে, তারা অপ্রসন্ন হোক। আরো বললেন, আমি মদীনায় যাচ্ছি। কেউ যদি তার সন্তান-সন্ততিকে এতিম ও স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চায়, তবে সে যেনো আমার সামনে আসে। তাঁর কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত ও ভীত হলো। সামনে আসার সাহস পেলো না কেউ।

মক্কাশরীফে রইলেন কেবল আল্লাহ্র রসুল, হজরত আবু বকর এবং তাঁদের পরিবারবর্গ। হজরত আলীও ছিলেন। তিনি তখনও মহানবী স. এর পরিবারভূত। যারা দুর্বল ও অসামর্থ্য, এরকম কিছু মুসলমানও বাধ্য হলেন মক্কায় থেকে যেতে।

কুরায়েশ গোত্রপতিরা বুঝতে পারলো, মহানবী স.ও হিজরত করবেন। সেখানে গিয়ে নেতৃত্ব দিবেন ক্রমবর্ধমান মুসলিমবাহিনীর। তারা পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। সিদ্ধান্ত নিলো, তাঁকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর

প্রিয়তম নবীকে প্রত্যাদেশ করলেন 'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন কাফেরেরা তোমার ব্যাপারে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিলো— তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে, কিংবা দেশান্তরিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।'

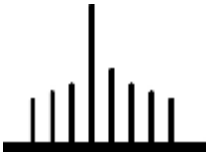


মদীনাবাসীরা উৎফুল্ল। উচ্ছ্বসিত। উল্লসিত। আলোর বন্যায় প্লাবিত হয়েছে সমস্ত জনপদ। আজ থেকে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর সংসর্গধন্য হতে পারবেন জনপদবাসীরা। ইয়াসরিব নামের এই ভূমি এখন থেকে হবে মদীনা । মদীনাতুল মুনাওয়ারা। তাঁরা মহানবী স.কে জানালেন প্রাণঢালা সম্বর্ধনা। শুভেচ্ছা। স্বাগতম।

মহানবী স. প্রথম যেখানে থামলেন, সে স্থানটির নাম কোবা। সেখানে তিনি স. হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনদিন পর পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে এলেন হজরত আলী। তিনিও মসজিদ নির্মাণকর্মে অংশগ্রহণ করলেন। মহানবী স. সবাইকে নিয়ে জামাতবদ্ধ অবস্থায় নামাজ পড়লেন। সম্মিলিত উপাসনার প্রকাশ্য সৌন্দর্য অবলোকন করে বিমোহিত হলেন। শোকর করলেন কেবল আল্লাহ্র।

আরো অগ্রসর হলেন। উপস্থিত হলেন আনসার সাহাবী হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে। আল্লাহ্র নির্দেশপ্রাপ্ত তাঁর কাস্ওয়া নামের উষ্ট্রীটি সেখানেই বসে পড়লো। মহানবী স. সেখানে অবতরণ করলেন। স্থির করলেন, এস্থানে নির্মাণ করা হবে মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন বসতবাটি।

সকল সাহাবী নির্মাণকর্মে অংশ নিলো। প্রত্যহ পাঁচবার ধ্বনিত হতে লাগলো আজান। প্রতিষ্ঠিত হলো নামাজ। মহানবী স. হজরত সওদা ও পরিবারের অন্যদের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসান ঘটাতে মনস্থ করলেন। হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা এবং ক্রীতদাস আবু রাফেকে পাঁচ শত দিরহাম ও দুটি উট দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তাঁরা যথাসময়ে হজরত সওদা, হজরত উম্মে কুলসুম, হজরত ফাতেমা, ওসামা ও তাঁর মা এবং উম্মে আয়মনকে মদীনায় নিয়ে এলেন। হজরত আবু বকরের পরিজনও নিরাপদে মদীনায় উপস্থিত হতে সক্ষম হলো।



প্রায় তিন বছর ধরে সুখ ও দুঃখের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন একজনই— হজরত সওদা। মহানবী স. তাঁর সম্পর্কে কখনো কোনো বিরূপতা প্রকাশ করেননি। উপরন্তু তাঁর অন্তরনিংড়ানো ভালোবাসা ও সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি স. ছিলেন প্রীত ও নিশ্চিন্ত। হজরত সওদার সমস্ত সত্তাই ছিলো আনুগত্যময়, উৎসর্গশোভিত।

হজরত সওদাকে বিবাহ করার অল্প কিছু দিন পরে হজরত আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন মহানবী স.। তখন হজরত আয়েশার বয়স ছিলো মাত্র ছয় বছর। তাই তিনি স. তাঁকে পিতৃগৃহেই রেখে দিয়েছিলেন। মদীনায় যখন আনলেন, তখন তার বয়স হয়েছে নয় বছর। মহানবী স. মাত্র নয় বছরের এই উম্মতজননীকে নিয়ে সংসার শুরু করলেন।

অন্যান্য সাহাবী ও সাহাবীয়ার মতো হজরত সওদাও মহানবী স.কে ভালোবাসতেন নিজের জীবনের চেয়ে বেশী। তাঁর সারাক্ষণের সাধনা ছিলো মহানবী স.কে পূর্ণ পরিতুষ্ট রাখা। তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি স. হজরত আয়েশার সান্নিধ্যে অধিক সময় অতিবাহিত করতে পারলে আনন্দিত থাকেন। হজরত আয়েশাকে তিনি ভালোবাসেন খুব। হজরত আয়েশাও হজরত সওদাকে ভালোবাসেন গভীরভাবে। সপত্নীসুলভ ঈর্ষা তাদের অন্তরে কখনোই স্থান খুঁজে পায়নি।

হজরত সওদা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আত্মসুখের কথা আর ভাববেনই না। ভাববেন কেবল মহানবী স. এবং আয়েশার সুখের কথা। একদিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আমার পালার রাত্রি আয়েশাকে দান করলাম। আজ থেকে আমার অধিকারের ব্যাপারে আপনি দায়মুক্ত। পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে আমি আপনার স্ত্রী— আমি এই পরিচিতিটুকুই চাই কেবল।

হজরত আয়েশা ছিলেন হজরত সওদার গুণমুগ্ধ। তাঁর মতো সুপ্রশস্ত অন্ত করণের কাউকে মনে হয় তিনি আর কখনো দেখেননি। তাই কেবল তাঁর সম্পর্কেই বলতে পেরেছিলেন, সওদার শরীরে যদি আমার আত্মা স্থান পেতে পারতো। তিনি আরো বলেছেন, মহানবী স. এর স্ত্রীগণের মধ্যে সওদাই ছিলেন অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট ও স্থূলকায়। তাই তাকে লোকে সহজেই সনাক্ত করতে পারতো।

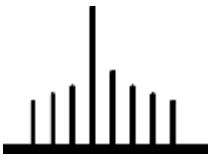
গৃহের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জন্য শোভন নয়— এরকম মনোভাব পোষণ করতেন হজরত ওমর। বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁদেরও

মনে স্থান পেতো না কখনো। কিন্তু অতি ভোরে বা রাতে প্রকৃতির প্রয়োজনে তাঁদেরকে বাইরে যেতেই হতো। একদিন হজরত সওদা রাতে বাইরে যাচ্ছিলেন। হজরত ওমর তাঁকে দেখে ফেললেন। বললেন, হে উম্মতজননী! আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি।

হজরত সওদা লজ্জা পেলেন। রাগান্বিতও হলেন। তাঁর নামে নালিশও করলেন মহানবী স. সকাশে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অবতীর্ণ হলো পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত।

ঈষৎ উষ্ণস্বভাবসম্পন্না ছিলেন তিনি। কিন্তু তার মধ্যেও প্রকাশ পেতো তাঁর সরলতার সৌন্দর্য। পবিত্রতার দ্যুতি। মহানবী স. ছিলেন তাঁর জ্যোতির্ময় সারল্যের গুণগ্রাহী। নবীঅন্তপ্রাণ তাঁর এই দুঃখের দিনের সহধর্মিণীর কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হতেন। কখনো হাসতেন। যেমন একদিনের ঘটনা— হজরত সওদা বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! কাল রাতে আমি আপনার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। আপনি দীর্ঘ সময় ধরে রুকুতে ছিলেন। আমার অবস্থা এমন যে, মনে হচ্ছিল আমার নাক থেকে রক্ত ঝরবে। মহানবী স. তাঁর একথা শুনে হেসে ফেললেন।

আর একদিনের ঘটনা। উম্মতজননী হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসা তাঁকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁরা রহস্য করে বললেন, আপনি কি কিছু শুনেছেন? হজরত সওদা বললেন, কোন বিষয়ে? তাঁরা বললেন, দাজ্জালের বিষয়ে। দাজ্জাল নাকি বের হবে? তাঁদের কথা শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পাশেই একটি তাঁবুর মধ্যে কিছু লোক আগুন পোহাচ্ছিলো। তিনি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁরা দু'জন হাসতে হাসতে মহানবী স. এর কাছে এসে সব খুলে বললেন। মহানবী স.ও একটু এগিয়ে ওই তাঁবুর কাছে গেলেন। বললেন, সওদা! বের হয়ে এসো। দাজ্জাল বের হয়নি। হজরত সওদা বের হয়ে এলেন। মহানবী স. দেখলেন, তাঁর গায়ে লেগে রয়েছে মাকড়সার জাল।



মক্কার জীবন ছিলো দুঃখ-কষ্টে ভরা— আত্মরক্ষামূলক। কাফেরেরা অত্যাচারের পর অত্যাচার করেই যেতো। মুসলমানদেরকে নীরবে সবকিছু সহ্য করতে হতো। মদীনার পরিস্থিতিতে প্রতিবাদদীপ্ত হতে পারলেন সবাই। আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো জেহাদের অনুমতি। মহানবী স.ও

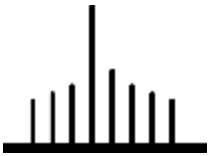
সবাইকে অস্ত্রসজ্জিত হতে নির্দেশ দিলেন। অবতীর্ণ হলো— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান গ্রহণ করা ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রর্দশন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কতো যে নিকৃষ্ট' ।

বদর প্রান্তরে মুসলিমবাহিনী দাঁড়ালো বিশাল মুশরিকবাহিনীর সামনে। যুদ্ধ শুরু হলো। আবু জেহেলসহ নিহত হলো মুশরিকদের অনেক নেতা। অনেকে বন্দী হলো। তাদেরকে মদীনায় নিয়ে এলো বিজয়ী বাহিনী। মহানবী স. এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস, বড় কন্যার জামাতা আবুল আসও ছিলেন তাদের মধ্যে। বন্দী হয়ে এলো হজরত সওদার পূর্ব স্বামীর ভাই সুহাইল ইবনে আমর। হজরত সওদা ছিলেন তখন আফরার ছেলে আউফ ও মুয়াওজির বাড়িতে। বন্দীদের সংবাদ পেয়ে তিনি গৃহে ফিরে এলেন। দেখতে পেলেন অন্য বন্দীদের মতো তাকেও বেঁধে আনা হয়েছে। দুই হাত তার গলার সঙ্গে বাঁধা। তিনি তার এই দুরবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, এভাবে ধরা দিলে কেনো? মরতে পারলে না? মহানবী স. বললেন, সওদা! তুমি কি তাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাও? হজরত সওদা সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, আমি সুহাইলের দুরবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমি অনুতপ্ত। দয়া করে আমার জন্য মাগফেরাত কামনা করুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন।

পরের বছর সংঘটিত হলো উহুদ যুদ্ধ। বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুশরিকবাহিনী উপস্থিত হলো মদীনার উপকণ্ঠে, উহুদে। এ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। শহীদ হলেন শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযাসহ সত্তরজন সাহাবী। মহানবী স. রক্তরঞ্জিত হলেন। তাঁর এমতো অবস্থা দেখে দুঃখ-শোকে কাতর হয়ে পড়লেন তাঁর সহচর ও সহচরীগণ। হজরত সওদার হৃদয় হলো রক্তরঞ্জিত। প্রিয়তম নবীর সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন। পরম মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে অল্পদিনেই সুস্থ করে তুললেন তাঁকে।

মহানবী স. এর সংসার বড় হতে লাগলো। বাড়তে লাগলো বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগণের সংখ্যা। তাঁর স. ঘরণী হিসেবে একে একে অনেকেই এলেন। এলেন হজরত হাফসা, হজরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা, হজরত উম্মে সালমা, হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ, হজরত জুওয়াইরিয়া, হজরত উম্মে হাবীবা, হজরত সাফিয়া এবং হজরত মায়মুনা (রদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা)। হজরত সওদা তাঁদের সকলকেই ভালোবাসলেন। সপত্নীসুলভ কোনো হিংসা তাঁর

অন্তরে কখনো ছিলোই না। কিন্তু হজরত আয়েশার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর। সমবয়স্কা না হলেও তাঁরা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিঃসন্দেহে সে বন্ধুত্ব রচিত হয়েছিলো স্নেহ ও শ্রদ্ধার জ্যোতির্ময় সংশ্লেষে।



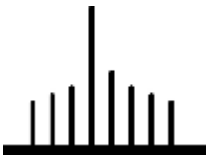
সপত্নীসুলভ হিংসা অন্যায় নয়, বরং মানবচরিত্রের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এক প্রবৃত্তি। যাঁরা শুদ্ধস্বভাবিনী, তাঁদের এমতো প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে একপ্রকারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য। কারণ এর উৎপত্তি গভীরতর প্রেম থেকে। এই সূক্ষ্ম প্রেমবোধটি হজরত আয়েশা সিদ্দীকাসহ অন্যান্য উম্মতজননীগণের মধ্যেও কমবেশী প্রকাশ পেতো। কিন্তু জননী সওদার মধ্যে তা একেবারেই ছিলো না। জননী আয়েশা তাই তাঁর প্রতি প্রকাশ করতেন অকৃতিম মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা। বলতেন, আমার আত্মাটি যদি সওদার দেহাভ্যন্তরে স্থান পেতে পারতো।

জননী আয়েশা সিদ্দীকা একবার জননী সওদাকে নিয়ে একটি অম্লমধুর ঘটনার অবতারণা করলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে মাঝে মাঝে মধুর শরবত পান করতে দিতেন হাফসা। তিনি স. মিষ্টি ও মধু খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিলো, সাধারণতঃ আসরের নামাজের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে যেতেন। একদিন তিনি স. আসরের পরে প্রবেশ করলেন হাফসার প্রকোষ্ঠে। সেখানে অনেকক্ষণ অবস্থান করলেন। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাফসার এক আত্মীয়া মধু উপহার দিয়েছে। সেই মধুর শরবত বানিয়ে সে রসুলুল্লাহ্কে পান করতে দিয়েছে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এর একটা কিছু বিহিত আমি করবোই। সওদাকে বললাম, রসুলুল্লাহ্ যখন তোমার কাছে আসবেন, তখন তুমি বোলো, আপনি মনে হয় মাগ্ফীর পান করেছেন। তিনি বলবেন, না তো। তুমি বোলো, তাহলে আমি গন্ধ পাচ্ছি কিসের? তুমি তো জানো মাগ্ফীরের গন্ধ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি যখন বলবেন, আমি তো এই মাত্র হাফসার ঘর থেকে মধুর শরবত পান করে এলাম। তুমি তখন বোলো, তাহলে মৌমাছিরা মাগফীর ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। আর শোনো, আমার কাছে এলে আমিও তাঁকে একই কথা বলবো। সাফিয়াকে বলে দিবো, সে-ও যেনো এমন করে বলে। এরপর রসুলুল্লাহ্ যখন সওদা, সাফিয়া ও আমার কাছে এলেন, তখন আমরা সাজানো কথাগুলো বললাম। তিনি স. বিব্রত হলেন। আবার হাফসার কাছে গেলেন। হাফসা বললেন, হে আল্লাহ্র

রসুল! মধুর শরবত কি আরো পান করবেন? তিনি স. বললেন, না, না। মধুর শরবত আর কখনো পান করবো না। সওদা আমাকে বললেন, আয়েশা! কাজটা কি ঠিক হলো? আমি বললাম, চুপ।

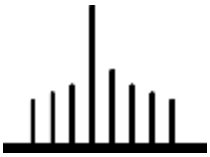
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো, 'হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছো; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এর অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, তাকে আপনি অবৈধ করতে চাইছেন কেনো? মধু তো হালাল। তবে পত্নীকে তুষ্ট করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের জন্য তা হারাম করে নিবেন কেনো? সুতরাং আর কখনো মধুর শরবত পান করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা আপনি করেছেন, তা ভঙ্গ করুন। আল্লাহ্ আপনাকে মার্জনা করবেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য দায়ী করবেন না। তিনি যে মহাক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

হজরত সওদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি স্নেহান্ধই ছিলেন বলা যায়। এই ঘটনা এবং আরো কিছু ঘটনা দেখে সেকথাই অনুমিত হয়। মহানবী স. একবার যে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী (আযওয়াজে মুতাহ্হারাত) থেকে পৃথকবাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ওই সময়ও তিনি ছিলেন হজরত আয়েশার পক্ষে। অবশ্য সকল উম্মতজননীগণই তখন এক জোট হয়েছিলেন।



ইসলামের জয়যাত্রা এগিয়ে চললো দুর্বার গতিতে। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো মহানবী স. এর শাসন। তিনি স. কাবা শরীফ জিয়ারতের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। ওমরা করতে যাবেন বলে ঘোষণা দিলেন। সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে উপনীত হলেন মক্কার সন্নিকটবর্তী হুদাইবিয়া প্রান্তরে। মক্কাবাসীরা বাধা দিলো। প্রস্তাব দিলো আলোচনার। আলোচনা হলো। প্রণীত হলো একটি সন্ধিচুক্তি, যার শর্তগুলো ছিলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অস্বস্তিকর ও অপমানজনক। প্রথম শর্তটি ছিলো— এখন নয়, মহানবী স.কে ওমরা করতে আসতে হবে পরের বছরে। সাহাবীগণের অনেকের অমত সত্ত্বেও মহানবী স. তাঁর আবেগকে অন্তররুদ্ধ করে রাখলেন। যুদ্ধ ও রক্তপাতকে এড়িয়ে গেলেন এভাবে। শেষে অপমানজনক সন্ধিচুক্তিই হলো চূড়ান্ত বিজয়ের কারণ। আল্লাহ্পাক ওই চুক্তিকে বিজয় বলে ঘোষণা করলেন। অবতীর্ণ হলো, নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম।'

দশম হিজরীতে মহানবী স. সাহাবীগণের বিশাল বাহিনী নিয়ে হজ্বযাত্রা করলেন। উম্মতজননীগণের মধ্যে হজরত সওদাকেও নিলেন সঙ্গে। আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে হজ্ব করবার সৌভাগ্য তাঁর অধিকারভূত হলো। মহানবী স. আরাফা প্রান্তরে হাজীদের বিশাল সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। ভাষণের পর উম্মতজননীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই হজ্ব আমাদের স্কন্ধের উপরে ছিলো। এবার তা আমাদের কাঁধ থেকে অপসারিত হলো। এরপর থেকে ঘরের বিছানাকে গনিমত মনে করবে এবং পারতপক্ষে ঘর থেকে বের হবে না। হজ্বশেষে মুযদালিফা প্রান্তরে পৌঁছলেন হাজীগণ। সেখানেই সকলের রাত্রিযাপন করার কথা। কিন্তু অত্যধিক ভীড়ের কারণে হজরত সওদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চলার গতিও ছিলো মন্থর। তাই রাতেই তিনি মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি চাইলেন। মহানবী স.ও সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। তিনি ভীড় এড়িয়ে রাতারাতি চলে এলেন মিনায়।



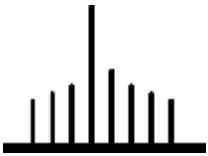
মক্কাবিজয়ের পর সমগ্র আরব স্তম্ভিত হয়ে গেলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, যে আল্লাহ্‌ আবরাহার হস্তিযুথকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই আল্লাহ্‌ই মোহাম্মদকে দান করলেন মহাবিজয়। এখন তোমরাই বলো, তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর আছে কি? সত্যিই তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। এরকম কথাবার্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ চলতে লাগলো বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রগুলোর মধ্যে। শেষে সকলে দ্বিধাহীন চিত্তে একে একে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো ইসলামের চির সুশীতল ছায়ায়। অবতীর্ণ হলো— 'যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রভুপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কোরো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কোরো, তিনি তো তওবা কবুলকারী।'

মহানবী স. বুঝলেন, তাঁর অন্তিমযাত্রার সময় সন্নিকটবর্তী। তিনি স. তো সতত প্রস্তুত। ত্রয়োদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি 'বালির রফিকুল আ'লা' বলে আলিঙ্গন করলেন মহাআমন্ত্রণকে। পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে কেবল হজরত খাদিজা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এবার তিনি চলে গেলেন তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীগণকে ছেড়ে।

সাহাবী ও সাহাবীয়া সকলেই ছিলেন রসুল অন্তপ্রাণ। তাঁরাও অন্তিম যাত্রালগ্নের অপেক্ষায় রইলেন। কখন যে ডাক আসবে, তা তাঁরা জানেন না। শোক-দুঃখ-বেদনা যতই দুর্বহ হোকনা কেনো, পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তো প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে আর মিলিত হওয়া যাবে না। উম্মতজননীগণের সকলেরই ইচ্ছা ছিলো, সবার আগে মহানবী স. এর সঙ্গে মিলিত হবেন। একদিন সকলে জানতে চেয়েছিলেন কার ভাগ্যে ঘটবে প্রথম মিলন? তিনি স. বলেছিলেন, 'যার হাত লম্বা'। তাঁরা নিজেদের হাত মাপামাপি করে দেখেছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, প্রথম মিলিত হবেন হজরত সওদা। কারণ তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী। কিন্তু তা হলো না। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথমে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন হজরত যয়নব বিনতে খুজায়মা। তখন সকলে বুঝলেন, মহানবী স. এর 'যার হাত লম্বা' কথাটির অর্থ ছিলো যিনি অধিক দানশীলা।

হজরত সওদার অপেক্ষাও শেষ হলো এক সময়। হজরত ওমরের খেলাফতের শেষ দিকে ডাক এলো। তিনি তো প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সাড়া দিলেন সাথে সাথে। বিশ্বাসী উম্মতগণ মাতৃহারা হলেন আর একবার।

শোকার্ত জনতা সমবেত হলেন। জানাজার নামাজে সারিবদ্ধ হলেন সকলে। নামাজ পড়ালেন হজরত ওমর।



হজরত সওদা ছিলেন খুবই ভাগ্যবতী। সুন্দর ও সুপ্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। রূপবতীও ছিলেন নিঃসন্দেহে। তাঁর সমগ্র জীবন ছিলো সেবাপরায়ণতাশোভিত ও আনুগত্যময়। উন্নাসিকতার বিন্দু পরিমাণ উপস্থিতিও ছিলো না তাঁর চরিত্রমধ্যে।

মহানবী স. যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখনই তিনি সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন নতুন ধর্মমতকে। তাঁর পূর্বস্বামী সাকরানও ছিলেন মহানবী স. এর একনিষ্ঠ সাহাবী। তাঁরা দু'জনেই মক্কার কাফেরদের দ্বারা নিগৃহীত হন। অত্যাচার চরমে উঠেছিলো বলেই মহানবী স. তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের এক ছেলে ছিলো। নাম আবদুর রহমান। তিনিও ছিলেন শুদ্ধচিত্ত সাহাবী। অনেক পরে পারস্যের জালুলার যুদ্ধে তিনি শাহাদতবরণ করেন। প্রথম হিজরতকারিণী হিসেবে তিনি ছিলেন পুণ্যবতী। আল্লাহ্পাক তাঁর মর্যাদাকে আরো উন্নত করেন। মহানবী স. এর জীবনসঙ্গিনী করে দেন তাঁকে। ফলে তিনি হন মহাপুণ্যবতী।

হিজরতের তিন বছর আগে মহানবী স. তাঁকে ঘরে আনেন। হজরত খাদিজা যেমন ছিলেন তাঁর পঁচিশ বছরের একক সঙ্গিনী, তেমনি সওদাও তাঁর একক সঙ্গিনী হিসেবে কাটিয়েছিলেন তিনটি বছর। বলাবাহুল্য, ওই তিনটি বছর ছিলো চরম সংকটপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। ওই সময় অতি সংগোপনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আকাবার বায়াত অনুষ্ঠান। মহানবী স.কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে কাফেরেরা। সম্পন্ন হয় মহারহস্যময় মেরাজ। ফরজ করা হয় ইসলামের মূল স্তম্ভ নামাজকে। ওই সময় আতঙ্ক ও আনন্দকে একই সঙ্গে বরণ করে নিতে হয় তাঁকে।

মদীনায় এসে তিনি একে একে পান সপত্নীদেরকে। হিংসাবিমুক্ত পবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারিণী ছিলেন বলে সকলকেই অন্তর থেকে ভালোবাসা দিতে পারতেন তিনি। সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন হজরত আয়েশাকে। এরকম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর তিনিও ছিলেন হজরত আয়েশার সীমাহীন শ্রদ্ধার পাত্রী।

বিদায় হজ্বের সময় মহানবী স. আজ্ঞা করেছিলেন, আমার পরে তোমরা ঘরেই থেকো। এই নির্দেশটি তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোরতার সাথে আজীবন পালন করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হতেন না। কোথাও যেতেন না। বলতেন, আমি হজ্ব ও ওমরা দুটোই পালন করেছি। এখন আল্লাহ্‌র রসুলের নির্দেশে ঘরে বসে থাকবো।

মহানবী স. এর একটি পবিত্র স্বভাব ছিলো দানশীলতা। যাচঞাকারীকে তিনি স. কখনো বিমুখ করতেন না। উদ্বৃত্ত সকল কিছু বিলিয়ে দিতেন দুই হাতে। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের সকলেই ছিলেন দানশীলা। হজরত সওদাও তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। খলিফা হজরত ওমর প্রায়শঃই তাঁকে হাদিয়া পাঠাতেন। একবার তিনি তাঁর কাছে লোক মারফত একটি থলি পাঠালেন। হজরত সওদা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী আছে ওতে? লোকটি বললো, দিরহাম। তিনি বললেন, খেজুরের থলিতে তাহলে দিরহামও থাকে? একথা বলে তিনি সাথে সাথে দিরহামগুলো বিলিয়ে দিলেন।

বিশ্বাসী জনতার জননী— সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর এই পরিচয়টিই অক্ষয় হয়ে আছে। থাকবে। সাহাবীগণ তাঁকে আপন জননী অপেক্ষা অধিক ভালোবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন, বিশ্বাস জীবনের চেয়ে বড়। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদিল্লাহ আল আনসারী তাঁর নিকটে হাদিস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। হজরত সওদা সূত্রে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা পাঁচ।

হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



মহানবী স. স্বপ্নে দেখলেন, জিব্‌রাইল আমিন আ. এলেন। রেশমী বস্ত্রে মোড়ানো একটা কিছু তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, গ্রহণ করুন। ইনি হবেন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে আপনার স্ত্রী। তিনি স. রেশমী মোড়কটি খুলে দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি ছবি।

হজরত খাদিজা রা. তখন সদ্য গত হয়েছেন। রমজান মাসে তিনি চলে গেলেন। পরের মাসেই ঘটলো এই স্বপ্নদর্শন। মহানবী স. এর জীবনে তখন শোক ও দুঃখের ঘনঘটা। প্রিয় পিতৃব্য ও প্রিয় পত্নী প্রায় একই সাথে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। কাফের কুরায়েশেরা দিন দিন আতঙ্ক ও আত্যাচারকে করে তুলেছে তীব্র, তীব্রতর। এরই মধ্যে এক রাতে দেখলেন এই স্বপ্ন। তিনি স. বুঝলেন, অন্তরের সান্ত্বনা ও শান্তিসঙ্গিনী হিসেবে আল্লাহ্‌পাক এই অনন্য উপহারটি তাঁকে দিলেন। আলহামদু লিল্লাহ্‌।

স্বপ্নের কথা তিনি স. কাউকে জানালেন না। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। এরই মধ্যে তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন হজরত খাওলা। একসঙ্গে দুটি বিবাহের প্রস্তাব দিলেন তিনি। দুটি প্রস্তাবই কবুল করলেন তিনি স.। হজরত সওদা রা.কে বিয়ে করে ঘরে আনলেন। আর হজরত খাওলাকে পাঠালেন বাল্যবন্ধু ও প্রধান সহচর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের গৃহে।

মূর্খতার যুগের রীতি ছিলো, আরববাসীরা সৎভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদের বিয়ে করাকে ধর্মসম্মত মনে করতো না। তাই হজরত আবু বকর প্রস্তাব শুনে খুশী হলেও বললেন, খাওলা! আয়েশা যে রসুলুল্লাহ্‌র ভাইয়ের মেয়ে। খাওলা ফিরে এলেন। রসুলুল্লাহ্‌ স. তাঁর কথা শুনে বললেন, আবু বকর তো আমার ধর্মসর্ম্পকীয় ভাই। তাকে বলুন, এরকম বিবাহ ধর্মসম্মত।

এরপর সামান্য একটু খট্‌কা দেখা দিলো। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় তা কেটেও গেলো অতি সহজে। মুতইম ইবনে আদীর ছেলে যুবায়েরের সঙ্গে হজরত আয়েশার একটা শিথিল কথাবার্তা হয়েছিলো। সে কথা ওঠাতেই মুতইমের স্ত্রী বললো, না, না। এ মেয়ে এলে যুবায়েরকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়বে। তারা তখন পর্যন্ত ছিলো অমুসলিম।

হজরত আবু বকর হজরত খাওলাকে বললেন, রসুলুল্লাহ্‌কে নিয়ে আসুন। কোনো রকম আড়ম্বর সাজগোজ ছাড়াই রসুলুল্লাহ্ স. এলেন। বিবাহ মজলিশে উপস্থিত হলেন হজরত আবু কোহাফা, হজরত আব্বাস, হজরত উম্মে ফজল, হজরত হামযা, হজরত উম্মে রুমান, হজরত খাওলা, হজরত ওসমান ইবনে মাযউন, হজরত উম্মে হানী, হজরত আতিয়াসহ আরো অনেকে।

হজরত আয়েশার বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। তিনি তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলাধুলায় মগ্ন ছিলেন। পরিচারিকা এসে তাঁকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলো। হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে তাঁকে কনের পোশাকে সাজানো হলো। বিবাহ কী, সে সম্পর্কে তখন তিনি কিছুই জানতেন না। পরে তিনি বলেছেন, বিয়ের সময় আমি একেবারে ছোট, এতোটুকু। 'হাওফ' নামক এক প্রকার পোশাক পরি। তবুও বিয়ের পর কোত্থেকে যেনো আমার কাছে লজ্জা চলে এলো।

দেনমোহর নির্ধারিত হলো পাঁচশ দিরহাম। হজরত আবু বকর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ! আপনারা জানেন, রসুলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তিনিই আমাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোতে নিয়ে এসেছেন। জাহান্নামের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনে তিনিই আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন চিরমুক্তির পথের উপরে। এই আলোকে অনির্বাণ রাখার জন্য আমি একটি উপায় খুঁজছিলাম। আল্লাহ্‌পাক তাঁর অপার করুণার মাধ্যমে এই উপায়টি বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রসুলকে করে দিয়েছেন আমার পরম আত্মীয়। আমার কন্যা নিতান্তই বালিকা। আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়। শিশু কন্যাকে জীবন্ত মৃত্তিকাপ্রোথিত করা হয়। আবার আপন ভাই না হলেও তার মেয়েকে বিয়ে করাকে অবৈধ মনে করা হয়। এরকম আরো অনেক কুপ্রথা রয়েছে আমাদের সমাজজীবনে। আজ এই বিবাহের মাধ্যমে সকল সামাজিক অন্যায়ের উৎখাতকর্মের কাজ শুরু হলো। আর আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে আমাদের এই পবিত্র আত্মীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আশা করি আমার বালিকা কন্যাও রসুলুল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক সংসর্গধন্য হয়ে তাঁর সেবা-যত্ন করতে পারবে। আর তাঁর আদর্শ ও বাণীসমূহ আত্মস্থ করে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রচার করতে পারবে।

শুভবিবাহ সমাপ্ত হলো। মহানবী স. তাঁর নবপরিণীতা বধূকে পিতৃগৃহেই রেখে দিলেন। কারণ তিনি তখন নিতান্তই নাবালিকা। বয়স মাত্র ছয় বছর।



মক্কায় ইসলাম অবরুদ্ধ। কাফের কুরায়েশদের বিরোধিতা ও অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় মহানবী স. মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালালেন। তায়েফের অসাফল্যের পর নিরাশার মেঘে ছেয়ে গেলো ইসলামের অসীম আকাশ। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অপার অনুগ্রহে ধীরে ধীরে আকাশ হতে লাগলো মেঘমুক্ত। সত্যের সূর্য উদ্ভাসিত হলো। দূরে। মদীনায়।

কাফেরেরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো, মোহাম্মদকে হত্যা করতে হবে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন একজন করে নেয়া হবে। তারা সকলে একসঙ্গে আঘাত হানবে। এভাবে সম্মিলিতভাবে তাঁকে হত্যা করলে সকল গোত্রই হবে হত্যাকারী। তখন হাশেমী গোত্র একা সকল গোত্রের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস পাবে না।

মহানবী স. এর সম্মুখে হজরত জিব্রাইল আবির্ভূত হলেন। তাঁকে কাফেরদের সভা এবং সভায় গৃহীত অপসিদ্ধান্তের কথা জানালেন। বললেন, রাতে নিজ শয্যায় রাত্রিযাপন করবেন না। জানালেন নতুন প্রত্যাদেশ, নতুন প্রার্থনা— 'বলো, হে আমার প্রভুপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক, সেখান থেকে আমাকে বের কোরো এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি। আর বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্তই হয়ে থাকে।'

মহানবী স. বললেন, আমার সঙ্গে হিজরত করবে কে? হজরত জিব্রাইল বললেন, আবু বকর সিদ্দীক। মহানবী স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়িতে যেতেন সকালে বা সন্ধ্যায়। হজরত আয়েশা বেশীরভাগ সময় তাঁর সখীদের নিয়ে খেলাধুলায় মত্ত থাকতেন। মহানবী স. সময় কাটাতেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে।

সেদিন নিয়ম ভঙ্গ হলো। মহানবী স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন দুপুরে। দেখলেন হজরত আয়েশা এবং তাঁর বড় বোন হজরত আসমা ঘরেই আছেন। তিনি স. বললেন, সবাইকে সরে যেতে বলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এদের একজন তো আপনার স্ত্রী, আর একজন তার বড় বোন। মহানবী স. বললেন, আল্লাহ্ হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি হবে আমার সঙ্গী, প্রস্তুত থেকো।

নির্ধারিত দিনে রাতের ঘোর অন্ধকারে মহানবী স. হজরত আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সফরের মালপত্র গোছগাছ করে দিলেন দুই বোন— হজরত আয়েশা ও হজরত আসমা। শুরু হলো মহান হিজরতের সংগোপন অভিযাত্রা।



মদীনাবাসীগণ বিপুল আনন্দ, উল্লাস ও ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিলেন মহানবী স.কে। তিনি স. গ্রহণ করলেন বিপুল কর্মোদ্যোগ। গভীর আল্লাহ্প্রেমে আপ্লুত হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুললেন মসজিদ। নির্মিত হলো তাঁর নিজের ও মুহাজির সাহাবীগণের বাসগৃহ। পরিবার-পরিজনদেরকে মক্কা থেকে আনার ব্যবস্থা করা হলো।

হজরত আয়েশা উঠলেন পিতৃগৃহে। মদীনার নাম তখন ছিলো ইয়াস্রেব। আবহাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত ছিলো না। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হজরত আবু বকরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন রোগভোগের পর মহানবী স. এর দোয়ায় পিতা সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু শয্যাগ্রহণ করলেন কন্যা। এবার পিতা মনোযোগী হলেন কন্যার প্রতি। ব্যথিত অন্তরে প্রাণাধিক প্রিয় কন্যার শয্যাপাশে বসে রোদন করলেন। আদর করে মাঝে মাঝে তাঁর মুখে নিজের মুখ ঘষতেন। অসুখ ছিলো মারাত্মক। বেশ কিছু দিন পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু শারীরিকভাবে হয়ে পড়লেন অনেক দুর্বল। মাথার বেশীর ভাগ চুল খসে পড়ে গেলো।

সাত মাস কেটে গেলো এভাবে। একদিন হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেনো? মহানবী স. বললেন, মোহর পরিশোধ করার মতো অর্থ হাতে নেই। হজরত আবু বকর বললেন, অনুগ্রহ করে আমার অর্থ গ্রহণ করুন। মহানবী স. জানেন, আবু বকরের কাছে তিনি স. প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। তাই তিনি স. অমত করলেন না। পাঁচশত দিরহাম নিয়ে মোহরানা পরিশোধ করলেন।

বধূবরণের দিন ধার্য করা হলো ২১ শাওয়াল। হজরত আবু বকরের গৃহে মদীনাবাসিনীগণ উপস্থিত হলেন নতুন বউকে বরণ করে নিতে। হজরত আয়েশা তখন বালিকা। সকলে দেখলেন হজরত আয়েশা বাড়ীর আঙ্গিনায় খেজুর গাছের

তলায় অন্য মেয়েদের সাথে খেলছেন। কখনো দোল খাচ্ছেন। মা ডাক দিলেন। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে মায়ের কাছে এলেন। মা তাঁকে পানির মটকার কাছে নিয়ে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে দিলেন। চুল আঁচড়ে দিলেন। তারপর তাঁকে হাজির করলেন আনসারী মহিলাগণের সামনে। মহিলারা বললেন, আপনার আগমন শুভ হোক। কল্যাণময় হোক। তাঁরা নববধুকে সাজালেন। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলেন মহানবী স. স্বয়ং। তাঁকে আপ্যায়নের জন্য উপস্থিত করা হলো এক পেয়ালা দুধ।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ ছিলেন হজরত আয়েশার খেলার সাথী। তিনি বলেছেন, আমি ছিলাম আয়েশার বান্ধবী। আমিই তাকে বধূবেশে রসুলুল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সাথে আরো অনেকে ছিলো। আমরা তখন রসুলুল্লাহ্‌র সামনে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া অন্য কিছু উপস্থিত করতে পারিনি। তিনি স. পেয়ালা হাতে নিয়ে এক চুমুক পান করলেন। তারপর পেয়ালাটি এগিয়ে দিলেন আয়েশার দিকে। সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে ছিলো। আমি বললাম, রসুলুল্লাহ্‌র দান ফিরিয়ে দিয়ো না। সে পেয়ালাটি হাতে নিলো। সামান্য পান করলো। রসুলুল্লাহ্‌ বললেন, তোমার সাথীদেরকে দাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! পানের আগ্রহ আমাদের নেই। তিনি স. বললেন, মিথ্যে বোলো না। প্রতিটি মিথ্যা আমলনামায় লেখা হয়। ছোট ছোট মিথ্যা হলেও।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বিবাহের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলোৎপাটন করা হয়। যেমন— ১. ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কারো মেয়েকে তারা বিয়ে করতো না। ২. অতীতের কোনো এক সময়ের শাওয়াল মাসে প্লেগ দেখা দিয়েছিলো। ওই মহামারীতে বহু লোক মারা গিয়েছিলো বলে তারা শাওয়াল মাসকে অশুভ মনে করতো। ওই মাসে বিবাহ শাদী হতো না। আর হজরত আয়েশার বিবাহ ও পতিগৃহ যাত্রা ঘটেছিলো শাওয়াল মাসে। ৩. নববধূকে দিনের বেলা ঘরে আনার বিষয়টিও ছিলো প্রচলিত প্রথার বিপরীত। ৪. বরযাত্রীর সামনে জ্বালিয়ে রাখা হতো আগুন। ৫. নবদম্পতির প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হতো কোনো মঞ্চে। অথবা তাঁবুর অভ্যন্তরে। এ সকল কুপ্রথাও উচ্ছেদ হয়ে গেলো।

হজরত আয়েশা রা. নিজেই বলেছেন, আমার বিয়ে ও স্বামীগৃহে গমন ঘটেছিলো শাওয়াল মাসে। আর আমি ছিলাম রসুলুল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় পত্নী। সুতরাং আমার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে? এ কারণেই হয়তো তিনি বিবাহ অনুষ্ঠান শাওয়াল মাসে হওয়াকেই অধিক পছন্দ করতেন।



স্বামীগৃহই নারীদের সর্বাপেক্ষা আপন বাসগৃহ। প্রত্যেক বিশ্বাসবতী এই গৃহেই পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত করতে চায়। চায় স্বামীর একান্ত সন্তোষ। প্রেম-ভালোবাসা। সুখ-দুঃখের সমান অংশ। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বিশ্বাসবানগণের জননী। বিশ্বাসবতীগণের মাথার মুকুট। আদর্শস্থানীয়া। তিনি জানেন এবং মানেন যে, মহানবী স. কেবল তাঁর স্বামী নন, তিনি সকল নবীর নেতা। তিনি মহাবিশ্বের মহামমতার অপার পারাবার।

মসজিদে নববী ছিলো বনী নাজ্জার মহল্লায়। মসজিদের চারপাশে ছোট ছোট দুই তিনটি কাঁচা ইটের ঘর তৈরী করা হয়েছিলো। প্রতিটি ঘরের দৈর্ঘ্য দশ হাত এবং প্রস্থ ছয় হাত। আর উচ্চতা মাথার কিছুটা উপরে। ছাদ খেজুর পাতার। পর্দা হিসেবে দরজায় কম্বল ঝুলানো থাকতো।

একটি ঘরে বাস করতেন উম্মতজননী হজরত সওদা। তিনি সত্তাগতভাবেই ছিলেন বিদ্বেষবিমুক্তা। তিনিই হজরত আয়েশাকে স্বাগতম জানালেন। পাশের ঘরেই তাঁর জায়গা করে দিলেন। হজরত আয়েশার ঘরখানি ছিলো মসজিদের পূর্বদিকে। তার একটি দরজা ছিলো মসজিদের পশ্চিম দিকে মসজিদের ভিতরে। মহানবী স. ওই দরজা দিয়ে মসজিদে যেতেন।

হজরত আয়েশা নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরে রয়েছে একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা, খেজুর রাখার দুটি মটকা, পানি রাখার একটি পাত্র, আর পানি পানের জন্য একটি পেয়ালা। এই নিয়ে তাঁর সংসার যাত্রা শুরু হলো। তিনি জ্ঞানবতী। ধৈর্যশালিনী। তিনি সহজেই বুঝলেন, ধনী ব্যবসায়ী পিতার গৃহ আর আল্লাহ্‌র রসুলের গৃহ এক নয়। বিত্তবৈভবের অযথার্থ প্রবেশাধিকার এখানে নেই। আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া কল্যাণ নেই— এই মহান বার্তা বিশ্বমানবতার কাছে পৌঁছানো হবে তো এই গৃহ থেকেই।

রাতে ঘরে আলো জ্বলে না। অথচ এই গৃহই সকল আলোর উৎস। তিনি নিজেই বলেছেন, একাধারে প্রায় চল্লিশ রাত চলে যেতো, ঘরে বাতি জ্বলতো না।

আসবাবপত্রহীন ঘর গোছগাছ ও সাজ-পরিপাটির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। রান্না বান্নার সুযোগও আসে খুব কম। তিনি নিজে বলেছেন, নবী পরিবারের লোকেরা একাধারে তিনদিন পেটপুরে খেয়েছেন, এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। মাসের পর মাস রান্নার আগুন জ্বলতো না। খেজুর ও পানির উপরেই দিন গুজরান করতে হতো।

সাহাবীগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আহার্যসামগ্রী হাদিয়া হিসেবে আসে। যেদিন রসুলুল্লাহ্ স. হজরত আয়েশার গৃহে রাত্রিযাপন করেন, সেদিন তাঁর গৃহে হাদিয়া-তোহফা আসে বেশী। কারণ তাঁরা জানতেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা। আবার কোনো কোনো সময় এমন হয়— তিনি স. বাইরে থেকে এসে বলেন, আয়েশা! খাবার কি আছে? তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কিছুই তো নেই। তখন সবাই মিলে রোজা রাখেন। আবার অধিকাংশ সময় হাদিয়া হিসেবে প্রাপ্ত দুধ পান করেই সকলকে তৃপ্ত থাকতে হয়।

নবী পরিবারের প্রধান খাদেম হজরত বেলাল রা.। তিনিই উম্মতজননীগণের ঘরে আহার্য বণ্টন করতেন। প্রয়োজন হলে ধার-কর্জ করতেন।

হজরত আয়েশা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে সাংসারিক কাজে মাঝে মাঝে কিছু ভুলত্রুটি হয়ে যেতো। যেমন— একদিন তিনি নিজ হাতে আটা ছেনে রুটি তৈরী করলেন। রাত হলো। মহানবী স. ঘরে এসেই নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। হজরত আয়েশার দুচোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। এই সুযোগে প্রতিবেশীর একটি ছাগল এসে রুটিগুলো খেয়ে চলে গেলো। আর একটি বিষয়ও ছিলো— উম্মতজননীগণের মতো তিনি রন্ধনে পটু ছিলেন না।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন 'আর তাঁর এক নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে মানবিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'

মহানবী স. যে এই পবিত্র আয়াতের প্রকৃত মর্ম সবচেয়ে বেশী বুঝতেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি স. তাঁর সংসারজীবনকে ভরে তুলেছিলেন অনাবিল আনন্দে, প্রেমে-প্রীতিতে ও ভালোবাসায়। তাঁর কিশোরী বধূকে তিনি স. কতোভাবে যে আনন্দ দান করতেন, তা গণনা করা দুরূহ। তিনি স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকটে সর্বোত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে তুষ্ট রাখবে– এটা দাম্পত্য জীবনের একটি প্রধান দায়িত্ব। মহানবী স. এবং তাঁর সকল সহধর্মিণী এ ব্যাপারে ছিলেন সদা-সচেতন। হজরত আয়েশা তাঁর অন্যান্য সপত্নীদের চেয়ে বয়সে ছোট ও কুমারী ছিলেন বলে মহানবী স. তাঁর সাথেই হাস্য-কৌতুক করতেন বেশী। তাঁর খেলাধুলাকেও প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর কিশোরীসুলভ কথাবার্তা শুনে আনন্দিত হতেন। কখনো কখনো গল্পও শুনতেন তাঁর।

তিনি নিজে বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র সামনে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার সখী-সহচরীরাও আমার সাথে খেলতো। তিনি স. হঠাৎ এসে পড়লে তারা দৌড়ে পালাতে চাইতো। তিনি নিষেধ করতেন। আমার সাথে খেলা করতে বলতেন।

একদিন তিনি পুতুল নিয়ে খেলছেন। পুতুলগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়াও ছিলো। পাখাও ছিলো ঘোড়াটির। মহানবী স. সেখানে উপস্থিত হলেন। সুপ্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ওটা কী? হজরত আয়েশা বললেন, ঘোড়া। তিনি স. বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা থাকে নাকি? হজরত আয়েশা বললেন, থাকে, থাকে। আপনি জানেন না, নবী সুলায়মানের ঘোড়ার পাখা ছিলো?

তিনি আরো বলেছেন, একবার হাবশীরা মসজিদ প্রাঙ্গণে যুদ্ধের কলাকৌশলমূলক খেলা দেখাচ্ছিলো। আমি দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। আমি সেখান থেকে সরে না আসা পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্‌ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখলেন।

তিনি বর্ণনা করেছেন, আমার ঘরে দুজন আনসার বালিকা বু'আস যুদ্ধের গান শোনাচ্ছিলো। এমন সময় রসুলুল্লাহ্‌ এলেন। কোনোকিছু না বলে শয্যায় মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হলেন আমার পিতা। তিনি আমাকে শাসালেন। বললেন, কী হচ্ছে এসব! আল্লাহ্‌র রসুলের ঘরে শয়তানের গান। রসুলুল্লাহ্‌ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও।

মহানবী স. হজরত আয়েশার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। হজরত আয়েশা এ সংবাদটিও জানিয়েছেন তাঁর এক বর্ণনার মাধ্যমে এভাবে— আমি রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমি তখন সদ্য তরুণী। শরীর ছিলো কৃশ। তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। তাঁরা এগিয়ে গেলে বললেন, এসো দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আমি সানন্দে রাজী হলাম। দৌড় দিলাম। রসুলুল্লাহ্‌ আমার আগে যেতে পারলেন না। পরের এক সফরে তিনি আবারও সাহাবীগণকে এগিয়ে যেতে বললেন। তারপর আমাকে আহবান জানালেন দৌড় প্রতিযোগিতা করতে। আগের প্রতিযোগিতার কথা আমার মনেও ছিলো না। এবারের প্রতিযোগিতায় আমি আর প্রথম হতে পারলাম না। তিনি হেসে বললেন, এবার বদলা নিলাম।

একদিন হজরত আয়েশা মহানবী স.কে একটি কল্পকথা শোনালেন। তিনি বলেছেন, তখন আমার পাশে ছিলেন আমার মা। তিনি বললেন, আমাদের বেশীর ভাগ হাসির গল্প এসেছে বনী কেনানা থেকে। রসুলুল্লাহ্‌ স. বললেন, না। বরং আমাদের পাড়াটাই হাসি আনন্দের প্রতীক।

একদিন ঘটলো একটি মজার ঘটনা। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বিবরণীতে ঘটনাটি এসেছে এভাবে— একবার আমি রসুলুল্লাহ্‌র জন্য তৈরী হারীরা (আহার্য বিশেষ) তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। সওদাও ছিলেন সেখানে। তাঁকেও খেতে

বলা হলো। তিনি খাবেন না বললেন। আমি বললাম, খাও। নয়তো জোর করে হারীরা দিয়ে তোমার সারা মুখ রঙিন করে দিবো। সওদা তবুও খেলেন না। আমি তখন জোর করে তাঁর সারা মুখে হারীরা লাগিয়ে দিলাম। রসুলুল্লাহ্ হেসে ফেললেন। আমার হাত চেপে ধরে সওদাকে বললেন, এবার তুমি আয়েশার মুখে হারীরা মাখিয়ে দাও। সওদা সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি স. আবার হেসে ফেললেন। হঠাৎ ওমরকে আসতে দেখে বললেন, যাও। এবার তোমরা মুখ ধুয়ে নাও।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকাও মহানবী স.কে ভালোবাসতেন খুব। নবীপ্রেম ও স্বামীপ্রেম একাকার হয়ে সারাক্ষণ তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করে রাখতো। স্বামী-বিচ্ছেদ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শয্যায় স্বামীকে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তেন। অন্ধকার ঘরে খুঁজতে চেষ্টা করতেন। কখনো খুঁজে পেতেন, কখনো পেতেন না। কখনো তাঁর পায়ে হাত ঠেকাতো। হাতড়ে দেখে বুঝতেন, আল্লাহ্র রসুল সেজদায় পড়ে আছেন।

একবার তাঁকে হাতের কাছে না পেয়ে ভাবলেন, তিনি স. হয়তো তাঁর অন্য স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। একটু পরে তাঁর ভুল ভাঙলো। দেখলেন, আল্লাহ্র রসুল ঘরের এক কোণে বসে তসবিহ্ পাঠে মগ্ন। তিনি লজ্জিত হলেন। আপন মনে বলে উঠলেন, আমার পিতামাতা আল্লাহ্র রসুলের জন্য উৎসর্গীত হোক। আমি কী ভাবছি। আর তিনি কী করছেন।

আর এক রাতের ঘটনা। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলো হজরত আয়েশার। দেখলেন, রসুলুল্লাহ্ নেই। তাঁর সন্ধানে তিনি ঘর থেকে বের হলেন। কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, তিনি কবরবাসীদের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনায় মগ্ন। তিনি নীরবে ফিরে এলেন। সকালে একথা যখন জানালেন, তখন রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, হ্যাঁ, রাতে একবার মনে হয়েছিলো, কে যেনো চলে যাচ্ছে। তাহলে তুমিই গিয়েছিলে।

এক সফরের ঘটনা— রসুলুল্লাহ্ স. এর সফরসঙ্গিনী ছিলেন হজরত হাফসা ও হজরত আয়েশা। একদিন তাঁরা কী মনে করে যেনো নিজেদের উট বদল করে নিলেন। রাতে সফরের শুরুতে রসুলুল্লাহ্ স. হজরত হাফসার উটে উঠে গেলেন। হজরত আয়েশা রসুলুল্লাহ্ স.কে না পেয়ে বিরহযন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পেতে লাগলেন। পরের বিরতিস্থলে কাফেলা থামলে তিনি উট থেকে নেমে পাশের এক বনে ঘাসের জঙ্গলে পা দুটো ডুবিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! বিচ্ছু অথবা সাপ পাঠিয়ে দাও। আমাকে দংশন করুক। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।



শুরু হয় বিজয়ের পর বিজয়। বিভিন্ন জনপদের মানুষ ক্রমে ক্রমে ইসলামের অনুগত হতে থাকে। কোথাও শুরু হয় সংঘর্ষ-যুদ্ধ। উহুদযুদ্ধ হয় মদীনার উপকণ্ঠে। ওই যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযাসহ সত্তর জন প্রধান সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু শেষে শত্রুরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মহানবী স. খুবই ব্যথিত হন। কিন্তু সত্যধর্ম ইসলাম প্রচারে হন পূর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জীবিত। এভাবে কখনো শান্তি, আবার কখনো সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রসার ঘটতেই থাকে।

উম্মতজননীগণের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কেবল ইসলামের অন্তরঅঙ্গ ও বহিরঅঙ্গকে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর করবার জন্যই আল্লাহ্পাকের নির্দেশানুসারে মহানবী স.কে বিবাহ করতে হয়। হজরত আয়েশা ও হজরত সওদার ঘরের পাশে একই মাপের কাঁচা ইটের ঘর নির্মিত হতে থাকে। সে ঘরগুলোতে একে একে এসে ওঠেন হজরত হাফসা, হজরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা, হজরত উম্মে সালমা, হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ, হজরত জুওয়াইরিয়া, হজরত উম্মে হাবীবা, হজরত সাফিয়া এবং হজরত মায়মুনা রদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

হজরত আয়েশা তাঁদের সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেন। সকলেই নবীজায়া। সকলেই সাধ্বী, শুভ্র ও পবিত্র। তাই সকলেই প্রীতিময় পরিবেশে মহানবী স.কে ঘিরে রাখেন শান্তি-সান্ত্বনা ও সুগভীর প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে। স্ত্রীগণের প্রতি মহানবী স. এর আচরণ যে কতো মধুর, কতো শুভ্র-সুন্দর— তা তাঁরা প্রচার করেন। বিশ্বাসী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা সবাইকে জ্ঞানের আলোকে করেন সুউদ্ভাসিত। মহানবী স. এর সবচেয়ে আদরের কন্যা হজরত ফাতেমা রা. এর সঙ্গেও তাঁর গড়ে ওঠে গভীর ভাব ও ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, আমি ফাতেমার চেয়ে তাঁর পিতা ছাড়া অন্য কোনো ভালো মানুষ দেখিনি। আরো বলেছেন, রসুলুল্লাহ্র সাথে চাল-চলনে ওঠা বসায় মিলে যায়— ফাতেমা ছাড়া আর কাউকে আমি দেখিনি। ফাতেমা তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করতে এলে রসুলুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে তাঁকে বরণ করে নিতেন। তাঁর কপালে চুমু খেতেন। নিজের স্থানে বসাতেন। আবার রসুলুল্লাহ্ তাঁর ঘরে গেলে তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে পিতাকে কাছে টেনে নিতেন। কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে

বসাতেন। অন্য তিন নবীদুলালী যয়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো প্রীতিময়। হজরত ফাতেমার বিবাহের সময়ও তিনি পালন করেন সর্বাপেক্ষা উচ্ছ্বসিত আয়োজিকার ভূমিকা। আর তিনিই মানুষকে এই শুভ বিবৃতিটি জানান যে, মেয়েদের মধ্যে রসুলুল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ফাতেমা। আর ছেলেদের মধ্যে আলী।

তিনি অন্তরে ঈর্ষাবোধ করতেন কেবল হজরত খাদিজার জন্য। কারণ তাঁর কথা মহানবী স. প্রায় প্রতিদিন বলতেন এবং বেশী বেশী করে বলতেন। এক বিবরণে বলা হয়েছে, একদিন রসুলেপাক স. অনেকক্ষণ ধরে হজরত খাদিজার প্রশংসা করলেন। হজরত আয়েশা বলেন, শুনতে শুনতে আমার অন্তর্দাহ আরম্ভ হলো। আমি বলে ফেললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বহু পূর্বে গত কুরায়েশ কুলোদ্ভবা লাল ওষ্ঠধারিনী এক বৃদ্ধার প্রশংসা আপনি এতো সময় ধরে করেছেন। আল্লাহ্‌ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম পত্নী দান করেছেন। রসুলুল্লাহ্‌র মুখমণ্ডলের রঙ বদলে গেলো। বললেন, যখন মানুষ আমাকে নবী বলে বিশ্বাস করতো না, তখন সে ছিলো বিশুদ্ধ বিশ্বাসিনী। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতো, তখন খাদিজা প্রচার করতো আমার সত্যবাদিতার। মানুষ যখন আমাকে সাহায্য করতে চায়নি, তখন সে তার অর্থ-বিত্ত সহকারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। আল্লাহ্‌ তাঁর মাধ্যমে আমাকে সন্তান দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, হজরত আয়েশার ঈর্ষা ছিলো পবিত্রতারই প্রেমময় এক রূপ। ছিলো নবীপ্রেমের সুগভীর ও সুতীক্ষ্ণ এক প্রকাশ। মহানবী স. এর সঙ্গে তাঁর মান-অভিমানের মাত্রা কখনোই শ্রদ্ধাময় ভালোবাসার বৃত্তবহির্ভূত হতে পারতো না। মহানবী স. এর সেবা-যত্নের জন্য তিনি ছিলেন সতত প্রস্তুত। ঘরে পরিচারক-পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও গৃহকর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। নিজ হাতে আটা পিষতেন। খাবার তৈরী করতেন। বিছানা পাততেন। ওজুর পানি রেখে দিতেন। মহানবী স. এর মাথায় চিরুনী করে দিতেন। শরীরে আতর লাগিয়ে দিতেন। কাপড় ধুয়ে দিতেন। মেসওয়াক ধুয়ে রাখতেন। রাতে শোয়ার সময় মেসওয়াক ও পানি রেখে দিতেন মহানবী স. এর শিয়রে।

একদিন তিনি স. গায়ে কম্বল জড়িয়ে মসজিদে গেলেন। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার কম্বলের এখানে তো ময়লার দাগ লেগে আছে। তিনি স. সাথে সাথে কম্বলটি হজরত আয়েশার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আয়েশা পানি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করলেন। অতি দ্রুত শুকিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলেন রসুলুল্লাহ্‌র কাছে।

মহানবী স. প্রসন্ন না অপ্রসন্ন, তা তিনি তাঁর স. চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁকে খুশী করবার জন্যই দরজায় একটি ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তা দেখে তিনি স. হলেন অতুষ্ট। হজরত আয়েশা বললেন,

হে আল্লাহ্‌র রসুল! অপরাধ কী তা জানতে ইচ্ছা করি। তিনি স. বললেন, যে ঘরে (জীবন্ত প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

মহানবী মোহাম্মদ স. আল্লাহ্‌র রসুল। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। তাঁর ধ্যান-অনুধ্যান, চিন্তা- ভাবনা, কথা-বার্তা, চাল-চলন— সবকিছু থেকে সারাক্ষণ উপচে পড়ে নূর। আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের প্রেমের নির্বর্ণনীয় ও নিস্ক্ষয় নূর। তিনি স. বলেন, দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। তিনি স. ঘরে ঢুকলে কিছুটা উচ্চকণ্ঠে প্রায়শঃই বলতে থাকেন, আদম সন্তান যদি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকার মালিক হয়, তবে সে লোভ করে তৃতীয় আর একটির। তার লোভের মুখ ভরে দিতে পারে কেবল মৃত্তিকা। আল্লাহ্‌ বলেন, ধন-সম্পদ তো আমি সৃষ্টি করেছি নামাজ কায়েম ও জাকাত দানের নিমিত্তে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে তাকায়, আল্লাহ্‌ও তাকান তার দিকে।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকশ্রেষ্ঠ হজরত আবু বকরের কন্যা। নিজেও সিদ্দীকাগণের নেতৃস্থানীয়া। তাই মহানবী স. এর পবিত্র স্বভাব ও মনোভাবের জ্যোর্তিময়তার মধ্যে সতত নিমগ্ন থাকতে পারেন তিনি। ভালোবাসেন। ভালোবাসা পান। হন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের প্রাণের প্রিয়তম।



বয়ে চলে সময়ের স্রোত। জলবতী নদীর মতো। নিরিবিলি। নিরবধি। অনেক ঘটনার জন্ম দিয়ে অনেক দিন, মাস, বছর অতীত হয়ে গেলো। এসে পড়লো ষষ্ঠ হিজরী। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা চৌদ্দ বছরে পড়েছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে মর্মবিদারক ঘটনাটি ঘটে গেলো ওই বছরেই। তিনি হলেন মুনাফিকদের অশুভ ও অপবিত্র ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল।

মহানবী স. সংবাদ পেলেন, মুরাইসি জনপদের পার্শ্ববর্তী লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি স. নিজেই সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। সঙ্গী হলো মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও তার দলের অনেকে। ফেরার পথে তারা উম্মতজননী আয়েশা সম্পর্কে এক জঘন্য অপবাদ রটিয়ে দেয়। তিনি নিজে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—

ফেরার পথে একস্থানে যাত্রাবিরতি হলো। রাত্রিযাপনের জন্য খাটানো হলো অনেক তাঁবু। রাতের শেষ ভাগ। আমি প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম যখন, তখন দেখলাম, আমার গলার হারটি নেই। হার খুঁজতে খুঁজতে তাঁবু

থেকে কিছুটা দূরে চলে গেলাম। অনেক খুঁজেও হারটি পেলাম না। ফিরে এসে দেখি, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। সফরের নিয়ম ছিলো আমি উটের হাওদাজে উঠে যেতাম। চারজন লোক হাওদাজটি তুলে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। বুঝলাম, আমি যে হাওদাজের মধ্যে নেই, লোকেরা তা বুঝতে পারেনি। শুধু হাওদাজ উঠিয়ে দিয়েছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠলো। আমি হারটি খুঁজে পেলাম। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকলাম। ভাবলাম, সামনের বিরতি স্থলে গিয়ে সকলে আমার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারবে। খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়বে এখানে। এভাবে বসে থাকতে থাকতে কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' শব্দ শুনে। দেখলাম, সামনে দাঁড়িয়ে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস্‌সুলামী। তার দায়িত্ব ছিলো কাফেলার পিছনে পিছনে আসা। কারও কোনো জিনিসপত্র ছাড়া পড়লো কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। তিনি বিস্মিত হলেন। বললেন, আম্মাজান! আপনি! আর কোনো কথা না বলে তাঁর উটটিকে আমার সামনে এনে বসালেন। আমি উটের পিঠে উঠলাম। তিনি উটটির লাগাম ধরে আগে আগে চলতে শুরু করলেন। দুপুর বেলার কিছু আগে কাফেলার কাছে উপস্থিত হতে পারলাম। আমাকে উট থেকে নামতে দেখলো অনেকে। মুনাফিক শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আমাদেরকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র কসম! এই নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে।

মদীনায় পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম একমাস ধরে। ওদিকে সমস্ত শহরে যে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— তা আমি জানতেও পারলাম না। শুধু লক্ষ্য করলাম, রসুলুল্লাহ্‌র মুখ ভার। আমার সঙ্গে তেমন কথাও বলেন না। অন্যকে জিজ্ঞেস করেন, ও কেমন আছে? আমার অভিমান হলো। তাঁর অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে এলাম।

একদিন রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন মেসতাহ্ ইবনে উসামার মা। তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। পথ চলতে চলতে তিনি হোঁচট খেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো 'মেসতাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি বললাম, কেমন মা আপনি? নিজের ছেলের ধ্বংস কামনা করছেন। সে তো বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তিনি বললেন, তুমি তো দেখছি কিছুই জানো না। তিনি আমাকে সব কিছু খুলে বললেন। আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেলো। আরো জানতে পারলাম, মুনাফিকদের ওই অপবাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে সাহাবীগণের মধ্যে মেসতাহ ইবনে উসামা, কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত এবং উম্মতজননী যয়নাবের বোন হাসনা বিনতে জাহাশ।

ঘরে এসে আমি সারারাত ধরে কাঁদলাম। বুঝতে পারলাম, রসুলুল্লাহ্ও কষ্ট পাচ্ছেন খুব। শুনতে পেলাম, তিনি স. ইতোমধ্যে আলী ও উসামার পরামর্শও চেয়েছেন। উসামা বলেছে, আমি তাঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে, তার সবই মিথ্যা। আলী বলেছে, হে আল্লাহ্র রসুল! মেয়ের তো অভাব নেই। আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। দাসীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন। দাসীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছে, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যে কখনোই মন্দ কিছু দেখিনি। দোষ দেখেছি তো শুধু এতোটুকু— আমি আটা মেখে তাঁকে বলতাম, একটু দেখে রাখুন। এই এক্ষুণি আমি আসছি। তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর ছাগল এসে আটা খেয়ে যেতো।

সেদিনই তিনি স. মসজিদে সকলকে একত্র করে বক্তৃতা করলেন। বললেন, হে বিশ্বাসী জনতা! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে অপবাদকারীর আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? আল্লাহ্র শপথ! আমি তো আমার স্ত্রীর কোনো দোষ দেখি না। ওই লোকটিও তো নিরপরাধ, যার সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ভাষণ শুনে উঠে দাঁড়ালেন আউস গোত্রের দলপতি হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর, অথবা হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ। বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! অপবাদ দানকারী যদি আমাদের গোত্রের হয়, তবে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর খাজরাজ গোত্রের হলে আপনি যা বলবেন তাই করবো।

একথা শুনেই খাজরাজদের দলপতি সা'দ ইবনে উবাদা দাঁড়ালেন। বললেন, না। তুমি কিছুতেই খাজরাজদেরকে হত্যা করতে পারবে না। তোমার কথায় প্রকাশ পাচ্ছে বিদ্বেষ।

দুই গোত্রের লোকেরা বাদানুবাদ শুরু করলো। বাক-বিতণ্ডা হট্টগোল এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, মনে হলো এক্ষুণি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। হতোও তাই। কিন্তু মহানবী স. তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। দু'পক্ষই তাঁর সম্মানে অবনত হলো। বাদানুবাদও থেমে গেলো অল্পক্ষণের মধ্যে।

প্রায় এক মাস ধরে মিথ্যা অপবাদের বাতাস মদীনা মুনাওয়ারাকে কলুষিত করে রাখলো। রসুলুল্লাহ্ অবর্ণনীয় মানসিক যাতনায় কষ্ট পেতে লাগলেন। আমারও দিবস-যামিনী অতিবাহিত হতে লাগলো রোদনে ও শোকাচ্ছন্নতায়। আমার পিতা-মাতাও অহরহ পুড়তে লাগলেন উদ্বেগের আগুনে। আর বিশ্বাসী জনতার জীবনযাত্রা হয়ে পড়লো দুঃখ ও দুর্ভাবনাময়।

রসুলুল্লাহ্ আমার কাছে এলেন এক মাস পর। পাশে বসলেন। একটু পরে উপস্থিত হলেন আমার পিতা-মাতা। তিনি স. বললেন, আয়েশা ! শুনেছো তো সবকিছু। তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তাহলে আশা করি আল্লাহ্ তোমার নিষ্পাপত্ব প্রকাশ করে দিবেন। আর জেনে রেখো, অপরাধীদের জন্যও তাঁর ক্ষমা ও দয়ার দরজা সতত উন্মুক্ত। তওবাকারীকেও আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

একথা শুনে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেলো। পিতাকে বললাম, রসুলুল্লাহ্র কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, কী বলবো, বুঝতে পারছি না। মাকে বললাম, আপনি কিছু বলুন। তিনি অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, কী বলবো, জানি না। আমি বললাম, বুঝেছি। এ সকল অপবাদ আপনাদের মনের গভীরে রেখাপাত করেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি পবিত্র, আল্লাহ্ জানেন আমি অবশ্যই পবিত্র— তবে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এই অপবাদকে স্বীকার করি, যা থেকে আমি মুক্ত, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই মুক্ত, তবে আপনারা বিশ্বাস করবেন। আমার অবস্থা এখন নবী ইউসুফের পিতার মতো। ধৈর্য ধারণই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য। আমি তাই করলাম। 'সবরুন জামিল'কে গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্ই আমার একমাত্র সহায়। আমার দুঃখ-কষ্টের জন্য আমি কেবল আল্লাহ্র কাছেই ফরিয়াদ করছি। একথা বলেই আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

শোকে দুঃখে কাতর আমার পিতা ক্রোধান্বিত হলেন। ক্রোধের লক্ষ্যস্থল করলেন আমাকেই। বললেন, আজ যে কলংকের কালিমায় আমার গোটা পরিবার কলংকময়, এরকম কলংক আরবের কোনো পরিবারে পড়েনি। মূর্খতার যুগেও আমরা ছিলাম এরকম জঘন্য অপবাদ থেকে মুক্ত। আর ইসলামের যুগে এসে আমাদের এই দুর্ভোগ!

আমার স্থির বিশ্বাস ছিলো, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ স্বপ্নের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ্কে আমার স্বচ্ছতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু আমার সম্পর্কে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে— এরকম কল্পনাও আমি কখনো করিনি। তাই হলো। রসুলুল্লাহ্র মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হলো। ললাটদেশে দেখা দিলো স্বচ্ছ স্বেদবিন্দু। তাঁকে একটি চাদরে জড়িয়ে দেওয়া হলো। মাথার নিচে দেওয়া হলো চামড়ার বালিশ। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি ভীত হলাম না এতোটুকুও। কিন্তু আমার পিতার অবস্থা হলো অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি ভয়ে বিবর্ণ হলেন এই ভেবে যে, লোকে যা রটিয়েছে, এখন তা-ই বুঝি বা ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায়।

রসুলুল্লাহ্ স. স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। উঠে বসলেন। দেখলাম, তাঁর বদনমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল। পবিত্র ললাটদেশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তার মতো স্বচ্ছ ঘর্মবিন্দু। তিনি স. ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ তোমাকে পবিত্রা বলে ঘোষণা করেছেন। শোনো, তিনি এরশাদ করছেন—

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না, বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদেরই কৃত পাপকর্মের ফল, এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। একথা শুনবার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেনো নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি 'এ তো নির্জলা অপবাদ'। তারা কেনো এব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে, তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা ছিলো গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেনো বললেনা 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এটা তো গুরুতর অপবাদ!' আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে কখনো এরকম আচরণের পুনরাবৃত্তি কোরো না। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমুহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না'। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতো না। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা নূর, আয়াত ১১-২১)।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমার পিতা আমার মস্তক চুম্বন করলেন। আমি অভিমানভরে বললাম, আপনি আমার পক্ষে কিছু বললেন না কেনো? তিনি বললেন, আমি যা জানি না, তা বললে কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিতো? কোন্ জমিন আমাকে বুকে করে রাখতো? আমার মা বললেন, ওঠো।

রসুলুল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াও। আমি বললাম, না। তাঁর সামনে আমি দাঁড়াবো না। আর আল্লাহ্ ছাড়া কারো প্রশংসাও করবো না। রসুলুল্লাহ্ আমার পরিধেয় বস্ত্র স্পর্শ করলেন। আমি তাঁর হাত সরিয়ে দিলাম। আমার পিতা রাগান্বিত হলেন। পায়ের জুতা দিয়ে আমাকে মারতে উদ্যোগী হলেন। আমি জুতা ধরে ফেললাম। রসুলুল্লাহ্ হেসে ফেললেন। আমার পিতাকে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এরকম করবেন না।



আর এক যুদ্ধযাত্রা সফরে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার গলার হার হারিয়ে গেলো। হারটি ছিলো তাঁর বড় বোন হজরত আসমার। রসুলুল্লাহ্ স. সাহাবীগণকে হার খুঁজতে বললেন। তখন রাত। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হার পাওয়া গেলো না। ভোর হলো। ঘটনাক্রমে ওই রাতে কিছুসংখ্যক সাহাবী অপবিত্র হয়ে গেলেন। নিকটে কোথাও পানি নেই। ওজু গোসল কীভাবে হবে তাই নিয়ে সকলে মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সকলে হজরত আবু বকরের শরণাপন্ন হলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি স. হজরত আয়েশা রা. এর কোলে মাথা রেখে গভীর ঘুমে মগ্ন। হজরত আবু বকর কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন, গোটা কাফেলাকে আটকে রেখেছো। বার বার তুমি আপদ হয়ে দাঁড়াও।

হজরত আয়েশা কোনো কথা বললেন না। তাঁর কোলে নিদ্রামগ্ন নবী। তিনি তো তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন না। গভীর সুপ্তিমগ্ন অবস্থাতেও তো তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়।

সূর্য উদিত হলো। রসুলুল্লাহ্ স. জাগ্রত হলেন। পানিসংকটের কথা জেনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু পরেই তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকট হয়ে উঠলো ওহী অবতরণের ভাব। অবতীর্ণ হলো—

'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারীসম্ভোগ করো এবং পানি না পাও, তবে মাটির চেষ্টা করবে এবং তা মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।' (সুরা নিসা)।

এভাবে তায়াম্মুমের বিধান পেয়ে সাহাবীগণ মহাআনন্দিত হলেন। হজরত আবু বকর উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, তুমি কল্যাণময়ী। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, তোমার কণ্ঠহারে বরকত আছে। হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. বললেন, হে

উম্মতজননী! আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আপনার কারণে যে কোনো কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটুক না কেনো, তার মধ্যে উদ্ধারের একটা উপায়ও থাকে। শেষ ফল হয় মঙ্গলময়।



খায়বর যুদ্ধের পর ঘটলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উম্মতজননীগণ এক জোট হয়ে রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে অধিকতর উন্নত খোরপোষ ও কিছু বিলাস সামগ্রীর দাবী উত্থাপন করলেন। তিনি স. অপ্রস্তুত ও অতুষ্ট হলেন। তৎসত্ত্বেও উম্মতজননীগণ দাবি ছাড়লেন না। তাঁরা তখন ছিলেন সর্বমোট নয় জন। তাঁদের বোধ ও বুদ্ধি ছিলো সরলতার সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁরা দেখলেন, ইসলামী রাজ্যের সীমানা এখন সুবিস্তৃত। বহু স্থান থেকে গনিমতের মাল, হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন অনবরত আসছে। সুতরাং তাঁরা কিছু অধিক সুবিধা চাইতেই পারেন। আর স্বামীইতো স্ত্রীর একমাত্র চাহিদা পূরণকারী। তাঁরা তাঁদের দাবিতে কোনো দোষ দেখতে পেলেন না।

কথাটা অনেকের কানেই গেলো। হজরত আবু বকর রসুলুল্লাহ্র অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। পেলেন না। হজরত ওমরও অনুমতি চেয়ে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর অবশ্য অনুমতি পাওয়া গেলো। দুজনে প্রবেশ করে দেখলেন, মহামহিম রসুল স. মুখ ভার করে বসে আছেন। সহধর্মিণীগণ বসে আছেন তাঁর পাশে। হজরত ওমর ভাবতে লাগলেন, কী করে আল্লাহ্র রসুলকে প্রসন্ন করা যায়। বললেন, আমার স্ত্রী যদি আমার কাছে ব্যয়বহুল কিছুর জন্য আবদার করে, তবে আমি তার ঘাড় ভেঙে দেব। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, দেখতেই পাচ্ছো। এরা কীরকম দলবদ্ধ। হজরত আবু বকর তাঁর কন্যার প্রতি মারমুখী হলেন। হজরত ওমরও মারতে উদ্যত হলেন তাঁর মেয়ে হজরত হাফসাকে। দুজনেই বললেন, খবরদার! রসুলুল্লাহ্র কাছে যা নেই, তার জন্য আবদার জুড়ে দিয়ো না।

অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। রসুল স. এর গৃহজীবনে নেমে এলো বিব্রতকর অস্বস্তি। তিনি স. কঠোর হতে বাধ্য হলেন। শপথ করলেন, এক মাস তিনি তাঁদের কারো কাছেই যাবেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন একাকী এক প্রকোষ্ঠে। সাহাবীগণের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দিলেন। প্রচার হয়ে গেলো— রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর সকল পত্নীকে পরিত্যাগ করেছেন।

হজরত ওমর সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, আপনারা অপেক্ষা করুন। সত্বর আপনাদেরকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানাতে পারবো। তিনি ভয়ে ভয়ে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়! আপনি কি আপনার বিবিগণকে পরিত্যাগ করেছেন? তিনি স. বললেন, না। পুনরায় নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আমি মসজিদে প্রবেশ করে জনগুঞ্জন শুনতে পেলাম। লোকেরা বলাবলি করছে, আপনি তাঁদেরকে তালাক দিয়েছেন। কথাটি যে সত্য নয়, তাকি আমি তাদেরকে জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তুমি ইচ্ছা করলে জানাতে পারবে।

ওই সময় অবতীর্ণ হলো নতুন প্রত্যাদেশ। বলা হলো— 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। হে নবীপত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল; তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে, তাকে আমি পুরস্কার দিবো দুই বার এবং তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিজিক। হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বোলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত প্রদান করবে। এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত ২৮-৩৩)।

ঊনতিরিশ দিন গত হলো। মহানবী স. তাঁর পৃথকবাসের অবসান ঘটালেন। প্রথমেই গেলেন হজরত আয়েশার ঘরে। হজরত আয়েশা নিজে বলেছেন, শপথের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরক্ষণেই রসুল স. আমার ঘরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আপনি তো শপথ করেছিলেন এক মাসের। আজ তো ঊনতিরিশ দিন হলো। তিনি স. বললেন, এ মাস তো ঊনতিরিশ দিনের।

মহানবী স. নতুন প্রত্যাদেশ আবৃত্তি করে শোনালেন। বললেন, আয়েশা! তুমি কী করবে, তা এক্ষুণি না জানালেও চলবে। তোমার পিতা-মাতার সাথে

মতবিনিময় করে পরে জবাব দিলেও চলবে। হজরত আয়েশা বললেন, আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং আখেরাতকেই চাই। এ ব্যাপারে পিতা-মাতার সঙ্গে মতবিনিময়ের তো কিছু দেখি না। তবে আমার একটি মিনতি আছে। আমি যা বললাম, তা আপনার অন্য স্ত্রীদেরকে জানাবেন না। তিনি স. বললেন, কথা দিলাম। আমি তাদেরকে এ কথা জানাতে যাবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত হলে কী করবো। জানাতেই তো হবে। কারণ আমি আবির্ভূত হয়েছি সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে, অশান্তি উৎপাদনকারী হিসেবে নয়। বলাবাহুল্য, মহানবী স. এর সকল সহধর্মিণী ওই কথাই বললেন, যে কথা বলেছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা। দাবি আদায়ের ব্যাপারে যেমন তাঁরা একজোট হয়েছিলেন, তেমনি মহানবী স. এর সঙ্গে গভীর ভালোবাসার মধ্যে তাঁরা ছিলেন অধিক অচ্ছেদ্য।

আর একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.। সেটাও ছিলো মহানবী স. এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি অসুন্দর মনে হলেও শেষফল ছিলো কল্যাণময়। কারণ ওই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছিলো নতুন প্রত্যাদেশ, শরীয়তের নতুন বিধান। বিধানটি হচ্ছে— হালালকে হারাম (এবং হারামকে হালাল) করার জন্য কখনই কসম করা যাবে না। কসম করলেও তা অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে।

এ সম্পর্কে জননী আয়েশা সিদ্দীকা নিজে বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ মিষ্টি ও মধু খুব পছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিলো, সাধারণত আসরের নামাজের পরে তিনি স. তাঁর সহধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে যেতেন। একদিন তিনি আসরের পর প্রবেশ করলেন হাফসার প্রকোষ্ঠে। সেখানে অনেকক্ষণ অবস্থান করলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাফসার এক আত্মীয়া তাঁকে মধু উপহার দিয়েছে। সেই মধুর শরবত বানিয়ে সে রসুলুল্লাহ্কে পান করাচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এর একটা কিছু বিহিত আমি করবোই। যাতে রসুলুল্লাহ্ তার প্রকোষ্ঠে অধিক সময় অতিবাহিত না করেন। আমি সওদাকে ডেকে বললাম, রসুল স. যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি বোলো, আপনি মাগ্ফীর পান করেছেন। তিনি বলবেন, না তো। তুমি বোলো, তাহলে আমি গন্ধ পাচ্ছি কিসের? তুমি তো জানো, তিনি মাগ্ফীরের গন্ধ একেবারে পছন্দ করেন না। তিনি বলবেন, আমি তো হাফসার ঘরে মধু পান করেছি। তুমি বোলো, তাহলে মৌমাছিরা মাগ্ফীর ফুলের রেনু থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। এরপর তিনি আমার কাছে এলে আমিও এরকম করে বলবো। সাফিয়াকেও বলে দিবো, সে-ও যেনো এরকম করে বলে। এরপর যখন রসুলুল্লাহ্ সওদা, সাফিয়া ও আমার কাছে এলেন তখন আমরা সাজানো কথাগুলো বললাম। তিনি স. বিব্রত হলেন। পুনরায় হাফসার ঘরে গেলেন। হাফসা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! মধুর শরবত কি আরো পান

করবেন? তিনি বললেন, না, না। আর কখনো মধু পান করবো না। শপথ করলাম। সওদা আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, কাজটা কি ঠিক হলো? আমি বললাম, চুপ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছো; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'



জীবন শেষে আসে মৃত্যু। তারপর জীবন। মহাজীবন— এটাই আল্লাহ্পাকের বিধান। এ বিধানের ব্যতিক্রম কেউ নয়। পুণ্যবান, পাপী নির্বিশেষে সকলের উপরে এই অমোঘ বিধানটি কার্যকর হয়। নবী-রসুলগণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তবে মৃত্যুদূত আজরাইল তাঁদের মর্যাদার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখেন। মেনে চলেন বিশেষ নিয়ম। প্রথমে সালাম করেন। তারপর প্রাণহরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর নবী-রসুলগণও অনুমতি প্রদান করেন সানন্দে। কারণ তাঁরা জানেন মৃত্যুর তোরণ পার হয়েই যেতে হয় মহাপ্রিয়তম মহাপ্রভুপালকের একান্ত সন্নিধানে।

মহানবী স. একটি জানাযা শেষে গৃহে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হলো। মাথায় রুমাল বাঁধলেন। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত। হজরত আয়েশার কক্ষে গিয়ে দেখলেন, তিনিও মাথাযন্ত্রণায় আহ্ উহ্ করছেন। তিনি স. কৌতুক করে বললেন, আয়েশা! কেমন হতো। যদি তুমি আমার সামনে মারা যেতে। আমি তোমাকে গোসল করিয়ে তোমার দাফন-কাফন করতাম। হজরত আয়েশাও প্রতিকৌতুকে বললেন, বুঝেছি। আপনি এ ঘরে নতুন কোনো স্ত্রীকে ওঠাতে চান।

উম্মতজননী হজরত মায়মুনার ঘরে গিয়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীগণের পালার নিয়মও রক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিদিনই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আজ যেনো কার ঘরে থাকবো?

সকলে বুঝতে পারলেন, তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে থাকতে চান। সবাই অনুমতি দিলেন। তিনি স. হজরত আব্বাস ও হজরত আলীর কাঁধে হাত রেখে অনেক কষ্টে হজরত আয়েশার কামরায় পৌঁছলেন।

হজরত আয়েশা বলেন, রোগাক্রান্ত হলে রসুলুল্লাহ্ এই দোয়াটি পড়ে নিজ হাতে ফুঁ দিয়ে সেই হাত দিয়ে শরীর মুছতেন—

অর্থঃ হে মানুষের প্রভুপালক! বিপদমুক্ত করো। হে নিরাময় দানকারী। নিরাময় দাও। তুমি যা করো, তা ছাড়া আর কোনো প্রতিষেধক নেই। তুমি এমনভাবে আরোগ্য দান করো যেনো আর কোনো রোগ না থাকে।

হজরত আয়েশা বলেন, আমি দোয়াটি পাঠ করে রসুলুল্লাহ্র হাতে ফুঁ দিলাম। ইচ্ছা করলাম, তাঁর হাত দিয়ে তাঁর পবিত্র শরীর মুছে দেই। কিন্তু তিনি হাত টেনে নিলেন। বললেন, 'আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়াল্ হিক্বনী বির্রফীক্বিল আ'লা' (হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো এবং তোমার মহান সান্নিধ্য দান করো)।

রোগযন্ত্রণা বেড়েই চললো। একদিন একটি পাথরের উপরে বসিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। মাথায় ঢালা হলো পাঁচ মশক পানি। গোসলের পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। মসজিদে উপস্থিত সাহাবীগণকে বিভিন্ন উপদেশ দান করলেন। শেষে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এক বান্দাকে একটি অধিকার দান করেছেন— সে যেনো পৃথিবী ও পৃথিবীর বিত্তবৈভব গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করে পরবর্তী পৃথিবী। সে পরবর্তী পৃথিবীকেই গ্রহণ করেছে।

একথা শুনে হজরত আবু বকর কেঁদে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমার বাপ-মা আমার জীবন-সম্পদ আপনার জন্য কোরবান হোক। সবাই হজরত আবু বকরের কান্না দেখে অবাক হলেন।

প্রতিদিনই অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি স. মসজিদে নামাজ পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। ইমাম নিযুক্ত করলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। রোদনভারাক্রান্ত সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে তাঁর পিছনেই নামাজ পড়তে লাগলেন।

মহানবী স. তো সতত প্রস্তুত। পৃথিবীতে সম্পদ রেখে যাওয়া সকল নবী রসুলের জন্য নিষিদ্ধ। একথা মনে পড়লো তাঁর। তিনি তাঁর সকল গোলামকে আজাদ করে দিলেন। জিজ্ঞেস করে জানলেন, ঘরে রয়েছে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা। তিনি স. হজরত আয়েশাকে বললেন, দীনারগুলো দরিদ্র জনতার মধ্যে বিতরণ করে দাও। সম্পদ ঘরে রেখে রসুল তাঁর প্রভুপালকের সাথে সাক্ষাত করবে— বড়ই লজ্জার কথা।

প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমাকে ডাকলেন। হজরত ফাতেমা পিতাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করতে লাগলেন। মহানবী স. বললেন,

কেঁদোনা মা, কেঁদোনা। আমি চলে গেলে বোলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিঊন'। এতে সকলের জন্য রয়েছে শান্তি। হজরত ফাতেমা বললেন, আপনার জন্যও। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ।

হজরত ফাতেমা বার বার বললেন, হায়! আব্বার কী যন্ত্রণা! হায় আব্বার কী কষ্ট। তিনি স. বললেন, ফাতেমা! আজকের দিনের পর তোমার আব্বার আর কষ্ট থাকবে না। প্রিয় দৌহিত্র হাসান-হোসেনকে ডেকে আনা হলো। মহানবী স. তাঁদেরকে আদর করলেন। চুম্বন করলেন। তাঁদের সম্মান বজায় রাখবার জন্য অসিয়ত করলেন। সবশেষে ডাকলেন স্ত্রীগণকে। উপদেশ দিলেন। উচ্চারণ করলেন, আল্লাজী আনআ'মা আ'লাইহিম। আল্লাহুম্মা ফাহুয়ার্ রফীক্বিল আ'লা।

হজরত আলীকে ডাকলেন। তিনি মহানবী স. এর পবিত্র মস্তক কোলে তুলে নিলেন। তাঁকেও উপদেশ দিলেন— 'সাবধান! নামাজ! নামাজ! আর তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ও তোমাদের অধীনস্থগণ।

রোগযন্ত্রণা তীব্রতর হলো। প্রিয়তমা পত্নী হজরত আয়েশার শরীরে ঠেস লাগিয়ে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল শেষ যাত্রার প্রতীক্ষায় পল অতিবাহিত করে চললেন। পাশে একটি পানিভর্তি পেয়ালা রাখা ছিলো। তিনি স. ওই পানিতে হাত ভিজিয়ে কিছুক্ষণ পর পর নিজের মুখমণ্ডল মুছতে লাগলেন। মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হতে লাগলো। কখনো লাল। কখনো শ্বেতাভ। অতি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ইন্না লি মাউতা সাক্রাতুন' (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর নিশ্চয়ই মৃত্যু যন্ত্রণাময়)।

ঘরে প্রবেশ করলেন হজরত আয়েশার ভাই হজরত আবদুর রহমান। তাঁর হাতে ছিলো একটি তাজা মেসওয়াক। রসুলুল্লাহ্ স. মেসওয়াকটির দিকে তাকালেন। হজরত আয়েশা বুঝলেন, তিনি স. মেসওয়াক করতে চান। তিনি মেসওয়াকটি হাতে নিয়ে চিবিয়ে নরম করে দিলেন। রসুলুল্লাহ্ মেসওয়াকটি হাতে নিয়ে সুস্থ মানুষের মতো মেসওয়াক করলেন।

মেসওয়াক শেষ করে রসুলুল্লাহ্ স. কেমন যেনো হয়ে গেলেন। পরিবেশ হয়ে গেলো অপার্থিব সুবাসে সুবাসিত। তিনি স. তাঁর হাত একটু উপরের দিকে ওঠালেন। মনে হলো, কোথাও যেনো যাত্রা করবেন। কণ্ঠে উচ্চারিত হলো— বালির্ রফীক্বিল্ আ'লা, বালির্ রফীক্বিল্ আ'লা, বালির্ রফীক্বিল্ আ'লা। এরপর নির্বাক হয়ে গেলেন। উত্তোলিত হাত শয্যায় পতিত হলো। চোখের তারা উঠে গেলো উপরের দিকে। দৃষ্টি পতিত হলো যেনো বহু বহুদূরে- অসীম কোনো আলোর নিখিলে।

হজরত আয়েশা রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র মস্তক বালিশে রেখে দিলেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন।



শোকের আগুনে পুড়তে লাগলো মদীনা। মদীনাবাসী। মদীনার আকাশ বাতাস। নিসর্গ। মহানিসর্গ। শোকের অগ্নিগিরি অবিরত অগ্নুৎপাত করে চলেছে। চারিদিকে কেবল হাহুতাশ, হাহাকার, রোদন-ক্রন্দন-বিলাপ। বিষাদযন্ত্রণা, ব্যথা বেদনার অনন্ত শোকোচ্ছ্বাস।

উন্মুক্ত তরবারী হাতে হজরত ওমর মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, মুনাফিকেরা রটনা করছে, আল্লাহ্‌র রসুলের মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। নবী মুসার মতো তাঁর প্রভুপালকের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন। তিনি তাঁর উম্মতের কাছে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! নবী মুসার মতো আমাদের রসুলও ফিরে আসবেন। যারা তাঁর মৃত্যুর কথা বলবে, আমি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবো। শিরশ্ছেদ করবো।

হজরত আবু বকর এগিয়ে গেলেন। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! যারা মোহাম্মদের উপাসনা করতে চাও তারা শুনে রাখো, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত চাও, তারা শুনে নাও, আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব। মৃত্যু তাঁকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। শোনো, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালার এরশাদ— 'মোহাম্মদ রসূল ব্যতীত কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না। এবং আল্লাহ্‌ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪)

আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীর মর্মস্পর্শী আবৃত্তি শুনে সম্বিত ফিরে পেলেন সকলে। অবনমিত হলো হজরত ওমরের তরবারী। সান্ত্বনার মেঘ জমতে শুরু করলো মদীনার আকাশে। বৃষ্টি হলো। নিভে গেলো শোকের আগুন। বন্ধ হলো শোকের অগ্নিগিরির অসহনীয় ও অবিরাম অগ্নুৎপাত। কিন্তু ভিতরের আগুন জ্বলতে লাগলো আগের মতোই। সকলে হয়ে গেলেন রুদ্ধমুখ অগ্নিগিরি।

এভাবে হজরত আবু বকর সকলের কর্তব্যানুভূতিকে জাগ্রত করলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হলেন সকলের চেয়ে বেশী বিচ্ছেদকাতর। তদুপরি স্কন্ধে অর্পিত হলো খেলাফতের বিশাল গুরুভার। সে দায়িত্বও পালন করে যেতে লাগলেন নিয়মিত। কিন্তু ভিতরের ভাঙন রোধ করতে পারলেন না কিছুতেই। ক্ষয় হলেন। হতে লাগলেন।

সময় সবকিছুকে ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু হজরত আবু বকরের শোককে মুছে ফেলতে পারলো না কিছুতেই। বরং দিন দিন তিনি হয়ে পড়লেন অধিকতর কাতর। দুই বছর তিন মাসের বেশী কেটে গেলো এভাবেই।

একদিন তিনি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে আছেন। দেখলেন, বৃক্ষশাখায় একটি পাখি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হে পাখি! তুমি কতো সুখী। গাছের ফল খাও। আর বসবাস করো গাছের ছায়ায়। তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। কখনো বলেন, হায়! আমি যদি গাছ হতাম। মানুষ আমাকে কেটে ফেলতো। যদি ঘাস হতাম। পশু আমাকে খেয়ে ফেলতো।

একদিন গোসলের পর তিনি সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বর আর ভালো হলো না। যতোদিন পারলেন অসুস্থ শরীর নিয়েই নামাজ পড়াতে লাগলেন। পরে আর পারলেন না। নামাজের ইমাম বানালেন হজরত ওমরকে। পরবর্তী খলিফাও নির্বাচন করলেন তাঁকে। নির্জনে ডেকে নিয়ে তাঁকে উপদেশ দিলেন। দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমি মুসলমানদের কল্যাণ কামনার্থেই ওমরকে খলিফা নির্বাচন করেছি। আমি তোমার নির্দেশেই পৃথিবী পরিত্যাগ করছি। তোমার দাসগণের ভার তুমিই দয়া করে গ্রহণ করো। তোমার হাতে তো তাদের নিয়ন্ত্রণ-শৃঙ্খল। হে আল্লাহ্! তুমি মুসলমানদেরকে পুণ্যবান শাসক দান করো। আর ওমরকে অন্তর্ভূত করো খোলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে। তাঁর প্রজাবৃন্দকে যোগ্য নাগরিক করে দাও।

সাহাবীগণ চিকিৎসককে ডাকতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বারণ করলেন। বললেন, চিকিৎসক তো আমাকে দেখেছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কী বললেন তিনি? তিনি জবাব দিলেন 'ফাআ'লুল্লিমা ইউরীদ্'(আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করি)।

জমাদিউস্ সানি মাসের ২২ তারিখ। হজরত আবু বকরের বয়স ৬৩ পূর্ণ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী বার? উপস্থিত জনতা বললেন, সোমবার। তিনি বললেন, সোমবারেই তো রসুলুল্লাহ্ বিদায় নিয়েছিলেন? সকলে বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমিও এরকম চাই। আল্লাহ্ আমার বাসনা পূর্ণ করলে তোমরা রসুলুল্লাহ্র পাশে আমাকে কবর দিয়ো।

মহাযাত্রার সময় নিকটবর্তী হলো। তিনি তাঁর প্রাণাধিকা কন্যা হজরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র রসুলকে কয়টি কাপড়ে দাফন করা হয়েছিলো? তিনি বললেন, তিনটি। হজরত আবু বকর বললেন, আমাকেও যেনো তিনটি কাপড় দেওয়া হয়। যে দুইটি আমার শরীরে আছে, সে দুটো ধুয়ে নিয়ো। আর একটি তৈরী করে নিয়ো।

হজরত আয়েশা বললেন, আব্বা! আমরা কি আপনার জন্য নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য রাখি না? আমরা কি এতোটাই দরিদ্র? হজরত আবু বকর বললেন, আম্মা! মৃতের চেয়ে জীবিতের জন্যই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী।

আমার জন্য ছেঁড়া, পুরনো কাপড়ই যথেষ্ট।

হজরত আয়েশার কণ্ঠে শোকগাঁথা উচ্চারিত হলো—

কী সুন্দর তাঁর রূপ! মেঘপুঞ্জও তাঁর কাছে পানিপ্রার্থী হয়—
তিনি পিতৃহীনদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, আশ্রয় হন বিধবাদের।

হজরত আবু বকর বললেন, মা! এই কবিতা তো আল্লাহ্‌র রসুলের জন্যই শোভনীয়। তিনি আর একটি কবিতা পাঠ করলেন—

তোমার জীবনের শপথ! মৃত্যুমগ্নতার সূচনা হয় যখন,
তখন অর্থ-বিত্ত-প্রতাপ-প্রভাব কোনো কাজে আসেনা।

হজরত আবু বকর বললেন, কন্যা! বরং এভাবে বলো, যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'ওয়া জায়াত্‌ সাক্‌রাতুল্‌ মাউতি বিল্‌ হাক্কুন জালিকা মা কুন্‌তা মিন্‌হু তাহীদ' (যে মৃত্যু থেকে তোমরা বিমুখ, সেই মৃত্যুকষ্ট তো আসবেই)।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা পুনরায় আবৃত্তি করলেন—

রূদ্ধ অশ্রধারা একদিন প্রবাহিত হবে
প্রত্যেক পথিকের থাকে নির্দিষ্ট গন্তব্য
আর প্রত্যেক পরিধানকামী পায় বসন।

হজরত আবু বকর পুনরায় বললেন, ওভাবে নয় বেটি, এভাবে— 'ওয়া জায়াত সাক্‌রাতুল মাউতি বিল হাক্কুন জালিকা মা কুনতা মিন্‌হু তাহীদ'।

মুমিনজননী আয়েশা সিদ্দীকা পিতৃহারা হলেন। নিভে গেলো রসুলুল্লাহ্‌ স. এর সবচেয়ে প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বাল্যবেলার সাথী ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবু কোহাফার জীবন প্রদীপ। তাঁর মুখে সর্বশেষ বাক্য উচ্চারিত হলো— রব্বা তাওফ্‌ফানি মুসলিমাওঁ ওয়াল্‌ হিক্কনী বিস্‌সলিহীন' (হে আল্লাহ্‌! আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং করে দাও তোমার সৎবান্দাগণের সঙ্গী)।



সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর ফযীলত ও মর্যাদা সীমাহীন। তিনি ছিলেন ফকীহ্, আলেম, ফাসাহাত্বিদ, বালাগাত্বিদ এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অন্যতম। কোনো কোনো সলফে সালেহীন বলেছেন, তখন আহকামে শরীয়তের সমাধানের জন্য তাঁর কাছে যেতে হতো। হাদিস শরীফে এসেছে— তোমরা তোমাদের ধর্মের দুই তৃতীয়াংশ হোমায়রার নিকট থেকে গ্রহণ করো। মহানবী স. তাঁকে আদর করে হোমায়রা (লাবণ্যময়ী) বলে ডাকতেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের র. বলেছেন, কোরআনের অর্থ, হালাল-হারামের বিধান, আরবী কবিতা এবং বংশশাখা সংক্রান্ত জ্ঞানে জননী আয়েশা সিদ্দীকার চেয়ে বড় আলেম আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর এক কবিতায় তিনি মহানবী স. এর প্রশংসা করেছেন এভাবে—

অর্থঃ মিশরের জনতা যদি তাঁর গণ্ডদেশের সৌন্দর্যের কথা জানতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই ইউসুফের দান দস্তরে অর্থ ব্যয় করতো না। জুলায়খার তিরস্কারকারীরা যদি আল্লাহ্র হাবীবের পরিচয় পেতো, তাহলে তারা তাদের হাতের উপর নিজেদের হৃদয়গুলো রেখে টুকরো টুকরো করে দিতো।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে খুব বেশী মহব্বত করতেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে মহব্বত জন্ম নিয়েছিলো, তা ছিলো হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি রসুলুল্লাহ্র মহব্বত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করতেন, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি স. জবাব দিতেন, আয়েশা। আবার জিজ্ঞেস করতেন, পুরুষদের মধ্যে? তিনি স. বলতেন তার পিতা। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো রসুলুল্লাহ্র সবচাইতে প্রিয়জন কে? তিনি জবাব দিলেন, ফাতেমা। পুনঃপ্রশ্ন করা হলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী। এ দুটো বিবরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে এভাবে যে, স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. আর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হজরত ফাতেমা যাহরা রা.। আহলে

বায়েতের মধ্যে হজরত আলী রা. আর সাহাবীগণের মধ্যে হজরত আবু বকর রা.। তবে মহব্বতের আধিক্যের প্রেক্ষিত ও দিক ছিলো ভিন্ন ভিন্ন।

জননী আয়েশা সিদ্দীকার একটি বিবরণে বলা হয়েছে, একদিন রসুলুল্লাহ্ তাঁর পবিত্র পাদুকা সেলাই করছিলেন। আমি চরকায় সুতা কাটছিলাম। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল থেকে বিকিরিত হচ্ছে অভূতপূর্ব সৌন্দর্যচ্ছটা। আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। তিনি স. বললেন, কথা বলছোনা কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনার জ্যোতির্ময় অবয়ব এবং ললাটদেশের স্বেদবিন্দুর সৌন্দর্য দেখে আমি অভিভূত। তিনি স. দাঁড়ালেন। আমার কাছে এলেন। আমার দুচোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন এঁকে দিলেন। বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি আমাকে দেখে যতোটা আনন্দিত হয়েছো, আমি তোমাকে দেখে আনন্দিত হয়েছি তার চেয়ে বেশী।

মাসরুক ছিলেন নেতৃস্থানীয় তাবেয়ী। তিনি যখন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, এই হাদিসটি আমি শুনেছি সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা, রসুলুল্লাহ্র মাহবুবা থেকে। কখনো বলতেন, আল্লাহ্র হাবীবের মাহবুবা, আসমানী নারী থেকে।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার আরেকটি ফযীলত এরকম— তিনি বলতেন, রসুলুল্লাহ্ ও আমি এক পাত্রের পানি নিয়ে এক সাথে গোসল করতাম। তিনি তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে এরকম করতেন না। মেশকাত শরীফে মুআযায়ে আদবিয়া থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে , সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আল্লাহ্র রসুল ও আমি একই মটকা থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। মটকাটি আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকতো। তিনি তাড়াতাড়ি পানি নিতে থাকলে আমি বলতাম, আমার জন্যও রাখুন। এভাবে আমরা ফরজ গোসল সম্পন্ন করতাম।

মুমিন জননী আয়েশা সিদ্দীকার আর একটি ফযীলত এই যে, তিনি বলেছেন, আমার রাত্রি যাপনের পোশাক ছাড়া অন্য কারো রাতের পোশাকে আবৃত অবস্থায় রসুলুল্লাহ্র উপরে ওহী নাযিল হয়নি।

জননী আয়েশা সিদ্দীকা স্বয়ং বলেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ আমাকে বললেন, আয়েশা ! এই যে জিব্রাইল— তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। আমি বললাম, ওয়াআলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আপনি যা দেখেন, আমরা তো তা দেখি না। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, মুমিনজননী উম্মে সালমা একবার হজরত আয়েশার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন। জবাবে মহানবী স. বলেছিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। নিশ্চয়ই আয়েশা ছাড়া অন্য কারো রাতের পোশাকে আবৃত অবস্থায় আমার কাছে

প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি। একথা শুনে মুমিন জননী উম্মে সালমা বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করছি।

মহানবী স. একদিন তাঁর পরম আদরের কন্যা হজরত ফাতেমাকে বললেন, ফাতেমা। আমি যাকে ভালোবাসি, তুমিও কি তাকে ভালোবাসবে না? তিনি বললেন, অবশ্যই ভালোবাসবো হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি স. বললেন, তুমি আয়েশাকে ভালোবেসো।

বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা সিদ্দীকা নিজে বলেছেন, আমার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ঘোষণা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি আরো বলেছেন, শেষ যাত্রার সময়গুলো তিনি আমার ঘরেই অতিবাহিত করেছেন। আমার পালার দিনই তিনি লোকান্তরিত হন। তখন তাঁর পবিত্র মস্তক ছিলো আমার গলা ও বুকের মাঝখানে।

হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার এক লোককে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতে শুনলেন। রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে অপদস্থ লাঞ্ছিত ব্যক্তি! আল্লাহ্‌র রসুলের প্রিয়তমাকে তুমি মন্দ বলছো।

মাতামহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা তাঁর ছোট বেলার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে— একদিন রসুলুল্লাহ্‌র আগমন টের পেয়ে আমি আমার কন্যা পুতুলগুলো জানালায় রাখলাম। একটি পর্দা দিয়ে ওগুলোকে ঢেকে রাখলাম। তাঁর সঙ্গে যায়েদও ছিলো। তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে পুতুলগুলো রসুলুল্লাহ্‌কে দেখালেন। তিনি স. বললেন, এগুলো কী? আমি বললাম, এরা আমার মেয়ে। কন্যা পুতুলগুলোর সঙ্গে একটি ঘোড়া পুতুলও ছিলো। দুটো পাখা ছিলো ঘোড়াটির। তিনি স. বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা থাকে নাকি? আমি বললাম, থাকে, থাকে। আপনি শোনেননি বুঝি, নবী সুলায়মানের ঘোড়া ছিলো। পাখাও ছিলো ওগুলোর। আমার কথা শুনে তিনি স. এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর পবিত্র দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

রসুলেপাক স. একদিন বললেন, যার হিসাব নেওয়া হবে সে আযাব ভোগ করবে। মাতা মহোদয়া আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনপ্রচারক! আল্লাহ্‌পাক যে বলেছেন, অচিরেই তাদের হিসাব নেওয়া হবে, আসান হিসাব। হিসাব যখন আসান (সহজ) হবে, তখন আবার আযাব হবে কেমন করে? তিনি স. বললেন, তা হচ্ছে হিসাব প্রদান করা। হিসাব গ্রহণ করা নয়। হিসাব গ্রহণ করা মানে প্রশ্নোত্তর করা।

একবার রসুলেপাক স. বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে মিলন হওয়াকে পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার মিলনকে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে মিলনকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার মিলনকে অপছন্দ করেন। মহামান্যা জননী

বললেন, নফস ও স্বভাব অনুসারে সবাই তো মৃত্যুকে (মিলনকে) অপছন্দ করে। তিনি স. বললেন, তুমি যেমন ভেবেছো, তেমন নয়। বরং আল্লাহ্ তার বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে চান, তার মধ্যে মৃত্যুর মহব্বত তৈরী করে দেন, যখন সে হয় মৃত্যুর সমীপবর্তী।

আর একদিনের ঘটনা— রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্র রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। মহাসম্মানিতা জননী বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ প্রচারক! আপনিও কি? তিনি স. বললেন, আমিও। কিন্তু আমিতো (সতত) রহমতাচ্ছাদিত।

আর একদিন রসুলেপাক স. বললেন, হে হোমায়রা! তোমার হামযাদ শয়তান তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। তিনি বললেন, সব মানুষের সাথে কি হামযাদ থাকে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার সাথে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার শয়তানটি মুসলমান (চির অনুগত) হয়েছে।

মহাপবিত্র প্রেমসাগরে সতত নিমজ্জিত থাকতেন মহানবী স. এবং তাঁর প্রিয়তমা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা। প্রেমিক-প্রেমিকাগণের মতো সূক্ষ্ম ও নিষ্কলুষ মান অভিমানও চলতো। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ বললেন, আয়েশা ! আমি জানি, তুমি কখন আমার প্রতি প্রসন্ন অথবা অপ্রসন্ন থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কেমন করে শুনি। তিনি স. বললেন, প্রসন্ন থাকলে বলো 'লা ওয়া রব্বা মোহাম্মদ' (মোহাম্মদের রবের শপথ)। আর মান করলে বলো 'লা ওয়া রব্বা ইব্রাহীম' (ইব্রাহীমের রবের শপথ)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবহনকারী! আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমি তো কেবল আপনার নামটিই বর্জন করি। কিন্তু আপনার পবিত্র সত্তা তো আমার হৃদয়ে সতত প্রোজ্জ্বল। ভালোবাসায় তো কোনো পরিবর্তন আসে না।

তিনি বলেছেন, একবার মহানবী স. আমাকে বললেন, হোমায়রা! তুমি যদি জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকতে চাও তবে পৃথিবীতে থেকো ফকির, মুসাফির হালতে। মুসাফিরেরা সেলাইযোগ্য বস্ত্রকে পুরনো মনে করে না।

এক বর্ণনায় এসেছে, মাননীয়া মাতা একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাপ্রচারক! আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেনো জান্নাতে আপনার স্ত্রী হতে পারি। তিনি স. বললেন, পারবে, যদি এই আমলটি করো— কালকের জন্য আহার্য বস্তু জমা করে রেখো না। আর কাপড় যতক্ষণ সেলাইযোগ্য থাকে, ততক্ষণ তা পরিত্যাগ কোরো না।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে— একদিন আমি মাতা মহোদয়া আয়েশাকে সত্তর হাজার দিরহাম দান করতে দেখলাম। অথচ তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিলো সেলাই করা। একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের রা. তাঁর জন্য এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করলেন। তিনি ওই দিনই তা নিকটাত্মীয় ও দুস্থ জনতার মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিলেন। ওই দিন রোজা ছিলেন

তিনি। সন্ধ্যায় যখন ইফতারের জন্য ঘরে কিছু পাওয়া গেলো না তখন দাসী বললো, একটি দিরহাম রেখে দিলেও তো হতো। তিনি বললেন, মনে ছিলো না।

নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে দুই হাজার দুই শত দশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য মুসলিম উম্মার কাছে অধিক হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবেই যে তিনি সম্মানিতা ও মর্যাদামণ্ডিতা, তা নয়। বরং প্রধানত তিনি মহাসম্মানিতা, একারণে যে, তিনি হাদিসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সূক্ষ্ম মর্মবক্তব্য সম্পর্কে অন্যাপেক্ষা অধিক জানতেন। আল্লামা জাহাবী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র ফকীহ সাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতেন। পরবর্তী সময়ের একদল লোকও তাঁর কাছ থেকে গভীর ধর্মজ্ঞান অর্জন করেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক জিজ্ঞেস করলো, পরম শ্রদ্ধেয়া মাতা! আমি কীভাবে জানবো যে, আমি পুণ্যবান? তিনি বললেন, যখন তুমি তোমার পাপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। লোকটি বললো, কীভাবে জানবো যে, আমি পাপী? তিনি বললেন, যখন জানবে তোমা কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে পুণ্যকর্ম (মনে করবে তুমি পুণ্যবান)।

তিনি লোকদেরকে উপদেশ দিতেন, তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা থাকবে। প্রশ্ন করা হলো, কীভাবে? তিনি বললেন, ক্ষুধা ও পিপাসার দ্বারা।

একবার কোরআন মজীদ পাঠ করতে করতে এই আয়াতে এসে আটকে গেলেন 'আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০) এরপর থেকে তিনি যখন কোরআন পাঠ করতেন, তখন প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতেন। কখনো বলতেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর পবিত্র বাণীসম্ভারে আমার কথাই জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— এবং অপর কতকলোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সঙ্গে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে— আল্লাহ্‌ সম্ভবত তাদেরকে ক্ষমা করবেন (সুরা তওবা, আয়াত ১০২)।

অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন তিনি। ছোট বেলায় খেলাধুলা করার সময় পিতা হজরত আবু বকরের কোরআন পাঠের আওয়াজ তাঁর কানে আসতো। তিনি সেগুলো শোনার সাথে সাথে স্মৃতিস্থ করতেন। পাঠও করতেন দোলনায় দুলতে দুলতে। পরবর্তী কালের বহু ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায়। দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যাও। রসুলুল্লাহ্‌ স. থেকে তিনি সরাসরি হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবার বর্ণনা করেছেন পিতা হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওমর, হজরত ফাতেমা, হজরত সা'দ, হজরত হামযা ইবনে আমর আল আসলামী এবং হজরত জুজামা বিনতে ওয়াহাবের সূত্রেও। আবার তার কাছ থেকেও বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদিস

বর্ণনা করেছেন। আল্লামা জাহাবী তাঁদের দুই শত জনের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন, এবং আরো অনেকে।

সাহাবীগণের বর্ণনা ও হাদিস লিপিবদ্ধ ও গ্রন্থনার কাজ শুরু হয় হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ওই সময় মদীনার কাজী ছিলেন আবু বকর ইবনে হাযাম আলআনসারী। তাঁর পাণ্ডিত্যের পেছনে তাঁর খালা হজরত উমারার অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশী। আর হজরত উমারা ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার আশ্রিতা, লালিতা, পালিতা এবং ছাত্রী। খলিফা ওমর বিন আবদুল আযিয কাজী আবু বকরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেনো হজরত উমারার বর্ণনাসমূহ লিখে পাঠান।

আরব সমাজে জীবন ও কবিতা ছিলো অবিচ্ছেদ্য। তাঁদের মুখে কবিতা আবৃত্তি হতো সুখে-দুঃখে-শোকে, এমনকি যুদ্ধের সময়েও। তাঁদের এই সহজাত প্রতিভা দেখে অবাক মানতে হয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার পিতৃগৃহে কাব্যচর্চা হতো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক কবি ছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁর পিতার উপযুক্ত পুত্রী। তিনিও কবিতা রচনা করেছেন। বহু বিখ্যাত কবির কবিতা ছিলো তাঁর স্মৃতিস্থ। তিনি সেগুলো আবৃত্তি করে শোনাতে পারতেন। একবার আবৃত্তি করলেন আবু কাবীর আল হুজালীর একটি কবিতা –

সে তার মায়ের গর্ভের সকল অশুদ্ধতা এবং
দুগ্ধদানকারীর সকল ব্যাধি থেকে মুক্ত।
যখন তুমি তাঁর বদনের সুদৃঢ় শিরা উপশিরার দিকে তাকাবে
তখন দেখবে, তা চমক দিচ্ছে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের মতো—

আবৃত্তি শেষে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনিই তো কবিতাটির উপযুক্ত পাত্র। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ স. খুশী হলেন।

রসুলুল্লাহ্ স. এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুল যখন আমাদের এখানে আসেন, তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা আবৃত্তি করা হতো।

একদিন মহানবী স. শুনলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা যুহাইর ইবনে জানাবের এই কবিতাটি আবৃত্তি করছেন—

তুমি ওঠাও তোমার দুর্বলতাকে, যে দুর্বলতা
তোমার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করবে না। অতঃপর
সে যা অর্জন করেছে, তার পরিণতি লাভ করবে।
সে তোমার প্রতিদান দিবে, অথবা তোমার প্রশংসা করবে।
তোমার কর্ণের যে প্রশংসা করে সে ওই ব্যক্তির
মতো, যে প্রতিদান দিয়েছে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, আবু বকর কবি ছিলেন, ওমর কবি ছিলেন, আর আলী ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, মহানবী স. আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার কোনো কোনো কবিতা পাঠ করতেন। যেমন— 'যাকে তুমি পাথেয় প্রেরণ করোনি, সে তোমার কাছে সংবাদ নিয়ে আসবে।' তিনি আরো বলেছেন, মুহাজির সাহাবীগণ অসুখ বিসুখে অথবা মানসিক কষ্টের সময় কবিতা আবৃত্তি করতেন। হজরত আবু বকর, হজরত বেলাল, হজরত আমের প্রমুখ সাহাবীগণের সে সকল কবিতা তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। খন্দকের যুদ্ধে হজরত সা'দ ইবনে মাআজ যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন সেটিও আবৃত্তি করে শোনাতেন— কাতোইনা উত্তম হতো, যদি মুহূর্তমধ্যে এসে যেতো উট, অংশগ্রহণ করতো যুদ্ধে। মৃত্যু যখন এসে পড়েছে তখন মৃত্যু কতোইনা মনোমুগ্ধকর।

তাঁর বিবরণগুলোর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি, আনসার মহিলাগণ বিবাহ অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। মুশরিক কবিরা মহানবী স. এর নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করতো। আর মুসলিম কবিরা সেগুলোর জবাব দিতেন কবিতার মাধ্যমে। মুসলিম কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত্ রা.।

হজরত ওসমানের শাহাদতের পর তিনি আবৃত্তি করেছিলেন এই কবিতাটি— 'যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতারা আমার কথা মানতো, তবে আমি তাদেরকে বাঁচাতে পারতাম এই বিশৃঙ্খলা থেকে।' বসরায় যখন উপনীত হন, তখন আবৃত্তি করেন— এখানকার তৃণলতাকে পছন্দ করো। অতঃপর বিচরণ করো রৌদ্র উত্তাপের মধ্যে, যেমার নামক স্থানের সবুজ সতেজ প্রান্তরে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কথা ও কবিতা একই। সুন্দর কথা হচ্ছে কথা সাহিত্য, আর সুন্দরতর কথার নাম কবিতা। ইসলাম শুভ-সুন্দর কবিতাকে স্বাগত জানায়। নিষিদ্ধ করে অশুভ-অশ্লীল কবিতাকে।

আর বক্তব্য বোধগম্য করাতে গিয়ে তিনি প্রায়শঃই এই কবিতাটির উদ্বৃতি দিতেন– কালচক্র তার বিপদাপদসহ যখন কোনো জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তা থামে তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির সামনে। আমাদের এ বিপদ দেখে যারা উল্লসিত হয়, তাদেরকে বলো— সতর্ক হও। অতি দ্রুত তোমরা মুখোমুখি হবে, যেমন হয়েছি আমরা।

হজরত আয়েশা বলতেন, তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের কবিতা শেখাও। এতে করে তাদের ভাষা সুন্দর হবে।



হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন হজরত ওমর রা.। তখন ইসলাম সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অধিকতর সচ্ছল। হজরত ওমর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। পবিত্র সহধর্মিণীগণের (আয্ওয়াজে মুতাহ্হারার) প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করলেন দশ হাজার দিরহাম। আর হজরত আয়েশা সিদ্দীকার জন্য বারো হাজার। বললেন, আমি তাঁকে বেশী দিলাম এই কারণে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্র প্রিয়তমা।

তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করে পাত্র তৈরী করেছিলেন। ওগুলোতে করে তিনি তাঁদের কাছে হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন। কোনো পশু জবেহ্ করা হলে খেয়াল রাখতেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবই যেনো তাঁদের কাছে যায়।

ইরাক বিজিত হলো। গণিমত হিসেবে উপস্থিত হলো মূল্যবান মোতিভর্তি একটি কৌটা। মোতিগুলো সকলের মধ্যে বণ্টন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো। হজরত ওমর উপস্থিত জনতাকে বললেন, আমি এগুলো আমাদের মাতা সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার কাছে পাঠাতে চাই। আপনারা অনুমতি দিন। আপনারা তো জানেন, তিনিই ছিলেন আল্লাহ্র রসুলের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। মোতিগুলো পেয়ে তিনি বললেন, খাত্তাবের পুত্র অনেক অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন। হে আল্লাহ্! তাঁর এসকল অনুগ্রহ লাভের জন্য আমাকে জীবিত রেখো না।

হজরত ওমর চাইতেন, তিনিও তাঁর বন্ধুদ্বয়ের পাশে শায়িত থাকবেন। একদিন তাঁর ছেলেকে অনুমতি প্রার্থনার জন্য পাঠালেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, তাঁদের পাশে আমি থাকবো মনে করেছিলাম। ঠিক আছে। অনুমতি দিলাম।

অনুমতি পাওয়ার পরেও তিনি এই মর্মে অসিয়ত করে গেলেন যে, আমার লাশের খাটটি নিয়ে তোমরা জননীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে পুনঃঅনুমতি প্রার্থনা কোরো। তিনি অনুমতি দিলে যথাস্থানে দাফন কোরো। আর অনুমতি না দিলে দাফন কোরো সাধারণ কবরস্থানে। তাই করা হলো। হজরত আয়েশা দ্বিতীয়বারের মতো অনুমতি দিলেন। এভাবে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলো তাঁর বহুদিন আগে দেখা একটি স্বপ্ন। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর ঘরে একের পর এক তিনটি চাঁদ একে একে এসে জমা হলো। স্বপ্নটির কথা পিতাকে বলেছিলেন তিনি। মহানবী স. এর মহাতিরোধানের পর তাঁর পিতা বলেছিলেন, সেই তিনটি চাঁদের একটি এ-ই এবং শ্রেষ্ঠটি।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান হলেন তৃতীয় খলিফা। বারো বছর শাসন করলেন তিনি। প্রথম অর্ধাংশ কেটে গেলো শান্তির সঙ্গে। তারপর শুরু হলো অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করতে লাগলো অনেক অযথার্থ অভিযোগ। তারা তাঁর পদত্যাগের দাবিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে ফেললো। তাঁর মনে পড়ে গেলো আল্লাহ্‌র রসুলের একটি বাণী। লোকেরা তোমাকে একটি বস্ত্র পরিধান করাবে। বস্ত্রটি তুমি স্বেচ্ছায় খুলে ফেলো না। তিনি পদত্যাগ করলেন না। আবার বিদ্রোহীদেরকে দমন করার নির্দেশও দিলেন না। বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল বলেছেন, শীঘ্রই মুসলমানদের তরবারী মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হবে। এ কাজে আমি প্রথম হতে পারি না।

সেদিন রোজা ছিলেন তিনি। অবরুদ্ধ খলিফা স্বগৃহে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। ওই সময় বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করে ফেললো। আর পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করলো হজরত আলীকে।

হজরত আয়েশা প্রতি বছরের মতো সেবারও হজ্বে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে জানতে পারলেন, খলিফা শহীদ হয়েছেন। নতুন খলিফা হয়েছেন হজরত আলী। এরকম মর্মবিদারক সংবাদ শুনে তিনি শোকে দুঃখে অধীর হয়ে উঠলেন। পথে দেখা হলো হজরত তালহা ও হজরত যোবায়েরের সাথে। তাঁরা দু'জনই ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সাহাবী। আরো ছিলেন জান্নাত অবধারিত হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁরা বললেন, আমরা যাদেরকে পরিত্যাগ করে এলাম, তারা উগ্র বেদুইন ও অসহায় জনতা। তারা কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে অনবধান। তারা যেমন সত্যকে চিনতে পারছেনা, তেমনি মিথ্যাকেও অস্বীকার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মর্মাহত মুমিনজননী হজরত আয়েশা আহত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন— 'যদি আমার কওম আমার কথা মানতো, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারতাম।'

তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন। মানুষকে তেলাওয়াত করে শোনালেন 'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে।'

বহুসংখ্যক লোক তাঁকেই মীমাংসাকারিণী হিশেবে মেনে নিলো। অনেকে রয়ে গেলো নিরপেক্ষ। আশংকা করলো যুদ্ধের। এই ত্রিধাবিভক্ত জনতার মধ্যে সাহাবীগণ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সরলমনা সাধারণ মুসলমান। মুনাফিকেরাও মিলে মিশে ছিলো সকলের সঙ্গে। যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে

মুসলমানদের বীর সন্তানগণ যাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে সেই চেষ্টাই করে যেতে লাগলো তারা। মুসলমানদের দুটি দলকে যুদ্ধলিপ্ত করতে সক্ষম হলো। ওই যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জননী হজরত আয়েশা ছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। তাই ওই যুদ্ধের নাম হয় জঙ্গে জামাল(উটের যুদ্ধ)।

উভয় দল মুখোমুখি হলো। দুই দলের পুরোধাগণই শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মুনাফিকেরা বিফল মনোরথ হয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। রাতের শেষ প্রহরে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। তারা একে অপরকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী ভাবতে লাগলেন। হজরত আলী লোকদেরকে থামাতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তবে নিরস্ত করতে সমর্থ হলেন তাঁর দুই বন্ধু হজরত তালহা ও হজরত যুবায়েরকে। তাঁদেরকে তিনি রসুলুল্লাহ্‌র একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, আমরা অস্ত্রধারণ করবো না। তাঁরা মদীনার পথ ধরলেন। পথিমধ্যে নামাজ পাঠের সময় মুনাফিকেরা তাঁদেরকে শহীদ করে ফেললো।

যুদ্ধ চললো দুপুর পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অধিনায়কগণ বুঝতে পারলেন, তাঁরা একটি ফেত্‌নাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সংযত হলেন। যুদ্ধ থেমে গেলো। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক লোক আহত ও নিহত হলেন। সাবায়ীদের (মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাবার অনুসারীদের) ইচ্ছা ছিলো, তারা মুমিন জননী হজরত আয়েশাকে অপমান করবে। কিন্তু তারা সফল হলো না। তারা উটের বর্ম আচ্ছাদিত হাওদাজকে লক্ষ্য করে দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু কাছে আসতে পারলোনা।

আহ! কী মর্মবিদারক ছিলো সেই দৃশ্য। উভয় দলের খাঁটি মুসলমানেরা আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্তরে কামনা করছেন, বন্ধ হোক ভ্রাতৃহত্যার এই জঘন্য যুদ্ধ। মুমিনজননীকে ঘিরে তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য লড়ছেন বীর মুমিনেরা। তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে কবিতা— হে আমাদের মাতা, হে আমাদের সেই মাতা, আমরা যাঁকে সর্বোত্তমা বলে জানি। দেখুন, আপনার কতো বীর সন্তানের হাত-পা কাটা যাচ্ছে। কর্তিত হচ্ছে মস্তক।

হজরত আলী রা. যথাযথ সম্মানের সাথে মুমিনজননী হজরত আয়েশাকে তাঁরই একান্ত সমর্থক কুফার বিশিষ্ট নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে খালফ আল খুজায়ীর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর পক্ষের আহত সৈনিকেরাও আশ্রয় পেলো সেখানে। তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। হজরত আলী তাঁর সঙ্গে দিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে এবং চল্লিশ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বসরী মহিলাকে।

যাত্রাকালে তিনি বিদায় জানাতে উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, একজন নারীর কন্যার জামাতার সাথে যে সম্পর্ক থাকে, সে রকম সম্পর্ক ছাড়া কোনো বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক আমাদের মধ্যে নেই। আমি জানি, তিনি সাধু পুরুষগণের একজন। হজরত আলী বললেন, ওহে জনমণ্ডলী! তিনি সত্যভাষিণী। আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা-দ্বেষ নেই। তিনি তোমাদের প্রিয়তম নবীর স্ত্রী— দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তিনি আমাদের, বিশ্বাসীগণের মাতা।



চার বছর ধরে রাজ্যশাসন করলেন আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী। তারপর বুঝতে পারলেন, তিনি শীঘ্রই শহীদ হতে যাচ্ছেন। একদিন তিনি হাত ধোয়ার সময় নিজের দাড়িতে হাত রেখে বললেন, তুই রক্তরঞ্জিত হবি।

আর একদিন বনী শোরাদের এক লোক এসে বললো, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! সাবধানে থাকবেন। খারেজীরা আপনাকে হত্যা করতে চায়।

হজরত আলী নিজেও বুঝতে পারলেন, কে এবং কারা তাঁকে হত্যা করতে চায়। তিনি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়লো না এতোটুকুও ।

সে রাতে তিনি ঘুমাতে পারলেন না। শেষ রাতে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন যে, আজান শুনতে পেলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত হাসান বললেন, মুয়াজ্জিন ইবনে বানাহ উচ্চকণ্ঠে নামাজ নামাজ বলতে লাগলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে ওঠালাম। তিনি অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করলেন। মসজিদের দিকে চলতে চলতে আবৃত্তি করলেন এই কবিতাটি— মৃত্যুর জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত হও। মৃত্যু তোমার সাথে সাক্ষাত করবে। মৃত্যুকে ভয় কোরো না, যখন সে উপস্থিত হবে তোমার গৃহদ্বারে।

একটু অগ্রসর হতেই দুই আততায়ীর তলোয়ার যুগপৎ আঘাত করলো। একটি তলোয়ারের আঘাতে দুফাঁক হলো তাঁর ললাটদেশ। তিনি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সফলকাম।

এরপর কয়েকটি দিন মাত্র তিনি গায়ে মাখলেন নশ্বর এ পৃথিবীর আলো বাতাস। পুত্রগণকে, পরিবার-পরিজনকে এবং সাধারণ মুসলমানকে সদুপদেশ দিলেন। কিছু উপদেশ লিপিবদ্ধও করালেন। পরিবারের সদস্য-সদস্যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে পরিবারবর্গ! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে রক্ষা করুন।

তোমাদেরকে নবী করীম স. এর নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমি তোমাদের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

এরকম অসিয়ত করার পর তিনি পবিত্র কলেমা বলতে বলতে চিরদিনের জন্য এই ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। কুফায় ছিলো তাঁর রাজধানী। সেখানেই মহাসম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাহিত করা হলো।

মদীনাবাসীগণ যখন শোক সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন আর নিজেদেরকে স্থির রাখতে পারলেন না। ঘরে ঘরে উঠলো কান্নার রোল। সাহাবীগণ বিশ্বাসীগণের জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার গৃহে সমবেত হলেন। দেখলেন, তিনি কেঁদে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। পরদিন এই সংবাদটি প্রচারিত হলো যে, তিনি রসুলুল্লাহ্‌র রওজা পাকে আসছেন।

পরদিন মহামাননীয়া মাতা রওজা শরীফে উপস্থিত হলেন। মসজিদে উপবিষ্ট সকল মুহাজির আনসার তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। সকলে সালাম বললেন। কিন্তু তিনি তখন এতোই শোকাচ্ছন্ন যে, কারো কথা শুনতে পেলেন না। তাই জবাবও দিলেন না। নির্বাক জননী টলে টলে যাচ্ছিলেন। ওড়না বার বার পায়ের দিকে পড়ে যাচ্ছিলো। অতি কষ্টে তিনি রওজা পাকে পৌঁছলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হে হেদায়েতের নবী! আপনার প্রতি সালাম। হে আবুল কাসেম! আপনার উপরে সালাম। হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আপনার প্রতি ও আপনার সাথীদের প্রতি সালাম। আমি আপনার প্রিয়তম সহচরের মৃত্যুসংবাদ জানাতে এসেছি। নতুন করে স্মরণ করুন আপনার প্রিয়তম সাথীর কথা। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পরীক্ষিত বন্ধু, আপনার মনোনীত সাথী পরলোকগমন করেছেন। আহ্! আমি তাঁর শোকে অশ্রু বিসর্জনকারিণী। আপনার কবর যদি উন্মুক্ত হতো, তবে আপনিও বলতেন, নিহত হয়েছেন আপনার প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।



পবিত্র সহধর্মিণী মুমিনজননী হজরত আয়েশার রসুলবিরহের সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো। একে একে শেষ হয়ে গেলো জ্যোতির্ময় খলিফা চতুষ্টয়ের শাসনকাল। শুরু হলো হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসন। তিনি থাকতেন তখনকার রাজধানী দামেশকে। মদীনায় এলে তিনি জননী আয়েশা সিদ্দীকা সকাশে অবশ্যই

উপস্থিত হতেন। একবার উপস্থিত হলে জননী আয়েশা তাঁকে বললেন, তুমি দেখছি নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার। এমনও তো হতে পারতো, আমি কোনো ঘাতককে ঠিক করে রাখতাম। সে তোমাকে অতর্কিতে আঘাত করতো।

হজরত মুয়াবিয়া বললেন, অসম্ভব। মাতৃগৃহ তো দারুল আমান (নিরাপদ গৃহ)। রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, ইমান হচ্ছে অতর্কিত হত্যার শিকল। কথাশেষে হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, হে আমাদের মা! আপনার সাথে আমার আচরণ কেমন হচ্ছে? জননী বললেন, ভালো। হজরত মুয়াবিয়া বললেন, অনুগ্রহ করে বনী হাশেম ও আমার বিষয়টি ছেড়ে দিন। আল্লাহ্র দরবারে বুঝাপড়া হবে।

ইরাক ও মিশরের কিছু লোক হজরত ওসমানের নিন্দা করতো। আবার সিরিয়াবাসীদের কেউ কেউ সমালোচনা করতো হজরত আলীর। আবার খারেজীরা ছিলো উভয় দলের বিরুদ্ধে। জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা সকল দল-উপদল সম্পর্কে জানতেন। আক্ষেপ করে বলতেন, কোরআনপাকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলের সাহাবীগণের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করতে বলেছেন। আর এই লোকেরা তাদেরকে গালি দেয়।

একবার জননী আয়েশা সিদ্দীকার উপদেশ প্রার্থনা করে একটি চিঠি লিখলেন হজরত মুয়াবিয়া। তিনি জবাবে লিখলেন, সালামুন আলাইকুম। অতঃপর আমি রসুলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের তুষ্টির দিকে দৃকপাত না করে আল্লাহ্র তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের অতুষ্টির পরিণাম থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে অতুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টিকামী হবে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দিবেন। ওয়াস্সালামু আলাইকা।

প্রতি বছর হজ্ব করেন তিনি। একবার তিনি মহানবী স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেয়েরা জেহাদ করতে পারবে না কেনো? তিনি স. বলেছিলেন, মেয়েদের জেহাদ হচ্ছে হজ্ব। বিশাল মুসলিম জনতার পরম শ্রদ্বেয়া জননী তিনি। সকলে তাঁর সেবাযত্নের জন্য সতত প্রস্তুত থাকেন। হাদিয়া পাঠান অনেকে। কিন্তু কোনোকিছুতেই তিনি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন না। প্রায় প্রতিদিনই রোজা রাখেন। মাত্র এক জোড়া বস্ত্র ব্যবহার করেন। একটি মূল্যবান বস্ত্রও তাঁর ছিলো। যার মূল্য ছিলো পাঁচ দিরহামের মতো। বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে অনেকে তাঁর ওই জামাটি চেয়ে নিয়ে কনেকে সাজাতো।

কখনো কখনো জাফরান রাঙানো জামা পরিধান করতেন। মাঝে মাঝে অলংকারও পরতেন। ইয়েমেনের তৈরী শাদা কালো কাজ করা মোতির একটি হার তার কণ্ঠে শোভা পেতো। হাতের আঙ্গুলে সোনার আঙটিও পরতেন। কাসেম ইবনে মোহাম্মদ বলেছেন, আমি জননী আয়েশাকে ইহরাম অবস্থায় সোনার আঙটি এবং হলুদ রঙের পোশাক পরতে দেখেছি।

পর্দা পালন করতেন কঠোরতার সাথে, যথানিয়মে। একবার তাঁর ভাতিজি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একটি পাতলা ওড়না মাথায় দিয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁর ওড়নাটি নিয়ে ফেঁড়ে ফেললেন। মোটা কাপড়ের একটি ওড়না তাকে দিয়ে বললেন, জানো না, সুরা নূরে আল্লাহ্ কী বলেছেন? একবার এক বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দেখলেন, গৃহকর্তার প্রায় যুবতী দুটি মেয়ে চাদর ছাড়াই নামাজ পড়ছে। তিনি বললেন, মেয়েরা যেনো চাদর ছাড়া নামাজ না পড়ে।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু ছিলেন বহুসংখ্যক পিতৃহারা-মাতৃহারাদের প্রতিপালনকারিণী মা। তাদের তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন এবং বিবাহশাদীর ব্যবস্থা করতেন।

তাঁর অস্তিত্ব ছিলো পুষ্পাপেক্ষা অধিক শুভ্রসুন্দর, পুতঃপবিত্র। পরনিন্দা তিনি কখনোই করতেন না। তাঁর বহু কথা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে কারো সম্পর্কে কোনো অপমন্তব্য ও সম্মানহানির কিছু নেই। সপত্নীদের সম্পর্কে তিনি খারাপ কিছু বলতেন না। বরং উদারচিত্তে প্রশংসা করতেন। তাঁদের ভালোও বাসতেন। ক্ষমা করে দিতেন সকলের অপরাধ। এমনকি যে কবি হাস্সান ইবনে সাবেত্ মিথ্যা অপবাদের সময় মুনাফিকদের অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলেন, তাঁকেও তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দানে ধন্য করেছিলেন।

অহংকার কখনোই তাঁর সত্তার সন্নিকটবর্তী হতে পারেনি। নিজেকে তিনি অনুল্লেখ্য ও অতি সাধারণ মনে করতেন। আর কেউ তাঁর সামনাসামনি প্রশংসা করুক, তা তিনি সহ্যই করতে পারতেন না। তবে পবিত্র আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সতত সচেতন। পুত্রস্নেহে বড় করে তুলেছিলেন ভগ্নিপুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে। তিনিও হজরত আয়েশাকে শ্রদ্ধা করতেন মায়ের চেয়ে বেশী। তিনি একবার হজরত আয়েশার অতি দানশীলতা দেখে মন্তব্য করলেন, তাঁর দানের হাত সংযত হওয়া উচিত। একথা শুনে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয়। তিনি কসম খেয়ে বলেন, আর কখনো তিনি আবদুল্লাহ্র কোনো উপহার স্পর্শ করবেন না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের মাতৃরোষের শিকার হয়ে ভীষণ আশান্তিতে ভোগেন। সুপারিশকারী হিসেবে তাঁর পক্ষ নেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি রোষ সংবরণ করেন।

সূক্ষ্ম ও সঠিক ন্যায়বোধও তাঁর ছিলো। নিকটের বা দূরের যেই হোক না কেনো, সকলের শুভগুণাবলীর তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করতেন।

দানশীলতা ছিলো মহানবী স. এর একটি সত্তাসম্পৃক্ত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর সকল প্রেমিক, প্রেমিকাগণেরও স্বভাববৈশিষ্ট্য। জননী আয়েশার

স্বভাবে এই গুণটি ছিলো অন্যাপেক্ষা অনেক অনেক তীব্র। তাঁর প্রিয় ছাত্র ও প্রখ্যাত তাবেয়ী ওরওয়া বলেছেন, একবার আমার সামনেই তিনি সত্তর হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিয়ে তাঁর চাদরের কোণা মুড়ে ফেললেন। এরকম ঘটনা একটি, দুটি নয়— অনেক। যাচঞাকারীকে বিমুখ করতেন না। অল্প-বেশী যাই থাকতো প্রার্থীদেরকে নির্বিলম্বে দান করে দিতেন।

ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাতে ঘুম থেকে উঠে একাই কবরস্থানে চলে যেতেন। যুদ্ধের ময়দানেও কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিমবাহিনী অপ্রস্তুত ও আক্রান্ত, তখনও তিনি মশক ভর্তি পানি পিঠে বহন করে নিয়ে আহত সৈনিকদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। খন্দক যুদ্ধের সময় যখন মুশরিকবাহিনী দ্বারা মদীনা অবরুদ্ধ; তদুপরি ছিলো গৃহশত্রু ইহুদীদের আক্রমণাশঙ্কা, তখনও তিনি দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধ কৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার তো মহানবী স. এর কাছে জেহাদের অনুমতিও প্রার্থনা করে ছিলেন। কিন্তু অনুমতি পাননি।

দাস-দাসীদের প্রতি ছিলেন খুবই সদয়। যে কোনো অজুহাতে দাসমুক্ত করতেন। একবার তো একটি মাত্র শপথের ক্ষতিপূরণ হিসেবে চল্লিশ জন দাসকে মুক্ত করে দেন। সর্বমোট ৬৭ জন দাস-দাসী মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি।

তাজীম গোত্রের একটি দাসী ছিলো তাঁর । তিনি রসুলুল্লাহ্‌র কাছে শুনতে পান, দাসীটি নবী ইসমাইলের বংশধর। রসুলুল্লাহ্ স. এর ইঙ্গিতে দাসীটিকে মুক্ত করে দেন তিনি। মদীনায় ছিলো অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার জন্য মনিবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা এক দাসী। সে মানুষের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতো। একথা শুনতে পেয়ে তিনি একাই সব অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্ত করেন।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, কেউ হয়তো যাদুটোনা করেছে। তিনি এক দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যাদু করেছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেনো? সে বললো, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি মারা যান, আর আমি মুক্ত হতে পারি। তিনি নির্দেশ দিলেন, একে কোনো ধনী লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় একটি দাস ক্রয় করা হোক এবং দাসটিকে মুক্ত করা হোক।

শরীয়তের অতি সাধারণ শুভ-অশুভ কাজের প্রতি তিনি ছিলেন সদা সজাগ। ছোট খাট অসিদ্ধ কাজগুলোও তিনি এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শুনলে থেমে যেতেন, যাতে আর শোনা না যায়। তাঁর বাসভবনের একাংশে এক ভাড়াটিয়া বাস করতো। সে দাবা খেলতো। একথা শুনতে পেয়ে তিনি তাকে সাবধান করে দিলেন। বলে দিলেন, এ খেলা বন্ধ না করলে তাকে বের করে দেওয়া হবে।

তাঁর মন ছিলো কুসুমের চেয়ে কোমল। কারো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে কেঁদে ফেলতেন। মিথ্যা অপবাদের এক মাস তো কেবল কেঁদেই কাটিয়েছেন। বিদায় হজ্বের সময় নারী প্রকৃতিজনিত প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। পরে রসুলুল্লাহ্ নিজে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করেন। দজ্জালের ভয়েও একবার আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন তিনি।

একবার একটি কথার উপর তিনি কসম করে বসলেন। লোকেরা অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলো। তাদের পীড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত কসম ভঙ্গ করেন। কাফফারা স্বরূপ মুক্ত করে দেন ৪০টি ক্রীতদাসকে। ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। ঘটনাটির কথা মনে হলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। চোখের পানি মুছতে মুছতে আঁচল ভিজে যেতো। উটের যুদ্ধের কথা মনে হলেও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতেন। কখনো বলতেন, হায়! আমি যদি বৃক্ষ হতাম। হায়! যদি পাথর হতাম- যদি কিছুই না হতাম।

একবার বসরার এক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি ওই লোকটিকে চেনো, যে সেদিন আবৃত্তি করেছিলো 'হে আমাদের জননী! হে আমাদের সেই জননী মহোদয়া, যাকে আমরা সর্বোত্তমা বলে জানি। দেখুন, আপনার কতো বীর সন্তানের হাত-পা কাটা যাচ্ছে, কর্তিত হচ্ছে মস্তক।' লোকটি বললো, সে তো ছিলো আমার ভাই। তার কথা শুনে জননী মহোদয়া এতো বেশী কাঁদলেন যে, মনে হচ্ছিলো, তাঁর কান্না কখনোই থামবে না।

কখনো আক্ষেপ করতেন এরকম কথা বলে যে, হায়! ওই মর্মপীড়াদায়ক যুদ্ধের বিশ বছর আগেই যদি আমি দুনিয়া থেকে চলে যেতাম, তাহলে কতোই না উত্তম হতো। 'যখন তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে' এই আয়াত যখন তেলাওয়াত করতেন, তখনও অশ্রুবর্ষণ করতেন অঝোর ধারায়।



হিজরী ৫৮ সাল। মহামাননীয়া আয়েশা সিদ্দীকার বয়স হলো ৬৬ বছর। তিনি পরকাল যাত্রার জন্য উন্মুখ হলেন। দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণার এবার অবসান হবে। চিরদিনের জন্য তিনি মিলিত হবেন হৃদয়ের হৃদয়, স্বামী ও রসুল মোহাম্মদ

মোস্তফা স. এর সঙ্গে। আশা-আশঙ্কা-আনন্দ সবকিছু একাকার হয়ে তাঁর বিদায়যন্ত্রণাকে ঢেকে ফেলতে চায়। অবর্ণনীয় এক অনুভূতির মধ্যে সারাক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন তিনি। সাক্ষাতপ্রার্থী ও সাক্ষাতপ্রার্থিনীদের ভিড় বাড়ে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, ভালো আছি। কিন্তু পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের প্রতি মনোযোগ হতে থাকে শিথিল, শিথিলতর।

শারীরিক অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যেতে থাকে। শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয় সারাক্ষণ। ওঠা-বসার শক্তি রহিতপ্রায়। তৎসত্ত্বেও স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি অটুট। এ সময় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস সাক্ষাতপ্রার্থী হলেন। জননী আয়েশা সিদ্দীকা ভাবলেন, মুমিনজননীগণের প্রতি তাঁর যেরকম গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, তাতে তিনি হয়তো এসেই তাঁর প্রশংসা-প্রশস্তি শুরু করে দিবেন। তাঁকে মৌন থাকতে দেখে তাঁর বোনের ছেলেরা সুপারিশ করলেন, দয়া করে অনুমতি দিন। কারণ আপনি উম্মুল মুমিনীন। আর তাঁর সম্পর্কে তো জানেনই। তিনি তো ইবনে আব্বাস। আপনাকে সালাম ও বিদায় জানাতে এসেছেন। তিনি বললেন, আসতে বলো।

জননীর আশঙ্কাই সত্য হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ সালাম দিয়ে বসার সাথে সাথে বলতে শুরু করলেন, সেই আদি কাল থেকেই আপনি উম্মুল মুমিনিন। আপনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাদেশবাহকের প্রিয়তমা। তাঁর সঙ্গে আপনার মিলনের সময় সমাগত। অপেক্ষা শুধু প্রাণবায়ুটুকু বের হয়ে যাওয়ার। যে রাতে আপনার কণ্ঠহারটি হারিয়ে গেলো, যখন আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক খুঁজাখুঁজি করেও পানি পেলেন না, তখন আপনার কারণেই আমরা পেলাম তায়াম্মুমের বিধান। জিব্রাইল আমিন আপনার শুচিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কিত বাণী নিয়ে এসেছেন আকাশ থেকে। ওই পবিত্র বাণীসম্ভার মহাপ্রলয় পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে গৃহে, মসজিদে, সর্বত্র।

জননী তাঁকে থামালেন। বললেন, ইবনে আব্বাস! এ সকল নন্দনবাক্য থেকে আমাকে অব্যাহতি দান করুন। আমার তো একথা ভাবতেই পছন্দ যে, আমার যদি অস্তিত্বপ্রাপ্তিই না ঘটতো।

ঘটলো পবিত্র রমজান মাসের শুভাগমন। আল্লাহ্পাকের দয়া ও ক্ষমার আলোয় ভরে গেলো বিশ্বচরাচর। নূরের প্লাবন ভরা এই মাসে তখনকার এবং অনাগত কালের সন্তানদের শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মহিয়সী মা-জননী চিরতরে চলে গেলেন। অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমাকে তোমরা জান্নাতুল বাকী গোরোস্থানে রসুলুল্লাহ্র অন্য স্ত্রীগণের পাশে কবর দিয়ো। রাতে যদি চলে যাই, তবে রাতেই দাফনের কাজ শেষ করে ফেলো।

রাতে বিতির নামাজের পরেই ঘটলো তাঁর মহাতিরোধান। মাতৃহারা মদীনাবাসীগণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। জানাযায় এতো লোকের সমাবেশ ঘটলো যে, ইতোপূর্বে এরকম কখনোই দেখা যায়নি। মেয়েরাও উপস্থিত হয়েছিলেন দলে দলে। মনে হচ্ছিলো, ঈদ উৎসবের জনজটলা।

মুমিনজননী উম্মে সালমা কান্নার আওয়াজ শুনে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আয়েশার জন্য বেহেশত অবধারিত। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় সহধর্মিণী।

হজরত মুয়াবিয়া রা. কর্তৃক নিয়োজিত মদীনার প্রশাসক তখন হজরত আবু হুরায়রা। তিনিই জানাযার নামাজের ইমাম হলেন। বিশাল সমাবেশের দোয়া ও জানাযা শেষ হবার পর তাঁকে কবরে নামালেন তাঁর বোন ও ভাইয়ের ছেলেরা— কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর রা., আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আতিক, ওরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়ের রা.।

হজরত হাফসা বিনতে ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



জীবন কখনো গলাধঃকরণ করে দুখের গরল, আবার কখনো শরীরে মাখে সুখের সুরভি। দিবস-বিভাবরী যেমন একে একে পার হয়ে যায়, তেমনি জীবনের জলে ভেসে চলে অশ্রু ও আনন্দ। আর জীবন মানে ভোগ ও ত্যাগের বিস্ময়কর এক সমন্বয়ন। বিস্ময় ও রহস্যময়তার সংজ্ঞা মানুষে মানুষে আনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা। তাই সকল মানুষ থেকে মহাপুরুষগণ হয়ে যান পৃথক ভাবনা-বেদনা-চেতনার প্রভিভূ। তাঁদের ভোগও ত্যাগের মতো মহিমময়, পবিত্র।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল যিনি, তিনি তো মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকের প্রিয়তমজন— হাবীব। আল্লাহ্পাকই তাঁকে সাজিয়েছেন সকল স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য দিয়ে। দিয়েছেন নারী, পবিত্র সহধর্মিণী। ধর্ম-কর্ম-মর্ম সব কিছুতেই তাঁরা নবী জীবনের শান্তি, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণা।

একে একে তাঁরা মহানবী স. এর জীবনে এসেছেন পবিত্র উপহার হিসেবে। প্রথমে হজরত খাদিজা তাহেরা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তিনি পালন করেছেন পবিত্র সহধর্মিণীর দায়িত্ব। তারপর হজরত সওদা ও হজরত আয়েশা। তারপর হজরত হাফসা।

হেরাপর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যখন মহানবী স. প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হন, তার পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মক্কার কুরায়েশেরা তখন ব্যস্ত ছিলো কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণকর্মে। পিতৃগৃহে বেড়ে ওঠা হজরত হাফসা পিতৃগৃহেই পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনিও কুরায়েশ কুলোদ্ভবা। তাঁর মাতাও ছিলেন নিষ্ঠাবতী মহিলা সাহাবী। নাম যয়নব বিনতে মাযউন। আর মামা হজরত ওসমান ইবনে মাযউন রা.। তিনিও ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী। আর ছয় বছরের ছোট ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মুহাদ্দিস ও ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী হিসেবে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছেন।

হজরত হাফসা যুবতী হলেন। পিতা-মাতা তাঁকে পাত্রস্থ করতে মনস্থ করলেন। ভাবনা-আলোচনার পর তাঁকে বিবাহ দিলেন বনী সাহাম গোত্রের খুনাইস ইবনে হুজাফার সঙ্গে। হজরত খুনাইসও ছিলেন মহানবী স. এর প্রিয় সাহাবী।

ছয় বছর ধরে ইসলাম প্রচার করে চলেছিলেন মহানবী স.। এই ছয় বছরে অল্প কিছুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। প্রতাপশালী কুরায়েশ গোত্রপতিরা ছিলো ঘোর বিরোধী ও অত্যাচারপ্রবণ। তাই তিনি স. প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার করতে পারছিলেন না। এমন সময় হজরত ওমর সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরিস্থিতি বদলে যায়। প্রচারকর্ম চলতে থাকে প্রকাশ্যে। কিন্তু গোত্রপতিরা বিরোধিতা করতে থাকে আগের চেয়ে তীব্রভাবে। অবস্থার উন্নতি তো হয়ই না, বরং অবনতি হতে থাকে আরো।

কাফের কুরায়েশদের হাত থেকে বাঁচাতে মহানবী স. সাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন। দুই বার দুই দল সাহাবী এ নির্দেশ পালন করেন। হজরত খুনাইস সস্ত্রীক হিজরত করেন দ্বিতীয় দলের সঙ্গে।

যাঁরা মক্কায় বসবাস করতে থাকেন, তাঁরা হতে থাকেন আরো বেশী অত্যাচারিত। তাঁরাও হিজরত করতে বাধ্য হন। মহানবী স.ও হিজরত করে চলে যান মদীনায়। প্রধান সাহাবীগণও অনুগমন করেন তাঁর। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের কেউ কেউ মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। হজরত হাফসা ও হজরত খুনাইসও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। মক্কাবাস তাঁদের জন্য স্বস্তিকর ছিলো না। তাই তাঁরা পুনরায় হিজরত করেন। গ্রহণ করেন মদীনার আনসারগণের উষ্ণ আতিথ্য ও ভালোবাসা।

মদীনা মনোয়ারায় মুসলমানগণ কাফের-মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের সংখ্যা বেড়ে চললো। শক্তিবৃদ্ধি হতে লাগলো তাঁদের। এভাবে গত হয়ে গেলো একটি বছর। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো বদরে। মুসলমানেরা পেলেন প্রথম বিজয়। কাফেরদের প্রধান নেতারা নিহত হলো। শহীদ হলেন অল্পকিছু সংখ্যক সাহাবীও। হজরত খুনাইস আহত হলেন মারাত্মকভাবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় ফিরে আসতে সমর্থ হলেন বটে, কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। কয়েকদিন পরে পান করলেন শাহাদতের পেয়ালা।

বদরযোদ্ধাদের ফযীলত অনেক। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত জিব্‌রাইল রসুলুল্লাহ্ স. কে জিজ্ঞেস করলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? তিনি স. বললেন, তারা অন্য মুসলমানের চেয়ে উত্তম। অন্য এক বিবরণে এসেছে, যারা বদর ও হুনাইনে অংশগ্রহণ করেছে, তারা

কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। তিনি স. আরো বললেন, আল্লাহ্ আহলে বদর সম্পর্কে জানিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো— আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।



হজরত ওমর তাঁর একান্ত আদরের কন্যা হাফসার পুনঃবিবাহ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করবার ইচ্ছা হলো তাঁর। নবীদুলালী হজরত রুকাইয়া কয়েকদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর বিপত্নীক স্বামী হজরত ওসমান বিমর্ষ ও শোকাচ্ছন্ন। প্রথমে তাঁর কথাই মনে হলো। তিনি তাঁর কাছেই বিবাহের কথাটা পাড়লেন। হজরত ওসমান বললেন, ভেবে দেখি। হজরত ওমর কয়েকদিন পর আবার কথাটা তুললেন। এবার হজরত ওসমান স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন, এখন বিবাহ করার ইচ্ছা তাঁর নেই।

বিফল মনোরথ অবস্থায় আরো কয়েকদিন কেটে গেলো। হজরত ওমর এবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন হজরত আবু বকরের কাছে। তিনি কিছুই বললেন না। তাঁর মৌনতার আঘাতে হজরত ওমর দুঃখ পেলেন আগের চেয়ে বেশী।

কয়েকদিন পর মহানবী স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর দুঃখের কথা খুলে বললেন। তিনি স. বললেন, ওমর! আমি কি তোমাকে ওসমানের চেয়ে ভালো জামাতা এবং ওসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শশুরের সন্ধান দিবো না? হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশপ্রচারক! অবশ্যই দান করুন। মহানবী স. বললেন, হাফসাকে আমার সাথে বিবাহ দাও। আর আমি আমার মেয়ে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেই ওসমানের সঙ্গে। হজরত ওমর মহাআনন্দিত হলেন। নিজেই ওলী হলেন। হজরত হাফসার সঙ্গে রসুলুল্লাহ্র শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে। মোহরানা নির্ধারণ করা হলো চার শত দিরহাম।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি তো দুঃখ পেয়েছিলে খুব। আল্লাহ্র রসুল একদিন

হাফসার কথা উঠিয়েছিলেন। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি স. হাফসাকে ঘরণী করতে চান। আমি তাঁর গোপন ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে চাইনি। তাই নীরব ছিলাম।



সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন হজরত হাফসা রা.। তাঁর বয়স তখন বিশ বছর। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, এ সংসার অন্যের সংসারের মতো নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হাবীব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের সংসার, যিনি বলেছেন, পৃথিবীর সঙ্গে আমার কী বা সম্পর্ক— সম্পর্ক তো শুধু এতোটুকু, যেমন কোনো পথিক বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করলো, তারপর সে আশ্রয়স্থল ছেড়ে চলে গেলো। যিনি প্রার্থনা করেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা, তোমাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং এমন আমল যাচঞা করি, যা আমাকে তোমার ভালোবাসায় পৌঁছে দেয়।

হজরত হাফসা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের ভালোবাসায় নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। প্রায়শই রোজা রাখেন। রাত জেগে জেগে নামাজ পড়েন। তাঁর রূপ ও গুণের কারণে, ইবাদতপ্রিয়তার কারণে মহানবী স. তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন। হজরত হাফসা পিতার মতোই তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন, আবার পিতার মতোই অন্তরে ধারণ করেন আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অক্ষয় বিশ্বাস এবং অফুরন্ত ভালোবাসা। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হয়। কিন্তু কখনোই তা মনোমালিন্য পর্যন্ত গড়ায় না।

একদিন হজরত ওমর রা. তাঁর নিজের বাড়ীতে কী এক বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, কী ভাবছো এতো? হজরত ওমর রা. বললেন, তোমাকে অতো ভাবতে হবে না। স্ত্রী বললেন, আমার কথা ভালো লাগছেনা, না? হাফসাকে গিয়ে দেখো, রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে সে কেমন কথা কাটাকাটি করে। হজরত ওমর তক্ষুণি গিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত হাফসার ঘরে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো? তিনি জবাব দিলেন,

ওরকম তো কখনো কখনো হয়েই যায়। হজরত ওমর বললেন, সাবধান! আর কখনো কোরো না। আর একথাও কখনো ভেবো না যে, রসুলুল্লাহ্ তোমার রূপমুগ্ধ। সর্বাবস্থায় মেনে নিয়ো তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে।

আর একদিন তো নিজের চোখেই দেখলেন, তাঁর আদরের কন্যা রসুলুল্লাহ্র সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করছে। তিনি রেগে গেলেন। কন্যাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। মহানবী স. দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। হজরত ওমর লজ্জিত হলেন বটে, কিন্তু মেয়েকে শাসালেন এবং একথা বলে দিলেন যে, খবরদার! রসুলুল্লাহ্র কথার পিঠে এভাবে কথা বলবে না। তুমি কি যয়নাবের মতো সুন্দর, না আয়েশার মতো ভাগ্যবতী?

হজরত ওমর চলে গেলে মহানবী স. বললেন, হাফসা! দেখলে তো, তোমাকে কীভাবে রক্ষা করলাম।

জ্ঞানচর্চা ছিলো তাঁর প্রিয় একটি বিষয়। তাঁর অন্বেষণপ্রবণ মন কোনো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ না করা পর্যন্ত শান্ত হতো না। মহানবী স. এর কোনো বক্তব্য বুঝতে না পারলে তিনি প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে দ্বিধা-সন্দেহের অবসান ঘটাতেন। যেমন একবার মহানবী স. বললেন, আশাকরি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। হজরত হাফসা বললেন, তা কেনো হবে। আল্লাহ তো বলেছেন, 'তোমাদের সবাইকে জাহান্নামে হাজির করা হবে'। (সুরা মার্ইয়ম, আয়াত ৭১)। মহানবী স. বললেন, কথাটা ঠিকই। কিন্তু একথাও তো আল্লাহ্পাক বলেছেন 'অতঃপর আমি আল্লাহ্ভীরুদেরকে নাজাত দান করবো এবং জালেমদেরকে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উপুড় করে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

মহানবী স. তাঁর লেখাপড়া শেখার প্রতি অতি আগ্রহ দেখে তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। লেখাপড়া শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করেন শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্ নাম্নী এক সাহাবীয়াকে। তিনি এক প্রকারের ক্ষতরোগ নিরাময়ের মন্ত্র জানতেন। একদিন মহানবী স. তাঁকে বললেন, তুমি কি নিরাময়মন্ত্রটি হাফসাকে শেখাবে না, যেমন তাকে শিক্ষা দিয়েছো লেখা?

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মতোই। তিনি তাঁর স্বামী মহানবী স. এবং তাঁর পিতা হজরত ওমর ফারুক থেকে শুনে ৬০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস শুনে প্রচার করেছেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. হামযা ইবনে আবদুল্লাহ্, সাফিয়া বিনতে উবায়দা, মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদায়া, উম্মে মুবাশ্শির আল আনসারিয়া, আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, শুতাইর ইবনে শাকাল, মাওয়া আল খুযায়ী, আল মুসাইয়্যেব ইবনে রাফে, আল মাযলায প্রমুখ।

সপত্নীগণের মধ্যে বেশী ভালোবাসতেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে। দুজনের সম্পর্ক ছিলো সখী-সহচরীর মতো, বোনের মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা এক জোট হতেন। হজরত আয়েশা মন্তব্য করেছেন, হাফসা বাপের বেটি। তার বাপ যেমন প্রতিটি কথায় দৃঢ়সংকল্প, সে-ও তেমনি। আরো বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণীদের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবীদার।

সম্ভবত একথাটি তাঁরা ভুলতেন না যে, তাঁদের সম্মানিত পিতৃদ্বয় আল্লাহ্‌র রসুলের সবচেয়ে প্রিয় সহচর ও বন্ধু। তবে তাঁদের পরস্পরের ভালোবাসার স্বচ্ছ নীল আকাশে ক্বচিৎ কখনো দেখা দিতো নারীসুলভ হিংসা-দ্বেষের ধুসর মেঘ। আবার তা কেটেও যেতো তাঁদের অমলিন অন্তঃকরণের কারণে।

মহানবী স. কখনো কখনো তাঁদের দুজনকে তাঁর সফরসঙ্গিনী করতেন। একবার তো দুজনে উটের হাওদাজ বদল করে জয়-পরাজয়ের খেলায় মেতেছিলেন। হজরত হাফসা কৌশল করে মহানবী স.কে এক মঞ্জিল পথ পর্যন্ত কাছে পেয়েছিলেন। আর হজরত আয়েশা ঘাসের জঙ্গলে পা প্রবেশ করিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! বিষাক্ত বিচ্ছু, অথবা সাপ পাঠিয়ে দাও, আমাকে দংশন করুক।

তাহ্‌রীমের ঘটনাটিও তাঁরা ঘটিয়েছিলেন একজোট হয়ে– হজরত সওদা ও হজরত সাফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। ইতোপূর্বে এ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেওয়া হলো আরেকটি বর্ণনান্তর।

মধু ও মিষ্টি ছিলো মহানবী স. এর প্রিয় আহার্য। তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিলো, আসরের পর পত্নীদের প্রকোষ্ঠে কিছুক্ষণ করে সময় কাটানো। আর সময়দানের ক্ষেত্রেও তিনি মোটামুটি সমতা রক্ষা করেই চলতেন। একদিন ঘটলো কিছু ব্যতিক্রম। তিনি হজরত যয়নবের কক্ষে একটু বেশী সময় অবস্থান করলেন। হজরত আয়েশা বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিলেন না। ঈর্ষান্বিত হলেন। বিলম্বের কারণ জানতে চেষ্টা করলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, কোনো এক মহিলা হাদিয়া হিসেবে তাঁর কাছে কিছু মধু পাঠিয়েছে। ওই মধুই যয়নাব পান করতে দিয়েছেন। আর প্রিয় আহার্য পেয়ে মহানবী স. সেখানে একটু বেশী সময় কাটিয়েছেন। পরদিন ঘটলো একই ঘটনা। তার পরদিনও। হজরত আয়েশা ঠিক করলেন, এর একটা বিহিত তিনি করবেনই। হজরত হাফসাকে ডেকে বললেন, যখন তিনি স. তোমার কাছে আসবেন, তখন বোলো, আপনার মুখে তো মাগ্‌ফিরের গন্ধ।

পরদিন পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা হলো। মহানবী স. মাগ্‌ফীরের গন্ধ খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর মনে হলো, তিনি মাগ্‌ফীরের ফুলের মধুই পান করেছেন। তিনি স. মন্তব্য করলেন, এখন থেকে মধুপান আমার জন্য হারাম।

হজরত আয়েশা এবং হজরত হাফসা বুঝতে পারলেন, কাজটা ভালো হলো না। ওহীও অবতীর্ণ হলো। বলা হলো, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের মনোতুষ্টির জন্য আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তা কেনো হারাম করে দিলেন।'

মধুপান নিজের জন্য হারাম করার কথাটি তিনি স. হজরত হাফসাকে গোপন রাখতে বলেন, যাতে হজরত যয়নাব মনে কষ্ট না পান। কিন্তু হজরত হাফসা নির্দেশটি মান্য করতে পারেননি। অতি-অন্তরঙ্গতার বশীভূত হয়ে কথাটি তিনি হজরত আয়েশাকে জানান। তখন অবতীর্ণ হয়— 'স্মরণ করো— নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলো। অতঃপর যখন সে তা অন্যদেরকে বলে দিয়েছিলো, এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো। যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো, তখন সে বললো, 'কে আপনাকে এটা অবহিত করলো? নবী বললো, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

আরো অবতীর্ণ হলো— 'যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো তবে ভালো, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা করো তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ই তার বন্ধু এবং জিব্রাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী'।

এখানে 'যদি তোমরা উভয়ে' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আয়েশা এবং হজরত হাফসাকে। বলা হয়, এই ঘটনার পর মহানবী স. হজরত হাফসাকে সতর্ক তালাক (এক তালাক) দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তালাক ফিরিয়েও নিয়েছিলেন অল্পক্ষণের মধ্যে। কারণ তখনই হজরত জিব্রাইল আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! এরকম করবেন না। হাফসা অত্যধিক রোজা পালন করেন। আর রাত জেগে আল্লাহ্র ইবাদত করেন। জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিলো হজরত হাফসার দাম্পত্য জীবনে। তবে ওই ঘটনায়, তিনি একা নন, জড়িত ছিলেন সকল মুমিনজননী। তাঁরা সকলে এক জোট হয়ে রসুলেপাক স. সকাশে অধিকতর উন্নত জীবিকা এবং কিছু বিলাস সামগ্রীর দাবি উত্থাপন করেছিলেন। আর রসুলুল্লাহ্ পণ করেছিলেন, একমাস তিনি স. স্ত্রীসঙ্গ থেকে পৃথক থাকবেন। তাই করলেন। পৃথক একটি প্রকোষ্ঠে একা বসবাস করতে লাগলেন। মুনাফিকেরা রটিয়ে দিলো, রসুলুল্লাহ্ তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হজরত ওমর নিজে বলেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। লোকমুখে প্রচারিত হলো, তিনি স. তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। আমি হাফসাকে বললাম, শুনলাম, রসুলুল্লাহ্

তোমার উপর অসন্তুষ্ট। আমি না থাকলে তিনি অবশ্যই তোমাকে তালাক দিতেন। একথা শুনে হাফসা খুব কাঁদলো। রসুলুল্লাহ্ পাশের ঘরেই ছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার অনুমতি পেলে আমি হাফসার কল্লা কেটে আনবো। রসুলুল্লাহ্ ইশারায় আমাকে শান্ত হতে বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দান করেছেন? তিনি স. বললেন, না। একথা শুনেই আমি মসজিদে উপস্থিত হলাম। লোকদের ভ্রান্তি নিরসনার্থে উচ্চকণ্ঠে বললাম, না। আল্লাহ্র রসুল তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি।

এই ঘটনার পর আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর পত্নীদেরকে এমতো অধিকার দিয়েছিলেন যে, তাঁরা ইচ্ছা করলে রসুলুল্লাহ্র সংসারে থাকতেও পারেন, চলেও যেতে পারেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র রসুলকে ছেড়ে হজরত হাফসা চলে যাননি। চলে যাননি অন্যান্য মুমিনজননীগণও।

হজরত হাফসা সপত্নীদের সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন। তাঁর স্বভাবসুলভ উষ্ণতার কারণে কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটতো। কিন্তু সার্বিক অবস্থা ছিলো প্রীতিময়, সন্ধি-সুন্দর।

একবার রসুলুল্লাহ্ স. উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়ার ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। তিনি স. বললেন, কাঁদছো কেনো? হজরত সাফিয়া বললেন, হাফসা আমাকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছে। তিনি স. তক্ষুণি হজরত হাফসাকে ডেকে এনে বললেন, হাফসা! আল্লাহ্কে ভয় করো। আর জননী সাফিয়াকে বললেন, তুমি নবী হারুনের বংশধর। সে সম্পর্কে তিনি তোমার পূর্ব পিতা! আর নবী মুসা তোমার পূর্ব পিতৃব্য। আর তুমি নবীর স্ত্রী। হাফসা তোমার চেয়ে কোন্ দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, বলো তো।

জীবন এগিয়ে চলে। দিকে দিকে ঘোষিত হতে থাকে ইসলামের বিজয় বারতা। আলোকিত হয় আরবভূমি। আলোকিত হতে থাকে আজম-পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ড। আল্লাহ্র রসুলের কাজ শেষ হয়। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় 'আজ তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম'। ডাক আসে মহাপ্রভুপালকের একান্ত সন্নিধানের। নিসর্গে নেমে আসে বিদায়ের বিষণ্নতা। মহামমতার অপার পারাবার, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মিলিত হন পরম প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে। তাঁর শোকাতুরা সঙ্গিনীগণ অপেক্ষায় থাকেন। গ্রহণ করেন অধিকতর উপাসনাপ্রবণ জীবনকে। পালন করে চলেন ধর্মপ্রচারের ঐকান্তিক দায়িত্ব।



খলিফা হলেন হজরত আবু বকর। সুকঠিন সতর্কতার সঙ্গে পালন করে চললেন নতুন ধর্মরাষ্ট্রের শাসনদায়িত্ব। কিন্তু রসুলবিরহের আগুন কখনো স্তিমিত হয় না। বরং দিন দিন প্রজ্বলতর হতে থাকে। পৃথিবীতে বেশীদিন বাস করা তাঁর জন্য হয়ে পড়ে অসম্ভব। আল্লাহ্পাক দয়া করেন। দুই বছর তিন মাস এগারো দিন পর অবসান ঘটান তাঁর বিরহযন্ত্রণার।

হজরত হাফসার পিতা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব হন পরবর্তী খলিফা। তিনি কখনো কখনো জনঅনুরোধে খলিফার দরবারে উপস্থিত হন। তুলে ধরেন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া। হজরত ওমর প্রিয়কন্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। কিন্তু কখনো তাঁর পরামর্শ মেনে নেন। কখনো নেন না।

একবার হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়ের এই মর্মে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন যে, খলিফার জন্য নির্ধারিত ভাতা নিতান্তই অপ্রতুল। সুতরাং ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাঁরা বিষয়টি খলিফার দরবারে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সাহস পেলেন না। শেষে জননী হাফসার দ্বারস্থ হলেন। তিনি সুযোগ বুঝে কথাটা খলিফাকে বললেন। খলিফা বললেন, মা। তুমি মনে হয় আল্লাহ্র রসুলের অভাব-অনটন ভরা জীবনের কথা ভুলে গিয়েছো। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো তাঁকেই অনুসরণ করবো, যেনো পরবর্তী পৃথিবীতে শান্তি লাভ করতে পারি। একথা বলে তিনি কাঁদলেন। কাঁদলেন জননী হাফসাও।

আরব, ইরান ও রোমের অধিপতি খলিফাতুল মুসলিমীন হজরত ওমর দুনিয়ার প্রতি ছিলেন অতিমাত্রায় অনাসক্ত। মূল্যবান ও মিহি বস্ত্র তাঁর পরনে দেখা যেতোই না। ১০/১২টা করে তালি থাকতো জামায়। পাগড়িটি ছিলো ছেঁড়া। পায়ের জুতা ছেঁড়া ও তালিযুক্ত। এরকম বেশভূষা নিয়ে তিনি রাজকীয় দূতদের সাক্ষাত দান করতেন। মুসলমানগণ সংকোচবোধ করতেন। কিন্তু তিনি থাকতেন ভ্রূক্ষেপহীন।

একবার তিনি জামায় তালি লাগাচ্ছিলেন, হজরত হাফসা এসে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, হাফসা! মুসলমানদের অর্থ আমি এর অধিক ব্যয় করতে পারি না।

খলিফা নিজেকে অতি কঠোরতার মধ্যে নিপতিত রেখেছেন— হজরত আয়েশা সিদ্দীকারও এরকম মনে হতো। হজরত হাফসা একদিন তাঁকে নিয়ে হাজির হলেন খলিফাতুল মুসলিমীনের দরবারে। দুজনে মিলে বললেন, আমিরুল মু'মিনিন! আল্লাহ্ আপনাকে সম্মান দান করেছেন। রাজদূতগণ আপনার কাছে আসা-যাওয়া করছেন। এখন আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়াই সমীচীন। খলিফা বললেন, আফসোস! তোমরা আল্লাহ্র রসুলের জীবনসঙ্গিনী হয়েও আমাকে ভোগ-বিলাসের প্রতি উৎসাহিত করছো। হে আয়েশা! তুমি কি সেদিনের কথা ভুলে গিয়েছো, যখন রসুলুল্লাহ্র ঘরে একখানা মাত্র কাপড় থাকতো। তিনি দিনে তা বিছিয়ে রাখতেন এবং রাতে সেটাই গায়ে দিতেন। আর হাফসা! তোমার কি ওই দিনের কথা স্মরণ নেই, যেদিন তুমি রসুলুল্লাহ্র বিছানা দুই পরতে ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলে। ভোরে শয্যাত্যাগ করে তিনি স. বলেছিলেন, হাফসা! একি করেছো তুমি! দুই ভাঁজ করে বিছানা পেতেছো। আর আমি সারারাত নরম বিছানায় শুয়ে কাটালাম। আলস্য আমাকে আরামপ্রিয় করে ফেললো। দুনিয়ার সঙ্গে আমার কীই বা সম্পর্ক?

ইসলামী রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়েই চলেছে। হিজরী ২৩ সালে মুসলমানদের অধিকারভূত হলো কিরমান, সিজিস্তান, মাকরান এবং ইসপাহান। এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো মিসর থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত। প্রায়শঃই গনিমত হিসেবে আসতে লাগলো অনেক অর্থ-সম্পদ। একদিন হজরত হাফসা এসে বললেন, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আল্লাহ্ নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করেছেন। এ সকল সম্পদে আপনার নিকটাত্মীয়দেরও অধিকার আছে। খলিফা বললেন, নিকটাত্মীয়দের অধিকার আছে আমার সম্পদে! আরে, এসকল সম্পদ তো মুসলমানদের। হাফসা! তুমি তোমার পিতাকে কি ধোঁকায় ফেলতে চাও? যাও। চলে যাও এখান থেকে। হজরত হাফসা চাদরের আঁচল টানতে টানতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন।

নতুন নতুন অভিযানের জন্য এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্য বহু দূরের এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে হতো। এতে করে কোনো কোনো পরিবার হয়ে পড়তো অভিভাবকহীন। খলিফা হজরত ওমর তাঁদের খোঁজখবর নেন। এমনকি কারো কারো প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে এনে দেন বাজার থেকে। সৈন্যদের চিঠিপত্র এলে নিজে ঘুরে ঘুরে বিলি করেন। কোনো গৃহের লোক পড়তে না পারলে তিনি নিজেই তাদের দরজার চৌকাঠে বসে চিঠি পড়ে শোনান। জবাব লিখে দেন।

নগরীর নৈশপ্রহরী হন নিজে। কারো কোনো কষ্ট আছে কিনা, তা ঘুরে ফিরে স্বচক্ষে দেখেন। স্বকর্ণে শোনেন। চেষ্টা করেন সেগুলোর যথাপ্রতিবিধান করতে। এক রাতে তিনি একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠের করুণ সুরের একটি বিরহসঙ্গীত। দয়িতের মিলনাকাঙ্ক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকা চিরন্তন রমণীসত্তার বিধুর বিলাপ—

আহা! সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত এই রজনী কেবল
অন্ধকার। কেবলই তমসা। একা জেগে আছি।
সাথীহীন। প্রিয়তম নেই। আলাপন হবে কার সাথে?
হে অতুলনীয় আল্লাহ্! তোমাকে ভয় করি।
নয়তো এখনো কি অকম্পিত থাকতো শয্যাপার্শ্ব?

খলিফার অন্তর বিগলিত হলো। তিনি গৃহদ্বারে করাঘাত করলেন। সালাম দিলেন। সালামের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে জানতে চাওয়া হলো পরিচয়। খলিফা পরিচয় দিলেন। দরজা খুলে গেলো। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? নারীকণ্ঠ বললো, হে বিশ্বাসীগণের নেতা! বহুদিন ধরে আমার স্বামী সেনাবাহিনীতে আছে। তাঁকে আমি কাছে পেতে চাই।

পরদিনই হজরত ওমর কন্যা হাফসার সঙ্গে দেখা করলেন। ঠিক করলেন, হাফসার মন্তব্য শুনে তিনি একটা বিধান প্রবর্তন করবেন, যাতে সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবার-পরিজন কষ্ট না পায়। জিজ্ঞেস করলেন, কন্যা আমার! লজ্জা কোরো না। একটি প্রশ্নের জবাব আমি তোমার কাছে চাই। বলো তো, স্বামীসঙ্গ বিচ্যুতারা কতোদিন পরে স্বামী-মিলনের জন্য আকুল হয়? হজরত হাফসা লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। খলিফা বললেন, আল্লাহ্ সত্যপ্রকাশের ব্যাপারে লজ্জিত হন না। হজরত হাফসা মুখে কিছু বললেন না। ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, চারমাস। কথাশুনে খলিফা রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে দিলেন— কোনো সৈন্যকে কোথাও চার মাসের অধিক যেনো আটকে রাখা না হয়।

হজরত হাফসা সবধরনের মতোবিরোধকে অপছন্দ করতেন। উটের যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের কোনো দিকেই তিনি ছিলেন না। সকলের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করাই ছিলো তাঁর স্বভাব। তিনি যে সকল বিশ্বাসবানগণের জননী— একথা তিনি কখনোই ভুলতেন না। সিফ্ফীন যুদ্ধের সময়ও তিনি এমনই করলেন। সৎপরামর্শ দান করলেন সকলকে। ছোট ভাই হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে বললেন, তোমার উচিত জুমাতুল জান্দালে সালিশ ফয়সালার অধিবেশনে যোগদান করা। এতে তোমার কোনো লাভ নেই ঠিক, কিন্তু জনগণ উপকৃত হবে। তারা তোমার

মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমন হতে পারে, তোমার অনুপস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে নতুন বিরোধ। তুমি হচ্ছো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের শ্যালক। আবার দ্বিতীয় খলিফার পুত্র।

জননী হজরত হাফসার মনে দাজ্জালভীতি ছিলো প্রবল। মহানবী স. দাজ্জালের যে সকল আলামত বর্ণনা করতেন, মদীনার ইবনে সাইয়্যাদ নামক এক ব্যক্তির মধ্যে ছিলো তার কিছুসংখ্যক আলামত। একদিন তিনি তাঁর ছোটভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখা হলো ওই লোকটির সঙ্গে। হজরত আবদুল্লাহ্ তাকে কিছু একটা বলতেই সে ক্ষেপে গেলো খুব। পথরোধ করে দাঁড়ালো। হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁকে মারতে উদ্যত হলেন। হজরত হাফসা ভীত হলেন। বললেন, ছেড়ে দাও ওকে। তুমি কি জানো না, রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, ক্রোধই হবে দাজ্জাল বের হবার কারণ।

হজরত হাফসার ফযীলত অনেক। তাঁর শ্রেষ্ঠমহিমা এই যে, তিনি নবীপ্রিয়া, তাঁর জীবনসঙ্গিনী। পৃথিবীতে যেমন, তেমনি জান্নাতেও। বিশ্বাসীগণের যথার্থ জননী— এটাও তাঁর অনন্যসাধারণ মর্যাদা। এ মর্যাদা তাঁকে আল্লাহ্পাকই দিয়েছেন। জিব্রাইল আমিনের মাধ্যমে প্রশংসা করেছেন তাঁর— হাফসা খুব বেশী রোজা পালন করেন। আর নামাজ পড়েন রাত জেগে জেগে।

ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কোরআনে হাফেজ সাহাবী শহীদ হন। সাহাবীগণ কোরআন সংরক্ষণের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্বিগ্ন হন হজরত ওমর। তিনি তখনকার খলিফা হজরত আবু বকরকে আল কোরআনের লিপিবদ্ধ রূপ সংরক্ষণের জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত যায়েদ রা. আরবের স্বনামধন্য ক্বারী ও হাফেজদের সঙ্গে নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে পবিত্র কোরআনের পাণ্ডলিপি প্রস্তুত করেন। ওই পাণ্ডলিপিখানা খলিফা হজরত আবু বকরের হেফাজতে থাকে। পরে হেফাজতকারী হন খলিফা হজরত ওমর। তারপর হজরত হাফসা। সুতরাং কোরআন সংরক্ষণকারিণী হিসেবেও তাঁর রয়েছে এক অতুলনীয় মর্যাদা।



মানুষের আয়ু কমতে থাকে। বাড়তে থাকে বয়স। মহাকালের দুর্নিরীক্ষ্য বিলীয়মানতায় হারিয়ে যায় বিবর্তনময় দিবস-রজনী, মাস, বছর। বছরের পর বছর। সকলকেই হতে হয় অমোঘ মৃত্যুর মুখোমুখি। পাপিষ্ঠরা আতঙ্কিত হয়। চেষ্টা করে ব্যর্থ পলায়নের। পারে না। আর পুণ্যবানেরা হয় প্রীত। হয় প্রিয়তম প্রভুপালকের মিলনের জন্য অধীর। তিনি ছোট ভাই আবদুল্লাহ্‌কে অসিয়ত করলেন, গাবাতে তাঁর যে ভূখণ্ডটুকু আছে, তা যেনো আল্লাহ্‌র পথে ওয়াকফ করা হয়।

মহাপুণ্যবতী উম্মতজননী হজরত হাফসা প্রস্তুত হলেন। ৪৫ হিজরীর শাবান মাস। তাঁর বয়স ৬৩ পূর্ণ হলো। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন তিনি। ইন্‌না লিলাহি ওয়া ইন্‌না ইলাইহি রজিঊন।

তখন চলেছে আমীর মুয়াবিয়া রা. এর শাসনকাল। মুসলমানদের গৃহবিবাদের অবসান ঘটিয়েছেন রসুলদৌহিত্র জান্নাতের যুবকদের অগ্রনায়ক হজরত ইমাম হাসান রা.। কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার্থে আমিরুল মুমিনীন বলে মেনে নিয়েছেন হজরত মুয়াবিয়া রা.কে।

মদীনার প্রশাসক তখন মারওয়ান। তিনি জানাজার নামাজ পড়ালেন। খাটিয়া বহন করলেন আলে হাযামের বাড়ীর কাছ থেকে হজরত মুগিরার বাড়ী পর্যন্ত। সেখান থেকে তাঁর কাঁধ থেকে নিজের কাঁধে খাটিয়া তুলে নেন হজরত আবু হোরায়রা রা.। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে কবরে নামালেন ছোটভাই হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর এবং তাঁর ছেলেরা— আসেম, সালেম, আবদুল্লাহ্‌ ও হামযা।

হজরত যয়নব বিনতে খুজাইমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা



বদরযুদ্ধে মুশরিকবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিলো। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো তারা। পরের বছর অনেক সৈন্য ও রণসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলো মদীনার উপকণ্ঠে— উহুদ প্রান্তরে।

মুসলিমবাহিনীও প্রস্তুত হলো। মহানবী স. ভাষণ দিলেন— হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে ওই সকল বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যেসকল নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর কিতাবে। সেগুলো হচ্ছে— তাঁর নির্দেশাবলী এবং নিষেধাজ্ঞা-সমূহকে মেনে চলবে। তোমরা আজ এক মহাপুরস্কারপ্রাপ্তির স্মরণযোগ্যক্ষণে দণ্ডায়মান। তোমরা ধৈর্যশীল, প্রত্যয়ী, শ্রমতৎপর ও উদ্যমী হও। কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। যারা শুভপথে অবিচলিত, তারা ছাড়া অন্যেরা রণক্ষেত্রে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন, যারা তাঁর অনুগত। আর যারা অবাধ্য, তাদের সাথে রয়েছে শয়তান। অতএব, জেহাদে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তোমরা সাফল্যাভিলাষী হও। হও সাহায্য ও বিজয়ের অঙ্গীকারানুকূল। আমার নির্দেশ মেনে চলো। আমি তোমাদের সুপথকামী। মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব ও পলায়নপরতা হচ্ছে এক ধরনের দুর্বলতা। আল্লাহ্ এগুলো পছন্দ করেন না। এধরনের অপস্বভাববিশিষ্টদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করেন না। হে জনতা! আমার হৃদয়ে এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি পুণ্যলাভের প্রত্যাশায় কোনো হারাম কাজকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান বা অমুসলমানের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, সে প্রতিদান পায় দুনিয়ায় ও আখেরাতে। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকল প্রশংসা তাঁর।

সাহাবীগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। শাহাদত কামনাই সকলের ইচ্ছা। সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ছিলেন মহানবী স. এর ফুফাতো ভাই। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে চললেন রণপ্রান্ত রে। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক আল্লাহ্! আমাকে রণনিপুণ কোনো কাফেরের সম্মুখীন করে দিয়ো। আমি যেনো তার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই। আর সে যেনো কর্তন করে আমার ওষ্ঠ, নাসিকা ও কর্ণ।

এরকম অবস্থায় তোমার সাথে মিলিত হতে চাই। তুমি বলবে, হে আবদুল্লাহ্! তোমার ওষ্ঠ, নাসিকা ও কর্ণ কর্তিত কেনো? আমি বলবো, তোমার এবং তোমার রসুলের জন্য।

যুদ্ধ করতে করতে মহানবী স. এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযা শহীদ হলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন। ভেঙে গেলো তাঁর তলোয়ার। মহানবী স. তৎক্ষণাৎ একটি শুকনো খেজুরের ডাল এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। বললেন, যুদ্ধ করো। শুকনো ডালটি মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ তরবারীতে পরিণত হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ যুদ্ধ করতে করতে শত্রুনিধন করতে লাগলেন। শেষে প্রকাশ পেলো তাঁর প্রার্থনার ফল। শহীদ হলেন তিনি। শত্রুরা তাঁর নাক কান কেটে ফেললো।

সত্তর জন শহীদ হলেন। সত্তরটি পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে পড়লো। মহানবী স. শহীদদের জন্য অনেক কাঁদলেন। দোয়াও করলেন। জীবন তো থেমে থাকে না। এগিয়েই চলে। শোক-দুঃখ সরে যায়। জেগে ওঠে প্রয়োজন। ভাঙা জীবনকে জোড়া লাগাতে হয় আবার।

মহানবী স. সাহাবীগণকে বিধবাবিবাহের জন্য উৎসাহিত করেন। অভিভাবক হতে বলেন এতিম শিশুদের। তিনি স. নিজেও অংশগ্রহণ করেন শুভপরিণয়ের পরিকল্পনায়। বিবাহ করেন শহীদ আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের বিধবা স্ত্রী হজরত যয়নবকে। মোহরানা হিসেবে দেন চার শত দিরহাম। বিবাহের মধ্যস্থতা করেন কুবায়সা ইবনে আমর আল হিলালী।

তাঁর পূর্ণ নাম যয়নাব বিনতে খুযাইমা আল হিলালিয়া। মায়ের নাম হিন্দ বিনতে আউফ। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় বোন। মহানবী স. হজরত মায়মুনাকে বিবাহ করেন অনেক পরে।

খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি পিতৃ-মাতৃহারা শিশুদের এবং দরিদ্র-মিসকিনদেরকে ভালোবাসতেন। তাঁর পিতা-পিতামহরা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁদের কাছ থেকে তিনি হাত খরচের অর্থ হিসাবে যা পেতেন, তা-ই দিয়ে আদর করে ডেকে খাওয়াতেন তাদেরকে। একারণে তাঁকে সবাই ডাকতো 'দরিদ্রদের জননী' বলে।

ইবনে হিশাম বলেছেন, গরীব মিসকিনদের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত দয়ামমতা ছিলো বলে তাঁকে বলা হতো উম্মুল মাসাকীন (মিসকিনদের মা)। হাফেজ ইবনে হাজর বলেছেন, তিনি বিত্তহীনদের আহার যোগাতেন, তাদেরকে দান-খয়রাত করতেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিলো 'উম্মুল মাসাকীন'। আর আবদিল বার এবং বালাজুরী বলেছেন, জাহেলী যুগেই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো। অনেক সময় এমনও ঘটেছে যে, তিনি খেতে বসেছেন। এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। আর তিনি নিজের খাবার তুলে দিয়েছেন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মুখে।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন বাল্যবেলাতেই। মহানবী স. যখন তাঁকে বিয়ে করে ঘরে আনেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ। আর রসুলুল্লাহ্‌র বয়স ছাপ্পান্ন।

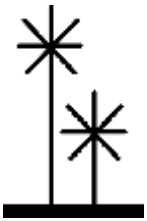


জীবন কখনো হয় সংকুচিত। কখনো প্রসারিত। সবই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ভূত। মহাপূণ্যবতী মুমিনজননী হয়ে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের সংসারে এলেন। কিন্তু দুনিয়া-আখেরাতের মহাসৌভাগ্যের জ্যোতির্ময়তার কেন্দ্রে তাঁর অবস্থানকে দীর্ঘতর করতে পারলেন না। মাত্র তিন মাস পরেই সাড়া দিলেন পরম প্রেমময় প্রভুপালকের আহবানে।

মাত্র তিরিশ বছরের জীবন। কিন্তু তিনি অসফল নন। কারণ তিনি এর মধ্যেই অর্জন করেন মহানবী স. এর গভীর ভালোবাসা, হন নবীপ্রেয়সী। আরো অধিকার করে নেন 'বিশ্বাসীদের জননী' হবার অক্ষয় মহিমা।

উম্মতজননী হজরত খাদিজার মতোই তিনি মহানবী স. এর পৃথিবীবাসের সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মহানবী স. নিজে এই দুজন উম্মত জননীর কাফন-দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে দুটি দিক থেকে তিনি অনন্য— ১. এত কম বয়সে পরলোকগমনকারিণী নবীজায়া কেবল তিনিই। ২. কেবল তিনিই পেয়েছেন মহানবী স. এর ইমামতশোভিত নামাজে জানাযা।

হজরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সদানুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের অনুগমন করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে। এটা মহাসাফল্য।'

ইসলাম-সূর্যের প্রথম আলোয় যাঁরা অবগাহন করে মহাসাফল্য লাভের শুভসংবাদ পেয়েছেন, আবু সালমা ও উম্মে সালমা দম্পতি তাঁদের অন্যতম। মহানবী স. এর নিকটাত্মীয় ছিলেন তাঁরা। তদুপরি আবু সালমা ছিলেন মহানবী স. এর দুধভাই।

মুমিনজননী উম্মে সালমার আসল নাম হিন্দা। তাঁর পিতার নাম আবু উমাইয়া ইবনে আল মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আল মাখযুম। তাঁর আসল নাম হুজায়ফা হলেও সকলে তাঁকে আবু উমাইয়া বলতো। দানশীল ও অতিথি আপ্যায়ক হিসেবে খ্যাতি ছিলো তাঁর। উপাধি ছিলো 'যাদুর রবক' (কাফেলার পাথেয়)। কোথাও সফর করলে কাফেলার খাওয়া- দাওয়াসহ সকল কিছু তিনি নিজ দায়িত্বভূত করে নিতেন। সে কারণেই জনতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভালোবাসার উপাধিটি।

আবু জেহেলের পিতা হিশাম, হজরত ওমর রা. এর নানা হাশিম, খালেদ ইবনে ওলিদের পিতা ওলিদ ইবনে মুগিরা, আবু হুজায়ফা মাখযুমী, আবু রবিয়া, ফাকিহা, হিন্দা বিনতে উতবার প্রথম স্বামী হাযাম, আবদুস্ শামস— এরা সকলেই ছিলেন মুগীরা আল মাখযুমীর ছেলে। আবু উমাইয়ার ভাই— সেই হিসেবে জননী উম্মে সালমার চাচা। আর হজরত আমর ইবনে আসের মা উম্মে হারমালা বিনতে হিশাম এবং হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর মা খানতামা বিনতে হাশেম ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন।

জননী উম্মে সালমার মায়ের নাম আতিকা বিনতে আমের ইবনে রবিয়া ইবনে মালেক আল কিনানিয়্যা।

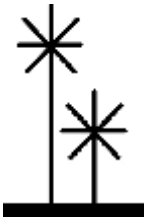
তাঁর প্রথম স্বামী আবু সালমার আসল নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আসাদ আল মাখযুমী। তাঁর পিতা এবং উম্মতজননী উম্মে সালমার পিতা দুই ভাই। আবার আবু সালমার পিতা আবদুল আসাদ ছিলেন মহানবী স. এর ফুফা। ফুফু বুররাকে বিয়ে করেন তিনি। এই হিসেবে আবু সালমা মহানবী স. এর ফুফাত ভাই হন। আর হজরত আবু তালেব, হজরত হামযা ও হজরত আব্বাস হন জননী উম্মে সালমার মামা।

আবু সালমা ও উম্মে সালমা বনী মাখযুম গোত্রের লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকেন। তাদের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা সইতে না পেরে তারা এক পর্যায়ে হজরত আবু তালেবের আশ্রয়ে চলে আসতে বাধ্য হন। বনী মাখযুমের লোকেরা বললো, মান্যবর আবু তালেব! এতোদিন ধরে আপনার ভাতিজাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছেন। এখন আবার আমাদের ভাইয়ের ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের গোত্রের ছেলেকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন। হজরত আবু তালেব বললেন, দু'জন তো একই রকম বিপদগ্রস্ত।

কাফের কুরায়েশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চললো। নবমুসলিমদের মক্কায় বসবাস করা দুষ্কর হয়ে পড়লো। মহানবী স. জুলুম-অত্যাচার রোধ করতে পারলেন না। সহ্যও করতে পারলেন না। হিজরতের নির্দেশ দিলেন। একদল অত্যাচারিত মুসলমান হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। ইবনে ইসহাক মন্তব্য করেছেন, আবু সালমাই সর্বপ্রথম সস্ত্রীক আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন।

কিছুদিন পর প্রথম হিজরতকারী দল একটি ভুল সংবাদ শুনে মক্কায় ফিরে আসেন। দ্বিতীয় বার আবিসিনিয়ায় ফিরে যান আরো অনেক মজলুম সাহাবীকে নিয়ে। আবু সালমা এবং উম্মে সালমাও এভাবে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন দুই বার। সেখানে তাঁদের ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা তাঁর নাম রাখেন সালমা। তাঁর নামের সূত্রেই মানুষ তাঁদেরকে আবু সালমা ও উম্মে সালমা বলে ডাকতে থাকে। আসল নাম চলে যায় ইতিহাসের নেপথ্য অধ্যায়ে।

সালমা একটু বড় হলে তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় তখন মুসলিম জনতার অবস্থা আরো অধিক শোচনীয়। মহানবী স. তাঁদেরকে পুনঃনির্দেশ দান করেন, অবিলম্বে হিজরত করতে হবে। এবার মদীনায়।



হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। তাঁর রসুল সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন কেবল। প্রত্যাদেশ আকারে একথা জানানো হয়েছে এভাবে 'যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করলো, নিশ্চয়ই সে আনুগত্য করলো আল্লাহ্র।' প্রত্যেক সাহাবী একথা জানতেন, বিশ্বাস করতেন এবং এর উপর আমলও করতেন। তাই সাহাবীগণ যিনি যখন নির্দেশ পেলেন, তখনই যেতে শুরু করলেন নতুন হিজরতভূমি ইয়াসরেবের দিকে, পরে যার নাম হয় মদীনাতুন্ নবী— নবীর শহর, সংক্ষেপে মদীনা।

কীভাবে যাত্রা করলেন, তার বিবরণ হজরত উম্মে সালমা নিজেই দিয়েছেন এভাবে— আবু সালমা মদীনা যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করলেন। একটি মাত্র উট ছিলো তাঁর। ওই উটের উপরে তিনি আমাকে ও আমাদের শিশু সন্তান সালমাকে ওঠালেন। আর নিজে উটের লাগাম ধরে চলতে শুরু করলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলো আমার পিতৃকুল বনী মুগিরার লোকজন। তারা আবু সালমার পথরোধ করে দাঁড়ালো। বললো, আমাদের মেয়েকে আমরা এরকম অসহায় অবস্থায় ছাড়বো না। এই বলে তারা আবু সালমার হাত থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নিলো। আমাকে ও সালমাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। ইতোমধ্যে এসে পড়লো আবু সালমার বংশের লোকেরা। তারা আমার কাছ থেকে সালমাকে ছিনিয়ে নিলো। তারা বনী মুগিরার লোকদেরকে বললো, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও, তবে আমরাও আমাদের সন্তানকে তোমাদের মেয়ের কাছে থাকতে দেবো না। এভাবে আমরা তিন জন তিন দিকে ছিটকে পড়লাম। আবু সালমা মদীনার পথ ধরলো। সালমাকে নিয়ে গেলো তার বাপের গোষ্ঠীর লোকেরা। আর আমি আটকা পড়লাম পিতৃগৃহে। শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়লাম। ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম আবতাহ্ উপত্যকার একটি টিলার উপরে বসে। সাত আট দিন গত হয়ে গেলো এভাবে।

বনী মুগিরার এক লোক একদিন আমার দুরবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্রচিত্ত ও আমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। তিনি গোত্রের লোকদেরকে একত্র করে বললেন, আপনারা এই অবস্থায় মেয়েটিকে কেনো কষ্ট দিচ্ছেন? কী অপরাধ তার? তাকে তার স্বামী সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে দিচ্ছেন না কেনো? অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিন। প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হতে দিন।

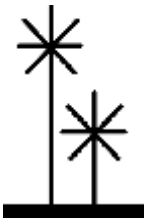
লোকটির কথা ছিলো অকৃত্রিম মমতা ও আবেগে ভরপুর। তার কথা শুনে আমার পিতৃগোত্রের লোকদের অন্তরে দয়া ও করুণার উদ্রেক হলো। তারা আমাকে যথা ইচ্ছা তথা গমনের অনুমতি দিয়ে দিলো। এ সংবাদ শুনে সালমাকে তার পিতৃগোত্রের লোকেরা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো। আমি আবার আমার সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে উটের পিঠে উঠলাম। যাত্রা করলাম মদীনা অভিমুখে। তানযীম নামক স্থানে পৌঁছতেই দেখা হয়ে গেলো কাবাগৃহের চাবিরক্ষক ওসমান ইবনে তালহার সঙ্গে। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলেন। আরো জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে কে যাবে? আমি বললাম, আর কেউ নেই। আমি ও আমার শিশুপুত্র। একথা শুনেই তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন। পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক হয়ে পথ চলতে লাগলেন মদীনা অভিমুখে।

আল্লাহ্ জানেন, আমি সমগ্র আরবে তালহার মতো ভদ্র ও সজ্জন আর কাউকে দেখিনি। যখন কোনো মনজিল (বিরতিস্থল) উপস্থিত হতো এবং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হতো, তিনি উটকে থামাতেন। বসিয়ে দিতেন। চলে যেতেন দূরে কোনো গাছের আড়ালে। বিশ্রাম শেষে তিনি ফিরে এসে উটকে প্রস্তুত করতেন। বলতেন, উঠে বসো। আমরা উটের উপরে আরাম করে বসবার পর তিনি উটের রশি ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন।

দীর্ঘ পথযাত্রার অবসান হলো। আমরা মদীনার সন্নিকটবর্তী বনী আমর ইবনে আউফের কোবা মহল্লায় পৌঁছলাম। ওসমান ইবনে তালহা বললেন, আবু সালমা এখানেই থাকেন। একটু এগিয়ে যেতেই তাঁর দেখা পেয়ে পথশ্রান্তির কথা ভুলে গেলাম। ওসমান ইবনে তালহা ফিরে গেলেন মক্কায়।

হজরত ওসমান ইবনে তালহার এই সহৃদয়তা ও সহমর্মিতার কথা হজরত উম্মে সালমা সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। সকলের সামনে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতেন, আমি ওসমান ইবনে তালহার চেয়ে শরীফ সঙ্গী আর কোথাও দেখিনি। আবার হিজরতের কথা উঠলে তিনি একথাও বলতেন যে, ইসলামের জন্য আবু সালমার পরিবারকে যেরকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, আহলে বায়েতের আর কারো ক্ষেত্রে সেরকম ঘটেছে কিনা, তা আমার জানা নেই। 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথম অভিজাত রমণী, যিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

হজরত উম্মে সালমার পিতা ছিলেন সুবিখ্যাত। কিন্তু কোবা পল্লীর অনেকে তাঁর পিতৃপরিচয় জেনেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতো। বিশ্বাস করতে চাইতো না। ভাবতো, এতো বিখ্যাত লোকের মেয়ে এরকম অসহায়ভাবে কোথাও যাত্রা করে নাকি। হজরত উম্মে সালমা ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। তাই তিনি তাদের সন্দেহ দূর করার কোনো চেষ্টা করলেন না। মদীনায় দিন গুজরান হতে লাগলো এভাবেই। এর মধ্যে এসে পড়লো হজ্বের মওসুম। কোবা থেকে কেউ কেউ হজ্বে গেলো। তাদেরকে তিনি মক্কায় পিতার সাক্ষাতে যেতে বলে দিলেন। তারা ফিরে এসে সবাইকে জানালো, তিনি ঠিকই বলেছেন। প্রকৃতই তিনি মহানুভব আবু উমাইয়ার কন্যা।



হিজরত ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং সাহাবীগণ যে যেভাবে পারলেন, একে একে অথবা ছোট ছোট দলে দলবদ্ধ হয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীককে সঙ্গে নিয়ে এক সময় মহানবী স.ও মদীনায় আগমন করলেন।

আল্লাহ্প্রেমের বিপুল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্মিত হলো মদীনা। মহানবী স. সাহাবীগণকে নিয়ে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করতে লাগলেন। ইবাদতই শান্তি। শান্তির মুক্ত আকাশে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো বিশ্বাসী জনতা।

মক্কার মুশরিকেরা নতুন পরিকল্পনা করলো। ঠিক করলো, যুদ্ধের মাধ্যমে উৎখাত করে দিতে হবে নতুন এই ধর্মমতকে। নয় তো পিতৃপুরুষদের ধর্ম রক্ষা করা যাবে না। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। আল্লাহ্পাক বিশ্বাসী জনতাকেও জেহাদের অনুমতি দিলেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জেহাদ সম্পন্ন হলো দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে। বদরপ্রান্তরে। মুশরিকদের প্রধান নেতারা নিহত হলো। বন্দী হলো অনেকে। মুসলিমবাহিনী পেলো বিপুল বিজয়। কিন্তু কাফের কুরায়েশেরা পরাজয় মেনে নিলো না কিছুতেই। প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলো পরের বছর শাওয়াল মাসে।

মহানবী স. জেহাদের নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণের ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব। সকলে পরামর্শক্রমে ঠিক করলেন, উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে মুশরিকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

হজরত আবু সালমাও যুদ্ধের পোশাক পরলেন। কটিদেশে বাঁধলেন কোষাবদ্ধ তরবারী। বিদায়ক্ষণে দু'জনে দুজনের দিকে তাকালেন। বোধ করি মনে পড়ে গেলো একদিনের একটি ঘটনার কথা— উম্মে সালমা বললেন, আমি শুনেছি, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি জান্নাতের উপযুক্ত হয়, এমতাবস্থায় একজন মরে গেলে অপর জন যদি পুনঃবিবাহ না করে, তবে জান্নাতে উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাসবাস করতে পারবে। এসো, আমরা দুজনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই, তুমি মারা গেলে আমি কাউকে বিয়ে করবো না, আর আমি মারা গেলে তুমিও কোথাও বিবাহবদ্ধ হবে না। আবু সালমা বললেন, একটা কথা বলি— মানবে? উম্মে সালমা বললেন, অবশ্যই। আবু সালমা বললেন, মনে হয় আমি আগে চলে যাবো। তারপর তুমি কিন্তু অবশ্যই বিবাহবদ্ধা হয়ো। আমি দোয়া করি আল্লাহ্পাক তোমাকে যেনো আমা অপেক্ষা উত্তম জীবনসঙ্গী দান করেন।

উহুদযুদ্ধে মুসলিমবাহিনী পর্যুদস্ত হলো। মহানবী স. স্বয়ং রক্তরঞ্জিত হলেন। শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযাসহ শহীদ হলেন সত্তরজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী। আবু সালমা শহীদ হলেন না। কিন্তু গভীরভাবে আহত হলেন। শত্রুবাহিনী থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো তাঁরই নামের এক মুশরিক— আবু সালামা হামবী। তীরটি বিদ্ধ হলো তাঁর বাহুমূলে। যুদ্ধ শেষে প্রায় এক মাস চিকিৎসার পর তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পর মহানবী স. তাঁকে কাতান অভিযানে পাঠালেন। সেখানে ২৯ দিন অবস্থানের পর যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন পুরনো ক্ষতস্থানটি আবার তাজা হয়ে উঠলো। নিরাময়ের দেখা আর পাওয়া গেলো না। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে তিনি মদীনায় আসেন, আর লোকান্তরিত হন জমাদিউস্ সানি মাসের নয় তারিখে।

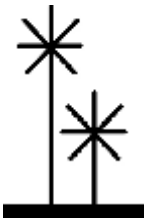
মদীনাবাসীদের সুখ-দুঃখের সাথী ও একমাত্র অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্র রসুল। শোকসংবাদ তাঁকেই জানাতে হবে আগে। উম্মে সালমা অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানালেন স্বামীর চিরবিদায়ের খবর। তারপর ফিরে গেলেন স্বগৃহে।

একটু পরে মহানবী স. স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেখানে। বিষাদভরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি স. শুনতে পেলেন, শোকাকুল উম্মে সালমা মাঝে মাঝে বিলাপধ্বনি উচ্চারণ করছেন, হায়! একি হলো! বিদেশ-বিভূঁয়ে এ তার কেমনতর চলে যাওয়া। তিনি স. তাঁকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিলেন। বললেন, তুমি তার

মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে থাকো। পাঠ করতে থাকো 'আল্লাহুম্মা আখলিফনি খয়রাম্ মিন্হা' (হে আল্লাহ্! আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করো)।

মহানবী স. হজরত আবু সালমার কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর চোখ দুটো খোলা। তিনি স. নিজ হাতে তাঁর চোখ বন্ধ করে দিলেন। মাগফিরাত কামনা করলেন।

জানাযা প্রস্তুত করা হলো। মহানবী স. নিজে ইমাম হয়ে জানাযার নামাজ পড়ালেন। চার বার তকবীর (আল্লাহু আকবার ধ্বনি) দিতে হয়। কিন্তু তিনি স. তকবীর দিলেন নয় বার। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ভুল হলো না তো? তিনি স. বললেন, এ লোক হাজার তকবীরের যোগ্য।



শুরু হলো শোকপর্ব। হজরত উম্মে সালমা শোক পালন করে চললেন। দুঃখ-বেদনা ও বিলাপ নিয়ে একে একে অতিক্রান্ত হতে লাগলো তাঁর জীবনের তিক্ততম দিবস-রজনীগুলো। সঙ্গে তিনটি এতিম সন্তান— সালমা, ওমর ও দুররা। আর একটি রয়েছে গর্ভে।

জীবন এরকমই। কোনোকিছুই থেমে থাকে না— না দুঃখ, না সুখ। আবার আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশে জীবনের বৈশিষ্ট্য ঘোষিত হয়েছে এভাবে— 'নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ, নিশ্চয়ই সুখ দুঃখের পরবর্তীতে।'

হজরত উম্মে সালমার শোকপালন পর্ব (ইদ্দত) শেষ হয়। কোলে আসে নতুন অতিথি। নাম রাখেন তার বারবাহ্। ধর্মের বিধান অনুসারে নতুন বিবাহের প্রস্তাব আসতে আর কোনো বাধা নেই। প্রথম প্রস্তাব এলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ থেকে। তাঁর অসহায়ত্ব ও অভিভাবকত্বহীনতা বিবেচনা করেই মূলতঃ তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি সুন্দরীও ছিলেন খুব। আবার ছিলেন শানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। পুণ্যবতী তো ছিলেনই। তিনি হজরত আবু বকরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

হজরত উম্মে সালমা নিজে বলেছেন, আমি তখন ভাবতাম, আবু সালমার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে। ভাবতাম আর রসুলুল্লাহ্র শিখিয়ে দেওয়া

দোয়াটি পাঠ করতাম। তাঁর নির্দেশানুসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতাম ধৈর্যের উপরে। এক সময় স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন।

বলাবাহুল্য মহানবী স. প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ্র নির্দেশে। জ্ঞানে, গুণে, ধর্মনিষ্ঠায় অতুলনীয় রমণীগণকে রসুলগৃহে সমবেত করাই ছিলো আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়। সুতরাং রসুলপ্রেমিকগণ একথা ভাবতে বাধ্য যে, এর মধ্যে রয়েছে সমাজ-সংসার কাল-মহাকালের প্রভূত কল্যাণ এবং পবিত্র প্রেমভালোবাসার অনুকরণীয় আদর্শ।

শুভপ্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথে হজরত উম্মে সালমা উচ্চারণ করলেন— 'মারহাবাম্ বি রসুলিল্লাহ্ (আল্লাহ্র রসুলকে স্বাগতম)। কিন্তু উত্থাপন করলেন কয়েকটি মৃদু আপত্তি— ১. আমার আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। ২. আমার বয়স বেশী। ৩. আমার সন্তান-সন্ততি বেশী। ৪. আমার কোনো ওলী (অভিভাবক) নেই। মহানবী স. তাঁর সকল আপত্তি মেনে নিলেন। বললেন, আমি দোয়া করবো, আল্লাহ্ যেনো তোমার মর্যাদাবোধের প্রখরতাকে কোমল করে দেন। আমার বয়স তো তোমার চেয়ে বেশী। আবু সালমার সন্তান-সন্ততি তো আমারই সন্তান-সন্ততি। আর যার ওলী নেই, তার ওলী হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি।

যথাসময়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। মহানবী স. তাঁর নবপরিণীতা বধূকে ওঠালেন পরলোকগতা উম্মতজননী হজরত যয়নাব বিনতে খুজাইমার ঘরে। নববধূ দেখলেন, ঘরে রয়েছে একজোড়া যাঁতা, দু'টি পানির মশক, চামড়ার শয্যা-আবরণী এবং খেজুরের ছালভরা একটি বালিশ। উল্লেখ্য, অন্য মুমিনজননীগণের ঘরের আসবাবপত্র ছিলো এরকমই।

বাসর ঘরে ঢুকেই নিজ হাতে রাতের খাবার তৈরী করলেন তিনি। একটি পাত্র থেকে কিছু যব বের করলেন। অন্য একটি পাত্র থেকে বের করলেন কিছু তেল। যবগুলো যাঁতায় পিষলেন। তারপর সেগুলোর আটায় তেল মিশিয়ে একরকম আহার্য প্রস্তুত করলেন। ওই আহার্যই হলো মহানবী স. ও তাঁর বাসর রজনীর আহার্য।

তাঁর সপত্নীগণের মধ্যে দেখা দিলো বিরূপ কৌতূহল। তাঁরা জানতেন, উম্মে সালমা অসামান্য রূপবতী। মহানবী স. তাঁর প্রতি অতি আসক্ত হয়ে পড়েন কিনা— এটাই ছিলো তাঁদের ভাবনার বিষয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তাঁর মনে হলো, লোকে যেরকম বলে, তার চেয়েও উম্মে সালমা বেশী সুন্দরী। তিনি হজরত হাফসাকে কথাটা বললেন। হজরত হাফসার মনে হলো, হজরত আয়েশা বুঝি বাড়িয়ে বলেছেন। তিনিও অনেকক্ষণ ধরে হজরত উম্মে সালমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর মনে হলো, হজরত আয়েশার মন্তব্যটি অযথার্থ নয়। ব্যস, এই

পর্যন্তই। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেলো। ঈর্ষার অসুন্দর দিকটির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কই যে নেই। মহানবী স. এর পবিত্র সহধর্মিণী তাঁরা। তাঁদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিসর যে নবীপ্রেমে ও আল্লাহ্‌প্রেমে সতত সমুজ্জ্বল। ঈর্ষার সৌন্দর্যের দিকটি সেখানে কখনো কখনো ভিন্ন রঙের আলো ফেলে মাত্র। তারপর হারিয়ে যায়, অথবা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় মহাবিশ্বের মহামমতার অপার পারাবারে।

হজরত উম্মে সালমা শুধু রূপসী নন, লজ্জাবতীও। এই নিয়ে প্রথম প্রথম কিছু সমস্যাও হলো। মহানবী স. তাঁর ঘরে এলে তিনি তাড়াতাড়ি কোলের শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। লজ্জায় অধোবদনা হয়ে থাকেন। মহানবী স.ও লজ্জিত হন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যান। কথাটা হজরত উম্মে সালমার দুধভাই হজরত আসমা ইবনে ইয়াসিরের কানে গেলো। তিনি অতুষ্ট হলেন। কোলের শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরপর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলো। অন্যান্য মুমিনজননীগণের মতো তিনিও চিরতরে হারিয়ে গেলেন আল্লাহ্‌র হাবীবের অনন্ত প্রেমসমুদ্রে।

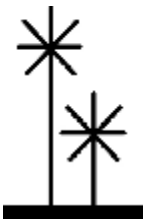
নবীর সংসার। এখানে আছে কেবল জ্ঞান, প্রেম ও বিশ্বাস। সত্যান্বেষী মানুষের জন্য পথ। পথনির্দেশ। পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বিত্ত-বৈভব এখানে সারাক্ষণ নতজানু হয়ে নবী ও নবী পরিবারের সেবার সুযোগ অন্বেষণ করে। কিন্তু সুযোগ পায় না। আল্লাহ্‌পাক বলেন, হে আমার প্রিয়তম নবী! তুমি যদি চাও, তবে উহুদ পাহাড়কে স্বর্ণপাহাড় বানিয়ে দেই, সে তোমার নির্দেশানুগত হয়ে তোমার সাথে সাথে থাকবে। আল্লাহ্‌র নবী বলেন, বান্দা আমি। বিশুদ্ধ বন্দেগীতেই আমি নিমগ্ন থাকতে চাই সারাক্ষণ। তুমি আমাকে একদিন আহার দিয়ো। আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। আর একদিন অনাহারে রেখো, সবর করবো।

মহানবী স. আল্লাহ্‌পাকের বিশুদ্ধ বান্দা ও রসুল। কীভাবে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ে পূর্ণসমর্পিত হয়ে বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা হতে হয়, সেই শিক্ষা তিনি দান করেন সকল জগতবাসীকে— কিতাব আবৃত্তি করেন, হিকমত শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন। সাহাবীগণ ও মুমিনজননীগণ সেই শাশ্বত শিক্ষারই ধারক, বাহক ও প্রচারক।

হজরত উম্মে সালমাও জ্ঞানান্বেষিণী। বিদ্যাবিনোদিনী। দেখা যায়, বিদ্যাবত্তার দিক থেকে তিনি অন্য উম্মতজননীদেরকে অতিক্রম করে চলেছেন। এভাবে সবাইকে অতিক্রম করে চলে এসেছেন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবতী হজরত আয়েশার প্রায় সমান্তরালে। তাঁকে নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন উম্মতজননীগণের একটি দল। অন্য দলটি অবশ্যই নবীপ্রিয়তমা আয়েশার।

হজরত আয়েশার ঘরে যখন মহানবী স. রাত্রিযাপন করেন, তখন মানুষ অনেক হাদিয়া তোহফা পাঠাতে থাকেন। নেত্রী হজরত উম্মে সালমাকে একদিন তাঁর দলের সপত্নীগণ বললেন, আমরাও আয়েশার মতো হাদিয়া তোহফা পেতে পারি— কথাটা মহানবী স. এর কাছে উপস্থাপন করতে হবে। হজরত উম্মে সালমার কাছেও কথাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। তিনি একদিন সুযোগ বুঝে কথাটা মহানবী স.কে পর পর দু'বার বললেন। তৃতীয়বার বলার পর উত্তর পেলেন এরকম— আয়েশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়ো না। সে-ই আমার এমন স্ত্রী, যার কম্বলের নিচে থাকা অবস্থায় আমার উপরে ওহী অবতীর্ণ হয়। হজরত উম্মে সালমা একথা শোনার সাথে সাথে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনাকে কষ্টদানের জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

অন্য উম্মতজননীগণের মতো তাঁর ঘরও ছিলো মসজিদসংলগ্ন। অন্যান্যদের মতো তিনিও মহানবী স. এর ভাষণ খুব মনোযোগ সহকারে শুনতেন। হজরত আয়েশার মতো সেগুলো স্মৃতিস্থও রাখতে পারতেন স্থায়ীভাবে। আবার প্রতিটি হাদিসের যথাযথ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণও দিতে পারতেন হজরত আয়েশার মতো। সব কাজ বাদ দিয়ে মহানবী স. এর বচনামৃত শোনার জন্যই তাঁর আগ্রহ ছিলো অধিক। যেমন একদিন দাসীকে দিয়ে মাথার চুলে বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। শুনতে পেলেন, মহানবী স. মসজিদের মিম্বরে উঠে ভাষণ দিতে শুরু করেছেন। যেমনি বললেন 'ওহে জনমণ্ডলী' অমনি তিনি দাসীকে বললেন, তাড়াতাড়ি করো। দাসী বললো, কেবল তো বললেন 'ওহে জনমণ্ডলী'! হজরত উম্মে সালমা বললেন, আমরা কি জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নই? একথা বলেই তিনি নিজের চুল নিজেই অতি দ্রুত বেঁধে নিয়ে ভাষণ শোনায় মনোনিবেশ করলেন।



চার সন্তানের জননী হয়েও হজরত উম্মে সালমা মহানবী স. এর সেবাযত্নের প্রতি সর্বক্ষণ রাখেন মমতাময় মনোযোগ। তাঁকে ভালোবাসেন নিজের জীবনের চেয়েও বেশী। সাফিনা নামের এক ক্রীতদাসকে তিনি মুক্ত করে দেন এই শর্তে যে, সে সারাজীবন মহানবী স. এর সেবা-যত্ন করে যাবে।

ভালোবাসার স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি মহানবী স. এর একটি পশম রেখে দিয়েছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ দুঃখ-কষ্টে পড়লে তিনি পবিত্র পশমখানি এক পেয়ালা পানিতে ডুবিয়ে দিতেন। আর ওই পানি তাঁদেরকে পান করতে দিতেন। এভাবে অনেকের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেতো। একজন বর্ণনাকারী বলেছেন, একবার আমি মাতা মহোদয়া উম্মে সালমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। তিনি হিন্না ও কাতানে রক্ষিত মহানবী স. এর একটি পশম বের করে দেখালেন।

তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। নিজের ছোট দুই মেয়েকেও লালন পালন করতেন অনেক মায়া-মমতা দিয়ে। মহানবী স.ও তাঁদেরকে অনেক আদর-যত্ন করতেন। একদিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কি আবু সালমার সন্তান-সন্ততিদেরকে লালন পালন করার কারণে পুণ্যাধিকারিণী হবো? তিনি স. বললেন, অবশ্যই।

বড় ছেলের নাম সালমা। জন্মগ্রহণ করেন আবিসিনিয়ায়। মহানবী স. তাঁকে তাঁর চাচা শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার কন্যা উসামার সাথে বিবাহ দেন। দ্বিতীয় ছেলে ওমর। মহানবী স. এর মহাতিরোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো নয় বছর। তাঁর ডাক নাম ছিলো আবু হাফস। তিনি কিছুসংখ্যক হাদিসের বর্ণনাকারী। হজরত আলী রা. এর খেলাফতকালে তাঁকে ফারেম ও বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করা হয়। মা তাঁকে উটের যুদ্ধের সময় হজরত আলীর সঙ্গে প্রেরণ করেন। বলেন, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে আপনার সঙ্গে পাঠালাম। সে সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবে। তারপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যা হবে, তাই হবে। রসুলুল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা না থাকলে আমিও বের হতাম, যেমন বের হয়েছে আয়েশা— তালহা ও যুবায়েরকে সাথে নিয়ে।

তৃতীয় সন্তানের নাম দুররা। এক বর্ণনায় আছে, একবার কে যেনো রটিয়ে দিলো মহানবী স. দুররাকে বিয়ে করতে চান। জননী উম্মে হাবীবা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! শুনলাম, আপনি দুররাকে বিয়ে করতে চান। তিনি স. জবাব দিলেন, তা কী করে হয়। আমি তাকে লালন পালন না করলেও সে আমার জন্য কোনোভাবেই হালাল নয়। সে তো আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।

তাঁর শেষ কন্যা সন্তানের নাম বাররা । মহানবী স. তাঁকে নতুন নাম দেন যয়নাব। উল্লেখ্য, জননী উম্মে সালমার এই চার সন্তানই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং লাভ করেন সাহাবী হওয়ার মর্যাদা।

অনাবিল সুখ ও আনন্দে ভরপুর ছিলো হজরত উম্মে সালমার দাম্পত্যজীবন। অভাব অনটন ছিলো। কিন্তু নবীপ্রেমের প্রখর জ্যোতির্ময়তার কারণে ওগুলোর

প্রভাব অনুভূত হতো না। কষ্ট পেতেন কেবল তখন, যখন অতিথি আপ্যায়নে সমর্থ হতেন না। যেমন একবারের ঘটনা— এক সফর থেকে ফিরে অভুক্ত ও পরিশ্রান্ত সাহাবী হজরত আল ইরবাদ, জু'আল ইবনে সুরাকা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল মহানবী স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হলেন। মহানবী স. হজরত উম্মে সালমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এদেরকে খেতে দেওয়ার মতো কিছু আছে কি? তিনি বিমর্ষ বদনে জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কিছুইতো নেই।

বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধেরও প্রকাশ ঘটতে থাকে। মহানবী স. অতুষ্টি প্রকাশ করেন না। বরং উপভোগ করেন। যেমন— উন্নত খোরপোশের দাবিতে যখন উম্মতজননীগণ একজোট, তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারূক তাঁদের কন্যাদ্বয়কে শাসন করেন খুব। হজরত ওমরের মা ছিলেন হজরত উম্মে সালমার চাচাতো বোন। হয়তো সেই অধিকারে তখন তিনি জননী উম্মে সালমাকেও কিছু বলতে আসেন। হজরত উম্মে সালমা তখন যথেষ্ট উষ্মার সাথে বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! কী আশ্চর্য! আপনি সব ব্যাপারে নাক গলান। এখন দেখছি রসুলুল্লাহ্র স্ত্রীদের ব্যাপারেও নাক গলাতে শুরু করেছেন। হজরত ওমর নির্বাক হয়ে গেলেন। এদিকে রাতের মধ্যে রটনা হয়ে গেলো, মহানবী স. তাঁর সকল সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করেছেন। অবস্থান গ্রহণ করেছেন পৃথক একটি প্রকোষ্ঠে। কারো সাথে দেখাও করছেন না। হজরত ওমর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রবেশাধিকার পেলেন। হজরত উম্মে সালমা তাঁকে কীভাবে শাসিয়েছেন, সে কথা বললেন। মহানবী স. তাঁর অভিযোগ শুনে হেসে ফেললেন।

খন্দক যুদ্ধ শুরু হলো। বিশাল মুশরিকবাহিনী এসে ঘিরে ফেললো মদীনা। অবরুদ্ধ মুসলিমবাহিনী গ্রহণ করলো আত্মরক্ষামূলক অবস্থান। অবরোধ হলো দীর্ঘ। দীর্ঘতর। ওই সময় হজরত উম্মে সালমা ছিলেন মহানবী স. এর অতি নিকটে। তিনি নিজে বলেছেন, ওই সময়ের কথা আমার এখনও মনে আছে। রসুলুল্লাহ্র পবিত্র বক্ষে ধূলোবালি লেগে আছে। তিনি স. তাঁর সাহাবীদের মাথায় পাথর উঠিয়ে দিচ্ছিলেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। অকস্মাৎ আম্মার ইবনে ইয়াসারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পতিত হলো। তিনি স. বললেন, হে সুমাইয়ার পুত্র! একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী তোমাকে হত্যা করবে।

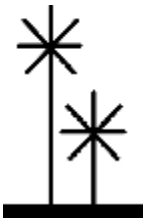
খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী স. এর উপরে বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ এলো। তিনি স. সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসঘাতক বনী কুরায়জার বসতি অবরোধ করলেন। তারা অবস্থান নিলো দুর্গের অভ্যন্তরে। ইহুদীদের মধ্যে যে বারোজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, হজরত আবু লুবাবা ছিলেন

তাঁদের অন্যতম। মহানবী স. তাঁকেই আলাপ-আলোচনা করার জন্য অবরুদ্ধ ইহুদীদের দুর্গের ভিতরে পাঠালেন। ইহুদীরা তাদের গোত্রের লোককে পেয়ে উৎফুল্ল হলো। আপনজন মনে করে তাঁর কাছে পরামর্শ কামনা করে বললো, আমরা এখন কী করবো? মোহাম্মদের আদেশে বের হয়ে আসবো? হজরত আবু লুবাবা নিজের গলায় তলোয়ার চালানোর মতো করে হাত চালালেন। এভাবে মুখে না বলে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, তাদের কণ্ঠচ্ছেদ করা হবে। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। আপন মনে বললেন, কী করলাম! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম। অনুতাপের আগুন প্রজ্জ্বলিত হলো তাঁর মনে। চরম অপরাধবোধের কারণে লজ্জায় মহানবী স. সকাশে উপস্থিত হতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। প্রাঙ্গণের একটি খুঁটির সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। পণ করলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর তওবা কবুল করার সংবাদ না জানানো পর্যন্ত তিনি মুক্ত হবেন না। জীবন যদি চলে যায়, তবুও।

মহানবী স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, আমার কাছে এলেইতো হতো। তওবা সহজ হতো। এখন আমাকে তো আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

অনুতাপে, অনাহারে, অবর্ণনীয় অন্তর্জ্বালায় কেটে গেলো ছয় সাত রাত। শেষ রাতে মহানবী স. আপন মনে হাসলেন। ছিলেন হজরত উম্মে সালমার ঘরে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ আপনাকে সদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। অনুগ্রহ করে বলুন, এখন হাসছেন কেনো? তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে। জননী বললেন, আমি এই শুভসংবাদটি কি তাকে শোনাতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে। জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর কক্ষদ্বারে দাঁড়ালেন। অদূরে আত্মবন্দী আবু লুবাবাকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু লুবাবা! তোমাকে অভিনন্দন! তোমার তওবা কবুল হয়েছে। ঘটনাটি পঞ্চম হিজরী সনের।

ওই বছরেই অবতীর্ণ হয় পর্দা সংক্রান্ত আয়াত। উম্মতজননীগণও হলেন পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হজরত উম্মে মাকতুম ছিলেন সম্মানিত মুয়াজ্জিন। দৃষ্টিশক্তি ছিলো না তাঁর। তিনি মহানবী স. এর অন্দরে যাতায়াত করতেন। সেদিন তিনি যখন রসুলগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজরত উম্মে সালমা ও হজরত উম্মে হাবীবা। মহানবী স. তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, পর্দা করো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! তিনি তো দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি স. বললেন, তোমরা তো দৃষ্টিশক্তিবিবর্জিত নও।



জীবন নদীতে জাগে কখনো জোয়ার। কখনো ভাটা। চলে আলো ও আঁধারের আবর্তন-বিবর্তন— দিবস-যামিনীর। নিয়মিত। নিরবধি। এভাবে প্রতিনিয়ত ভবিষ্যত হয়ে যায় অতীত। দেখা পাওয়া যায় না বর্তমানের। বর্তমান অর্থ চিরবর্তমান। কিন্তু তা তো এখানে নয়। ওখানে। পরবর্তী পৃথিবীতে। ওই চিরবর্তমান, চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণসাধনায় নিমজ্জিত থাকতে হয় বিশ্বাসবানদেরকে, বিশ্বাসবতীদেরকে।

হজরত উম্মে সালমার মনে প্রশ্ন জাগে, কোরআনুল করীমে তো দেখি পুরুষদের কথা আছে। নারীদের উল্লেখ নেই। কেনো? মহানবী স. বললেন, আছে। তারপর তিনি স. মসজিদে প্রবেশ করলেন। মিম্বরে উঠে আবৃত্তি করলেন— 'নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত-৩৫)

হজরত উম্মে সালমার সমগ্র জীবন কেটেছে সাধনায়, অনটনে এবং ভোগলিপ্সাবিমুক্ত অবস্থায়। মহানবী স. তাঁকে ভালোবাসতেন প্রধানতঃ একারণেই। তাঁর পুতঃপবিত্র স্বভাবের সঙ্গে ত্যাগ-তিতীক্ষার অলংকারত্ব ছিলো অধিক মানানসই। একদিন তিনি একটি সোনার হার গলায় পরে মহানবী স. এর সম্মুখে দাঁড়ালেন। মহানবী স. সেদিকে তাকালেন। কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন। হজরত উম্মে সালমা বুঝতে পারলেন, তিনি স. তেমন প্রসন্ন নন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হারটি খুলে ফেললেন।

ইবাদত উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্য সকল মুমিনজননীদের মতো ধর্মনিষ্ঠ। প্রতি মাসে রোজা রাখতেন তিনি— সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। ছিলেন দানশীলা। অন্যকেও উৎসাহিত করতেন দানশীলতার প্রতি। একবার

কয়েকজন যাচঞাকারী তাঁর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হলো। তাঁর কাছে উপবিষ্ট উম্মুল হুসাইন তাদেরকে ধমক দিলেন। জননী উম্মে সালমা বললেন, আমরা তো এরকম করতে পারি না। দাসীকে বললেন, এদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করো। অন্ততঃ একটি করে খেজুর তাদের হাতে দাও।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি মহানবী স.কে এমন একটি শুভপরামর্শ দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয়। হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহানবী স. মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। জননী উম্মে সালমাসহ অধিকাংশ সাহাবী ইহরাম বাঁধলেন জুহফায় গিয়ে। পুনরায় যাত্রা শুরু হলো। হুদাইবিয়া প্রান্তরে পৌঁছে থামতে হলো। মক্কার কাফেরেরা বললো, এ বছর হজ্ব করা যাবে না। ফিরে যেতে হবে। আরো কিছু শর্ত আরোপ করলো তারা, যেগুলো ছিলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। মহানবী স. তবুও কেবল রক্তপাত পরিহারের নিমিত্তে তাদের সন্ধিপ্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। লিপিবদ্ধ হলো সন্ধিচুক্তি। উভয় পক্ষের স্বাক্ষর সম্পন্ন হলে সাহাবীগণ খুবই মনোক্ষুণ্ন হলেন। মহানবী স. ঘোষণা দিলেন, গাত্রোত্থান করো। কোরবানী করো। মস্তক মুণ্ডন করো। সাহাবীগণ মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। নির্দেশ পালনের কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না তাঁদের মধ্যে। মহানবী স. দুঃখিত হলেন। তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে কথাটা জানালেন হজরত উম্মে সালমাকে। বললেন, মুসলমানেরা কি ধ্বংস হতে চায়? কোরবানী করতে বললাম। মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দিলাম। কিন্তু তাতে কেউ এগিয়ে এলো না। জননী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাঁদের আচরণে ব্যথিত হবেন না। ওমরা করতে না পেরে তারা মর্মাহত। আপনি দুঃখ পেয়েছেন বলেই তারা দুঃখ পাচ্ছে। উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে। আপনি বরং বাইরে যান। নিজেই কোরবানী শুরু করে দিন। কাউকে দিয়ে মস্তক মুণ্ডন করুন। মহানবী স. তাই করলেন। সাহাবীগণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোরবানী করলেন। একে অপরের সাহায্যে মুণ্ডিতমস্তক হলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বাহ্যতঃ অপমানকর মনে হলেও ওই চুক্তিটিই ছিলো মক্কা বিজয়ের কারণ। আল্লাহ্‌পাক একথা জানিয়েও দিলেন এভাবে— 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।' তা-ই হলো। পরের বছরই মহানবী স. তাঁর বিজয় অভিযান পরিচালনা করলেন মক্কা অভিমুখে। মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পৌঁছে থামলেন। তখনও তাঁর সফরসঙ্গিনী ছিলেন মুমিনজননী উম্মে সালমা। মক্কার কাফেরেরা ভীতসন্ত্রস্ত হলো। নিরাপত্তা প্রার্থনার আশা নিয়ে রাতের

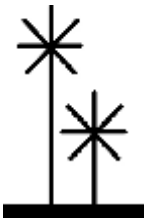
অন্ধকারে উপস্থিত হলো আবু সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া। হজরত উম্মে সালমা তখনও মহানবী স.কে শান্ত করার শুভউদ্দেশ্য নিয়ে পরামর্শ দিতে শুরু করলেন এভাবে— হে আল্লাহ্র রসুল! এরা দুজন তো আপনার নিকটজন। একজন আপনার পিতৃব্যপুত্র, আরেকজন আপনার ফুফুর ছেলে, আবার আপনার শ্যালকও। প্রকৃত ব্যাপার ছিলো তাই। আবু সুফিয়ান ছিলো মহানবী স. এর বড় চাচা হারিসের ছেলে। আর আবদুল্লাহ্ ছিলো তাঁর ফুফু আতিকার ছেলে— হজরত উম্মে সালমার আপন ভাই।

তায়েফ অভিযানের সময়েও মহানবী স. এর সঙ্গে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বিদায় হজ্বের সময়েও। তখন তাঁর শরীর সুস্থ না থাকলেও হজ্বের মতো একটি ফরজ আমল তিনি পরিত্যাগ করতে রাজী হননি। মহানবী স. তাওয়াফের সময় তাঁকে বলেন, উম্মে সালমা! যখন ফজরের নামাজের সময় এগিয়ে আসবে তখন উটের পিঠে উঠে তাওয়াফ সেরে নিয়ো। তিনি তাই করেছিলেন।

একদিন তিনি মহানবী স. এর পাশে বসেছিলেন। তখন সাহাবী দাহিয়া আল কলবীর আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন জিব্রাইল আমিন। কথাটা মহানবী স.ই তাঁকে জানালেন।

মহানবী স. একদিন তাঁর ঘরে থাকা অবস্থায় 'আয়াতে তাত্হীর' (পবিত্রতার আয়াত) অবতীর্ণ হলো। বলা হলো 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত ৩৩)। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী স. ডাক দিলেন আলী-ফাতেমা-হাসান-হোসেনকে। তাঁদেরকে কম্বলে ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বায়েত (পরিবার-পরিজন)। একথা শুনে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি কি আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত নই? তিনি স. বললেন, কেনো নও, ইনশাআল্লাহ্।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মহানবী স. কেবল তাঁকেই ইমাম হোসেনের শাহাদতের বিষয়ে ভবিষদ্বাণী শুনিয়েছিলেন।



মহানবী স. এর মহাযাত্রার সময় সন্নিকটবর্তী হলো। তাঁর সকল পবিত্র সহধর্মিণীর অনুমতিক্রমে তিনি স. অবস্থান গ্রহণ করলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে। সেখানেই সকলে উপস্থিত হতেন। পালাক্রমে সেবাযত্ন করতেন।

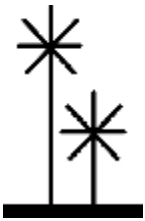
একদিন হজরত উম্মে সালমা ও হজরত উম্মে হাবীবা তাঁর পাশে বসে আবিসিনিয়ার আলাপ শুরু করলেন। দুজনেই ছিলেন আবিসিনিয়ার হিজরতকারিণী। তাঁরা বললেন, সেখানকার খ্রিস্টানেরা তাদের উপাসনালয়ে মানুষের মূর্তি রাখে। তাদের কোনো সাধুপুরুষ মারা গেলে তারা তার কবরকে উপাসনার স্থান বানিয়ে নেয়। তার মূর্তি স্থাপন করে উপাসনালয়ের ভিতরে। মহানবী স. বললেন, মহাবিচার দিবসে তারা উত্থিত হবে নিকৃষ্টতম অবস্থায়।

অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যেতে লাগলো। পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁকে দুধ পান করাতে চাইলেন। তিনি স. সম্মত হলেন না, কিন্তু যখন একটু অচেতন হয়ে পড়লেন, তখন হজরত উম্মে সালমা ও হজরত উম্মে হাবীবা তাঁর মুখে সামান্য পানি ঢেলে দিলেন। মহানবী স. অচেতন অবস্থাতেই সেটুকু পান করলেন।

মহানবী স. এর কষ্ট দেখে তাঁর সহধর্মিণীগণ অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে লাগলেন। একদিন তো এমন হলো যে, হজরত উম্মে সালমা সহ্য করতে পারলেন না। চিৎকার করে উঠলেন। মহানবী স. তাঁকে চুপ করতে বললেন। আরো বললেন, এটা মুসলমানদের আদর্শ নয়। একদিন তাঁর প্রাণাধিকা পুত্রী হজরত ফাতেমাকে একান্তে ডেকে নিলেন। হজরত ফাতেমা পিতাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি স. বললেন, মা! কেঁদো না। আমি চলে গেলে শুধু 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বোলো। এতে সকলের জন্য রয়েছে শান্তি। হজরত ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্যও? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁকে আরো কাছে নিয়ে কানে কানে কিছু বললেন। হজরত ফাতেমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরক্ষণে আরো কিছু বললেন। হজরত ফাতেমা হেসে ফেললেন।

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন হজরত উম্মে সালমা। তিনি হজরত ফাতেমার এরকম কান্না-হাসির বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন। প্রকৃত বিষয় জানতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু এখন তো সে সময় নয়। তাই তিনি তাঁর কৌতূহলকে শৃঙ্খলিত করে রাখলেন।

মহানবী স. এরপর কাছে ডাকলেন প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে। বালক ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে তিনি স. গভীর মমতায় বাহুবদ্ধ করলেন। মহামমতার মহিমা দেখে অন্যদের মতো হজরত উম্মে সালমাও মমতানিমজ্জিত হলেন। সজল চোখে বিশেষ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ইমাম হোসেনের দিকে। মহানবী স. কেবল তাঁর কাছেই বলেছেন, তিনি শহীদ হবেন। মহানবী স. ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চলে গেলেন। পৃথিবীতে রেখে গেলেন রোরুদ্যমান ও বিচ্ছেদকাতর পরিবার-পরিজন ও সহচরবৃন্দকে। আর জন্মের আগেই এতিম করে গেলেন অনাগত কালের বিশ্বাসী প্রেমিকজনদেরকে।



বিরহযন্ত্রণার তীব্র তীক্ষ্ণ উচ্ছ্বাসকে অবদমিত করতেই হয়। স্থান দিতে বাধ্য হতে হয় অন্তরের গহীনে। বাইরে স্বাগতম জানাতে হয় প্রয়োজনকে। দায়িত্ববোধকে। জীবন তো থেমে থাকে না। নিরন্তর যাত্রা। শুধুই সম্মুখযাত্রা।

শোকাকুলা জননীগণ আরো অধিক ইবাদতমগ্ন হলেন। দুনিয়ার প্রতি হলেন অধিকতর অনাসক্ত। একদিন জননী উম্মে সালমা হজরত ফাতেমাকে প্রশ্ন করে সেদিনের কান্না-হাসির কারণ জেনে নিলেন। হজরত ফাতেমা বললেন, প্রথমে বলেছিলেন, অনতিবিলম্বে তাঁর মহাতিরোধান ঘটবে। পরে বলেছিলেন, পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই প্রথমে মিলিত হবে আমার সঙ্গে।

তাই হলো। ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁর নবী-পিতাবিচ্ছেদের অবসান ঘটলো। হজরত ফাতেমা মিলিত হলেন সুমহান পিতা, মহানতম নবীর সঙ্গে।

উম্মতজননীগণ জীবনযাপন করেন প্রত্যাদেশের সম্পূর্ণ অনুকূলে। পুরোপুরি হয়ে যান আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ানুকূল, যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবে— 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' আরো একটি বিশেষ নির্দেশকে মান্য করেন তাঁরা— 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।'

তাঁরা স্মরণ সংরক্ষণ করেন কোরআনের প্রত্যাদেশাবলীর যথাঅর্থের, মহানবী স. এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের। জ্ঞানপিপাসুরা সমবেত হয়। নিকটের ও দূরের মানুষ জানতে চায়, মানতে চায়, প্রশান্ত করতে চায় নিজেদের অনুসন্ধিৎসুতাকে।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হজরত উম্মে সালমার দরবারেই ভক্ত-অনুরক্তদের ও শিক্ষার্থীদের ভীড় বাড়ে বেশী। কারণ, তাঁরাই স্মরণসংরক্ষণকর্মে অধিক অগ্রগামিনী। তাঁরাই বেশী হাদিস বর্ণনা করেন। হজরত আয়েশা দুই হাজার দুই শত দশটি। আর হজরত উম্মে সালমা তিনশত আটাত্তরটি। কোরআন ও হাদিসের যথাব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সঠিকতা নিরূপণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এই জননীদ্বয়ের অবদানই বেশী।

কবি মাহমুদ লবীদ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন— রসুলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণীগণ বহু হাদিস স্মৃতিস্থ করেছিলেন। তবে বলতেই হয়, এ ক্ষেত্রে জননী আয়েশা এবং জননী উম্মে সালমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

আসমা ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, জননী উম্মে সালমার ফতোয়াসমূহ যদি সংকলন করা হয়, তবে তা ধারণ করবে একটি বৃহৎ পুস্তকের আকার।

ইমামুল হারামাইন বলেছেন, হজরত উম্মে সালমার চেয়ে অধিক সঠিক সিদ্ধান্তদানকারিণী আমার নজরে পড়েনি। মারওয়ান ইবনে হাকাম হজরত উম্মে সালমার কাছে মাসআলা জেনে নিতেন এবং বলতেন, আমাদের মধ্যে মহানবী স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ থাকতে কীভাবে আমরা অন্যত্র গমন করি।

ইবনে হাজার বলেছেন, জননী উম্মে সালমা সৌন্দর্য-চেতনা, শুদ্ধ-প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তের গুণে গুণান্বিতা ছিলেন।

হজরত উম্মে সালমা খুব সুন্দর করে কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারতেন। পাঠ করতেন মহানবী স. এর উচ্চারণভঙ্গির অনুকরণে। একবার এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মহাসম্মানিতা মাতা! জানতে চাই, রসুলুল্লাহ্‌ কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক করে— এভাবে। একথা বলে তিনি কিছুসংখ্যক আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু হোরায়রা, যাঁরা জ্ঞানসমুদ্র নামে খ্যাত, তাঁরাও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হজরত উম্মে সালমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে জ্ঞানপ্রার্থী হতেন। তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল ছিলেন তাঁর ছাত্র। তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এরকম লোকের সংখ্যা অনেক। যেমন— ওমর (ছেলে), যয়নব (মেয়ে), আমের (ভাই), মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (ভাইয়ের ছেলে), আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাফে, নাফে, ইবনে সাফিনা, আবু বাছীর, খাযরা, সাফিয়া বিনতে শায়বা, হিন্দা বিনতে হারিস, কাবীসা বিনতে জুরাইব, আবু

ওসমান নাহদী, আবু ওয়ায়েল, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, হুমাইদ, ওরওয়া, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ সাহাবা ও তাবেয়ীন।

অনেক প্রথিতযশা সাহাবী তাঁর কাছে উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করতেন। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিশিষ্ট দশ সাহাবীর একজন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ একবার তাঁকে বললেন, আম্মা! আমার কাছে এতো বেশী অর্থসম্পদ জমা হয়ে যাচ্ছে যে, আমি আতঙ্কিত বোধ করছি। জননী উম্মে সালমা বললেন, বৎস! খরচ করো। খরচ করো। রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, অনেক সাহাবী এমন হবে, যারা আমার পরলোকগমনের পর আর আমাকে দেখবে না ।

মমতাময়ী জননী তিনি। সন্তানদের সংশোধনদৃষ্টি তো তাঁর থাকবেই। একবার তাঁর এক ভাতিজাকে নামাজ পড়তে দেখলেন। সেজদার স্থানে ধূলোবালি ছিলো বলে তিনি সেজদার পর কপাল ঝেড়ে নিচ্ছিলেন। নামাজ শেষে তিনি তাকে বললেন, এরকম কোরো না। রসুলুল্লাহ্ এরকম করতেন না। একবার এক ক্রীতদাসও এরকম করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য তোমার চেহারা ধূলিমলিন হলেই উত্তম।

ইসলামী শরীয়তের তত্ত্বজ্ঞান ছিলো তাঁর আয়ত্ত। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় একথার প্রমাণ রয়েছে। যেমন— হজরত আবু হোরায়রা রা. বলতেন, রমজানের রাতে কেউ অপবিত্র হলে তাকে সুবহে সাদেকের আগেই গোসল করে নিতে হবে। না হলে তার রোজা ভেঙে যাবে। একবার এক লোক কথাটি সত্য কিনা তা জানতে চান। লোকটির কথা শুনে হজরত উম্মে সালমা ও হজরত আয়েশা সিদ্দীকা যুগপৎ বলে ওঠেন, আমরা রসুলুল্লাহ্কে অপবিত্র অবস্থায় রোজা রাখতে দেখেছি। কথাটা হজরত আবু হোরায়রার কর্ণগোচর হলো। তিনি বললেন, কী করবো। ফজল ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে তো আমি এরকমই শুনেছিলাম। আর একথাটিও অস্পষ্ট নয় যে, জননীদ্বয়ের জ্ঞান বেশী।

মহানবী স. এর পৃথিবীবাসের সময়ের একটি ঘটনা— কয়েকজন সাহাবী হজরত উম্মে সালমার কাছে রসুলুল্লাহ্র গোপন জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন জীবন একই রকম— একথা বলেই তাঁর মনে হলো, তিনি আল্লাহ্র রসুলের গোপন কিছু বলে ফেললেন না তো! অনুতাপাহত হলেন। রসুলুল্লাহ্ ঘরে এলে একথা বললেনও। তিনি স. বললেন, বেশ করেছো।

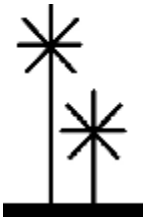
হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের রা. আসরের নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলো, এ নামাজ আপনি কেনো পড়েন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্র রসুল পড়তেন। যেহেতু হাদিসটি

তিনি জননী আয়েশার কাছে শুনেছিলেন, তাই মারওয়ান সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এক লোককে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, হাদিসটি আমি শুনেছি উম্মে সালমার কাছ থেকে। লোকটি জননী উম্মে সালমার কাছে গেলো। সবশুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আয়েশাকে ক্ষমা করুন। তিনি তো শুনতে ভুল করেছেন। আমি কি তাঁকে একথা বলিনি যে, রসুলুল্লাহ্ ওই সময় নামাজ পড়তে বারণ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, খুব লজ্জাবতী ছিলেন জননী উম্মে সালমা। একবার তাঁর সামনেই জনৈক মহিলা সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কোনো মেয়ে যদি স্বপ্নে তার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম করতে দেখে, তবে কি তার উপরে গোসল অপরিহার্য হবে? জননী বললেন, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক। তুমি রসুলুল্লাহ্র কাছে নারীসমাজকে লজ্জিত করেছো। মহানবী স. প্রশ্নের জবাবে বললেন, পানি দেখা গেলে তার উপরে গোসল ওয়াজিব হবে। একথা শুনে জননী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! মেয়েদেরও কি পানি আছে?

জননী উম্মে সালমা মহানবী স. এর দিবস রজনীর অনেক দোয়া ও ওজীফার কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন, মহানবী স. ফজর নামাজের পর পড়তেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা রিজক্বন্ ত্বইয়্যেবান্ ওয়া ইল্মান্ নাফিয়ান্ ওয়া আমালান্ মুতাক্ববালান্' (হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি পবিত্র জীবনোপকরণ, কল্যাণময় জ্ঞান এবং গ্রহণযোগ্য কর্ম)।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন, 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহ্ ....।' (হে আল্লাহ্! আমরা পদস্খলন, পথভ্রষ্টতা, অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া, কারও উপর বলপ্রয়োগ করা অথবা আমাদের উপর কারো বলপ্রয়োগ হওয়া থেকে তোমা সকাশে আশ্রয় যাচঞা করি)। আরো বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ প্রায়শঃই প্রার্থনা করতেন, 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল্ কুলুব! সাব্বিত্ কল্বি আলা দ্বীনিক্' (হে হৃদয়সমূহের পরবর্তনকারী! আমার হৃদয় তোমার দ্বীনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দাও)। উম্মতজননী আরো বলেছেন, এরকম দোয়াও তিনি করতেন— রব্বিগ্ফির্লী ওয়ার্হাম্ ওয়াহ্দিনীস্ সাবিলাল্ ক্বওমি (হে আমার প্রভুপালক! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি সদয় হও এবং আমাকে সোজা পথ দেখাও)।



বয়ে চলে কালস্রোত। ক্ষয় হয় আয়ুর আতর। লয় হয় সমাজ, সংসার, জনকোলাহল। হজরত উম্মে সালমা পার হয়ে যান অনেক দিন-মাস-বছর। বছরের পর বছর। শেষ হয়ে যায় খোলাফায়ে রাশেদীন চতুষ্টয়ের স্বর্ণশাসনকাল। উপস্থিত হয় বিশৃঙ্খলা, অশুভশাসন। উমাইয়া খান্দানের শাসকের সমর্থকেরা হজরত আলী সম্পর্কে নানারকম অশালীন মন্তব্য করতে থাকে। জননী উম্মে সালমা তা সহ্য করতে পারেন না। প্রতিবাদ করেন।

হজরত আবু আবদুল্লাহ্ আল জাদানী রা. বলেন, একদিন আমি বিশ্বাসীগণের জননী উম্মে সালমার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের ওদিকের লোকেরা রসুলুল্লাহ্কে গালি দেয়। আমি বললাম, মাআজাল্লাহ্! (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)। তিনি বললেন, স্বকর্ণে শুনেছি, রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, যে আলীকে গালি দেয়, সে আমাকে গালি দেয়। আর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বললেন, আলী এবং তাঁকে যারা ভালোবাসে, তাঁদেরকে কি গালাগালি করা হয় না? অথচ রসুলুল্লাহ্ তাঁকে ভালোবাসতেন।

কারবালা প্রান্তরে যখন ইমাম হোসেন তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন, তখন এক রাতে উম্মতজননী উম্মে সালমা স্বপ্নে দেখলেন, মহানবী স. আগমন করেছেন। চেহারায় অশান্তির ছাপ। মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু ধূলোবালি মাখানো। জননী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কী হয়েছে? বললেন, হোসেনের শাহাদতস্থল থেকে এলাম। ঘুম ভেঙে গেলো। মমতাময়ী জননী অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করলেন। বললেন, ইরাকীরা হোসেনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। নবীদৌহিত্রকে অপমান করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন।

দুই দল মুসলমান যদি দ্বন্দ্বমুখর হয়, তবে তাদেরকে সন্ধিবদ্ধ করে দিতে হবে। এটাই আল্লাহ্পাকের নির্দেশ। হজরত হাসান তাই করলেন। মুসলমানদের

রক্তপাত যাতে বন্ধ হয়ে যায়, তাই তিনি কেবল আল্লাহ্পাকের সন্তোষ কামনার্থে আমির মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেন। সন্ধিচুক্তিতে অবশ্য এইশর্তটিও রইলো যে, আমির মুয়াবিয়া রা. এর পরলোকগমনের পর খলিফা হবেন ইমাম হাসান। তিনি যখন এইমর্মে বায়াত (অঙ্গীকার) করেন, তখনই ঘটে যায় উম্মতজননী উম্মে সালমার পরলোকগমনের শোকাবহ ঘটনাটি। উম্মত জননীগণের মধ্যে তিনিই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন সকলের পরে, হিজরী ৬৩ সনে। তখন তাঁর বয়স ৮৪ বছর।

নিয়ম অনুযায়ী মদীনার প্রশাসক জানাযার নামাজে ইমামতি করার কথা। কিন্তু জননী অসিয়ত করে যান, সে যেনো তাঁর জানাযা না পড়ায়। তাঁর নির্দেশই প্রতিপালিত হয়। তখনকার মদীনার প্রশাসক ওলীদ ইবনে উতবা জানাযার সময় শহরের বাইরে চলে যায়। আর জানাযার নামাজ পড়ান হজরত আবু হোরায়রা রা.। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় জান্নাতুল বাকীতে অন্যান্য উম্মত জননীগণের পাশে। এভাবে চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় মহানবী স. এর সর্বশেষ জীবনসঙ্গিনীর স্মৃতি। আর মুসলমানদের মাতৃগৃহ হয়ে যায় শূন্য। চিরদিনের জন্য।

হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



ইসলাম সূর্যের প্রথম আলোয় আলোকিত হয়ে যাঁরা চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর নাম ছিলো বাররা। মহানবী স. তাঁর নাম দেন যয়নাব। ডাক নাম হয় উম্মে হাকাম। তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশক্রম এরকম— যয়নাব বিনতে জাহাশ ইবনে রুমাব ইবনে আমর ইবনে সাব্‌রা ইবনে কাছীর ইবনে গনম ইবনে দাওদান ইবনে আসাদ ইবনে হোযায়মা।

মায়ের নাম উমায়মা। তিনি ছিলেন মহানবী স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং তাঁর স. এর পিতা আবদুল্লাহ্‌র আপন বোন— এই হিসেবে হজরত যয়নাব হন রসুলুল্লাহ্‌র আপন ফুফাত বোন। মহানবী স. এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। আর ভাইবোনদের সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন। সকলে মিলে হিজরত করে চলে যান আবিসিনিয়ায়। সেখানে তাঁর এক ভাই ওবায়দুল্লাহ্‌ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (আবু সুফিয়ানের কন্যা) ইসলামের উপর অটল থাকেন। পরে হন মহানবী স. এর পবিত্র জীবনসঙ্গিনী। মহাসম্মানিতা উম্মতজননী।

কিছুদিন পর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহাশ ও আবু আহমদ ইবনে জাহাশ ভ্রাতৃদ্বয় বোন যয়নাবসহ পরিবারের অন্য সকলকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন। পরে উহুদযুদ্ধে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহাশ শহীদ হন। মুশরিকেরা তাঁর পেট ফেঁড়ে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তাঁর মামা শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার সঙ্গে একই কবরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মহানবী স. তাঁর এই ফুফাতো বোনটিকে ছোটবেলা থেকেই অনেক স্নেহ মমতায় বড় করে তোলেন। ঘনিষ্ঠ অভিভাবক হিসেবে তাঁর বিবাহশাদীর কথাও ভাবতে থাকেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সাহাবী হজরত যায়েদের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন।

হজরত যায়েদ ক্রীতদাস হিশেবে বাল্যবেলায় মহানবী স. এর মহান সাহচর্যে আসেন। কিন্তু তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কাবা প্রাঙ্গণে সর্বসমক্ষে এমতো ঘোষণাও তিনি দেন। মানুষও তাঁকে ডাকতে থাকে যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মহানবী স. এর

পরিবারের একজন। যখন হজরত খাদিজা, হজরত আবু বকর এবং হজরত আলী ইসলাম গ্রহণ করেন, তখনই তাঁদের সাথে হজরত যায়েদও ইসলামের অন্তর্ভূত হন। হন মহানবী স. এর সর্বক্ষণের সঙ্গী। অনেক অভিযানে তিনি স. তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণও মেনে নেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে ।

শ্রেষ্ঠত্বের ও অভিজাত্যের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও আল্লাহ্ভীতি (তাক্বওয়া)— ইসলাম এরকম বলে। কিন্তু মক্কার কুরায়েশেরা বংশগৌরবের কথা ভুলবে কী করে। কাবা শরীফের খাদেম হিশেবেই ছিলো তাঁদের এই অনন্যসাধারণ মর্যাদা। ইয়েমেনের বাদশাহ্রাও এরকম মর্যাদা দাবি করতে পারতো না। বাদশাহ্ আবরাহা তো কাবা শরীফ ধ্বংস করতে চেয়েছিলো একারণেই।

মহানবী স. এর মনে বংশগৌরবের অসুন্দর অহমিকা ছিলোই না। কেনো থাকবে? তিনি যে শাশ্বত সত্যের প্রতিভূ। তিনি স. জানেন, মানেন এবং প্রচার করেন যে, সকল মানুষ একই বংশপরম্পরাসম্পৃক্ত। তাইতো তিনি তাঁর আপন ফুফাতো বোনকে দিতে পারেন মুক্ত ক্রীতদাস হজরত যায়েদের বিবাহের প্রস্তাব। উদ্দেশ্য— মূর্খতার যুগের বংশঅহমিকার অন্ধকারে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোক প্রজ্জ্বলিত করা। ইবনে আসীর মন্তব্য করেছেন, রসুলুল্লাহ্ হজরত যায়েদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন একারণে যে, তিনি তাঁকে কিতাবুল্লাহ ও আল্লাহ্র রসুলের সুন্নতের জ্ঞান দান করবেন।

হজরত যয়নাব প্রথমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মহানবী স.কে সরাসরি বলে দিলেন, আমি তাকে আমার জন্য মানতে পারি না। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশও বোনকে সমর্থন করলেন। মহানবী স. বললেন. ইসলামের দৃষ্টিতে যায়েদ শ্রেষ্ঠ— সুতরাং আপত্তির তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। হজরত যয়নব বললেন. তাহলে আমি একটু ভেবে দেখি। ইত্যবসরে ওহী অবতীর্ণ হলো— 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত ৩৫)।

এই আয়াত শুনে হজরত যয়নাব ও তাঁর ভাই দুজনেই বললেন, আমরা রাজী। আমাদের কী অধিকার আছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অভিপ্রায়ের সম্মুখে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো।

আর কোনো অন্তরায় রইলো না। বিবাহ সম্পন্ন হলো যথাসময়ে। ইবনে কাছীর বলেছেন, বিয়ের মোহরানা ছিলো দশটি দিনার (প্রায় চার তোলা সোনা), ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রূপা), একটি ভারবাহী পশু এবং কিছু গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর। মহানবী স.

স্বয়ং এগুলো তাঁর পালকপুত্রের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দেন। কিন্তু সংসারে সুখ এলো না। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো উঠতে বসতে। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন অশান্তির সঙ্গে সম্পর্ক টিকে রইলো কোনো ক্রমে বছরখানেক।

একদিন হজরত যায়েদ বললেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! যয়নাব কর্কশ ব্যবহার করে। কথা কাটাকাটি করে। আমি তাকে তালাক দিতে চাই। মহানবী স. নিষেধ করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। হজরত যায়েদ তাঁকে তালাক দিয়েই দিলেন।

মহানবী স. বিস্মিত হলেন না। কারণ ইতোমধ্যে তিনি আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে একথা জানতে পেরেছেন যে, যয়নাব তাঁর স্ত্রী হবেন। তবে তিনি লজ্জিত হলেন খুব। সেই সূত্রে বিব্রতও হলেন একথা ভেবে যে, কীভাবে অগ্রসর হতে হবে। আরববাসীরা তো পালকপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রকে সমান জ্ঞান করে। তিনি স. প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় রইলেন।

কিছুদিন পর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবতীর্ণ হলো নবতর প্রত্যাদেশ— 'স্মরণ করো, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলছিলে তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত ৩৭)।



তিনিই নবী, যিনি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে সতত পরিচালিত হন। তিনি সুরক্ষিত ও নিষ্পাপ। মহানবী মোস্তফা স. নবীগণের নবী। নবীশ্রেষ্ঠ। সত্যবার্তা বহনকারী। বার্তাপ্রচারক। রসুল। আল্লাহ্পাকই হৃদয়ের আবর্তনবিবর্তনকারী। তিনি মহানবী স. এর হৃদয়ে ঢেলে দিলেন হজরত যয়নাবের প্রতি প্রেমানুরাগ। তিনি লজ্জিত হলেন। আর সে লজ্জার কথা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিয়ে বললেন, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকলজ্জাকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্যবার্তাপ্রচারকদের জন্য নিতান্তই অশোভন ও অনুচিত। অন্তরে লজ্জা ও ভয় থাকতে হবে কেবল আল্লাহ্র জন্য। আর বৈধ অবৈধ নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। তিনি যা বৈধ করেছেন, মানুষ কেনো তাকে অবৈধ বলবে? কেনো অবলুপ্ত করে দিবে

নিজপুত্র ও পালকপুত্রের পার্থক্য রেখা। জনমানব থেকে এমতো অপবিশ্বাসকে তো উৎখাত করতেই হবে। আর ইসলাম তো এসেছে সকল অশুভবিশ্বাসকে উৎখাত করে শুভবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

দ্বিধা-দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেলেন মহানবী স.। ইদ্দতকাল যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন তিনি স. হজরত যয়নাবকে ঘরে আনবার জন্য আকুল হলেন। হজরত যায়েদকে বললেন, তুমিই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌র রসুলের জন্য জীবন-সম্পদ-সময় উৎসর্গকারী মহান সাহাবী তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন। হজরত যয়নাবের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি আটার খামির প্রস্তুত করছেন। হজরত যায়েদ নিজে বলেছেন, তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে জাগ্রত হলো সম্ভ্রমবোধ। দৃষ্টি অবনত করতে বাধ্য হলাম। ভাবলাম, আমি সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করতে এসেছি। তাঁর দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আমি কেবল এতোটুকু বলতে পারলাম, আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, মহান প্রভুপালকের নির্দেশনা ব্যতিরেকে আমার করার কিছু নেই। এই বলে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে।

এদিকে মহানবী স. এর কাছে নেমে এলো নতুন প্রত্যাদেশ— 'অতঃপর যায়েদ যখন যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সকল রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোনো বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।'

মহানবী স. এর সঙ্গে হজরত যয়নাবের বিবাহও কার্যকর হলো। তিনি স. নিজে হজরত যয়নাবের কাছে গেলেন। বিনা অনুমতিতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন, আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং শুভবিবাহ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। সাক্ষী করেছেন জিব্‌রাইল আমিনকে।

খুবই ঘটা করে বিবাহোত্তর প্রীতিভোজের আয়োজন করা হলো। মহানবী স. তাঁর অন্য বিয়েগুলোতে এরকম করেননি। এবার করলেন কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। বিশেষ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীরত্ন পেয়ে। এর মধ্যে পুনঃপ্রত্যাদেশের মাধ্যমে ঘটানো হলো সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জল্পনা-কল্পনার চিরঅবসান। বলা হলো 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রসুল ও শেষ নবী। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সুরা আহ্‌যাব, আয়াত ৪০)।

ওলীমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন প্রায় তিনশত লোক। সকলে পূর্ণপরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস রা. নিজে বলেছেন, জননী

যয়নাবের বিবাহে ওলীমা করা হয়েছিলো গোশত ও রুটি। আমাকে দেওয়া হয়েছিলে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করার দায়িত্ব। আমি লোকজনকে ডেকে আনতে শুরু করলাম। দলে দলে লোক এসে খেয়ে যেতে লাগলো। এভাবে আপ্যায়নপর্ব শেষ হলো। আমি জানালাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। কেউ বাকী নেই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। সবকিছু গুটিয়ে নাও। আমি দেখলাম, তিনজন লোক সেখানে বসে কথাবার্তা বলেই যাচ্ছে। মহানবী স. তাদের উপস্থিতিতে নববধূর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি স. সময়ক্ষেপণের জন্য তাঁর অন্য পত্নীদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। প্রথমে গেলেন জননী আয়েশার ঘরে। তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় করলেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার নতুন বধূটি কেমন? এভাবে তিনি স. তাঁর অন্য পত্নীদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় ও সৌজন্যালাপ করলেন। এরপর ফিরে এসে দেখলেন, তখনও লোক তিনটি আলাপচারিতায় মগ্ন। তিনি স. পুনরায় জননী আয়েশার ঘরে গেলেন। সেখান থেকে ওই তিনজনের প্রস্থানসংবাদ যখন পেলেন, তখন এসে প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের কামরায়। দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখনই অবতীর্ণ হলো পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত। বলা হলো—

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ কোরো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কোরো। এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে পোড়ো না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চেয়ো। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয় এবং তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনোও বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা গুরুতর অপরাধ'।



মহানবী স. হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে খুবই ভালোবাসতেন। সবসময় তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। আর হজরত যয়নাবও তাঁকে ভালোবাসতেন নিজের জীবনের চেয়ে বেশী। একথাও কখনো ভুলতেন না যে, সপত্নীগণের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী রূপবতী। আর তিনি রসুলুল্লাহ্‌র অত্যন্ত নিকটজন। আপন

ফুফুর কন্যা। তাঁর সপত্নীগণও মোটামুটি মেনে নিতেন তাঁর এমতো দাবি। কিন্তু হজরত আয়েশা সম্ভবতঃ নীরবে উপেক্ষা করতেন। তাই দু'জনের মধ্যে ছিলো একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা। কিন্তু কখনোই তা প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করতো না। আর বিদ্যাবত্তার দিক থেকে হজরত যয়নাব প্রতিদ্বন্দ্বী হতেন না। একারণে দেখা যায়, তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন অনেক কম। মাত্র এগারোটি। বেশী হায়াত না পাওয়াও ছিলো হয়তো বা তাঁর কম হাদিস বর্ণনা করার একটি কারণ। হতে পারে প্রধান কারণ।

নবীপ্রিয়াগণের একটি সাধারণ গুণ ছিলো সত্যভাষণ। সপত্নীসুলভ ঈর্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকেই একজন আর একজনের বৈশিষ্ট্যাবলীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেন। একারণেই দেখা যায়, মহানবী স. যখন মিথ্যা অপবাদাহত হজরত আয়েশা সম্পর্কে তাঁকে মন্তব্য করতে বললেন, তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলে ফেললেন, আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া অন্য কিছু তো দেখি না। পরে হজরত আয়েশার পবিত্রতা সম্পর্কে দশটি আয়াত নাযিল হয়। এভাবে হজরত আয়েশা সম্পর্কে হজরত যয়নাবের সত্য ধারণাও হয় ওহী সমর্থিত।

হজরত যয়নাব রা. কখনো কখনো অন্য রসুলজায়াগণকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকেরা, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন সাত আকাশের উপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা। বলাবাহুল্য নবীজায়াগণ নীরবে তাঁর এমতো দাবিকে মেনে নিতেন। মেনে নিতেন তাঁর অত্যন্ত রূপবতী হওয়ার বিষয়টিকেও। অন্যরাও বিষয়টি জানতেন। সেকারণেই হজরত ওমর তাঁর কন্যা নবীজায়া হাফসাকে শাসন করতে গিয়ে বলেছিলেন, খবরদার! রসুলুল্লাহ্র সঙ্গে কথা কাটাকাটি কোরো না। তোমার না আছে যয়নাবের মতো রূপ, আর না আছে আয়েশার মতো সৌভাগ্য।

প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও হজরত আয়েশা তাঁকে সমীহ করতেন। ভালোও বাসতেন। তাঁর গুণবত্তাসমূহ বর্ণনাও করতেন কুণ্ঠাহীনতার সঙ্গে। যেমন তিনি বলেছেন, রসুলবনিতাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমার সমকক্ষতার দাবিদার ছিলেন। আরো বলেন, আমি যয়নাবের চেয়ে বেশী দ্বীনদার, বেশী পরহেজগার, অধিক সত্যভাষী, অধিক উদার, দানশীল, সৎকর্মপরায়ণ এবং অধিক আল্লাহ্র পরিতুষ্টিকামী আর কাউকে দেখিনি। স্বভাবে তেজস্বিতা ছিলো ঠিকই। কিন্তু সে কারণে অতি দ্রুত লজ্জিতও হতেন।

আরো বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ যয়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন। সত্যিই তিনি পৃথিবীতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর রসুলের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে কোরআন মজীদে কিছুসংখ্যক আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। আরো বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স্বয়ং

এইমর্মে তাঁকে শুভসমাচার দিয়ে গিয়েছেন যে, তিনি জান্নাতেও তাঁর স্ত্রী হবেন এবং সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন।

হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, তিনি ছিলেন অত্যধিক সৎকর্মপরায়ণা, খুব বেশী রোজা পালনকারিণী এবং অধিক নামাজ পাঠকারিণী।

একদিন তিনি মহানবী স. এর মহান উপস্থিতিতে হজরত আয়েশার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, আয়েশা যেমন মনে করেন, সেরকম বৈশিষ্ট্য তাঁর নেই। হজরত আয়েশা নীরবে তাঁর বক্তব্য শুনে গেলেন। মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করলেন মহানবী স. এর পবিত্র চেহারার দিকে। হজরত যয়নাবের কথা শেষ হলে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতি পেয়ে বলিষ্ঠ বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে খণ্ডন করলেন হজরত যয়নাবের যুক্তিসমূহ। হজরত যয়নাব আর কিছু বলতে পারলেন না। মহানবী স. বললেন, এরকম তো হবেই। ও যে আবু বকরের মেয়ে।

হজরত যয়নাব ছিলেন খুবই দানশীল, মুক্তহস্ত, সতত আল্লাহ্নির্ভর এবং অল্পেতুষ্টির গুণে গুণান্বিতা। পিতৃমাতৃহারা, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের আশা ভরসার স্থল। দরিদ্র-দুঃখীদের জন্য অশেষ মায়ামমতা ছিলো তাঁর হৃদয়ে। মহানবী স. স্বয়ং তাঁকে 'দীর্ঘহস্তধারিণী' বলেছেন।

তিনি ছিলেন হস্তশিল্পী। নিজ হাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া পাকা করতে পারতেন। ওই পাকা চামড়া বিক্রয় করে যা লাভ হতো, তা বিলিয়ে দিতেন অভাবীদের মধ্যে। এক বর্ণনায় একথাটিও এসেছে যে, হজরত যয়নাব সূতা কেটে যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। তারা কাপড় বুনতো। আর রসুলুল্লাহ্ সেগুলো যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন।

রূপসী তো তিনি ছিলেনই। তদুপরি ছিলেন বহুগুণের অধিকারিণী। ছিলেন মুত্তাকী, বিনয়িনী এবং আবেদা।

একবার হজরত ওমর মহানবী স. এর কথার সূত্র ধরে একটি কঠিন কথা বলে ফেললেন। হজরত যয়নাব সহ্য করতে পারলেন না। বলে উঠলেন, আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে কীভাবে কথা বলছেন আপনি! মহানবী স. হজরত ওমরকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, ওমর! ওকে কিছু বোলো না। ও তো 'আউওয়াহা' (আল্লাহ্র ভয়ে ভীতা)। সেখানে উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! 'আউওয়াহা' মানে কী। মহানবী স. বললেন, প্রার্থনায় বিনম্র হওয়া এবং আল্লাহ্র নিকট কাকুতি মিনতি করা। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'ইন্না ইব্রহীমা লা আউওয়াহুন্ হালীম্' (নিশ্চয় ইব্রাহীম দোয়াতে বিনম্র, কাকুতি-মিনতিকারী এবং সহিষ্ণু)।

আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যে তাঁকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, সেকথা তিনি ভুলতেন না। একদিন তো মহানবী স. এর সামনেই বলে ফেললেন,

হে আল্লাহ্‌র রসুল! বলুন, আমি কি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর মতো? তাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তাদের পিতা, ভ্রাতা, অথবা তাদের বংশের কোনো অভিভাবক। আর আমিই আপনার একমাত্র স্ত্রী, যার বিবাহ দিয়েছেন আসমান থেকে স্বয়ং আল্লাহ্‌। জিব্‌রাইল আমিন হয়েছেন দূত। আবার দেখুন আপনার ও আমার পিতামহ ও মাতামহ একজন।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ এতো ভালো এবং এতো বেশী খাবারের আয়োজন তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর ওলীমাতে করেননি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ তাঁর অন্য কোনো পত্নীর ওলীমা সেভাবে করেননি, যেভাবে করেছেন হজরত যয়নাব রা. এর জন্য । তিনি স. তাঁর ওলীমা করেছিলেন ছাগলের গোশত দিয়ে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, যয়নাব বিনতে জাহাশ রা. দীনার দিরহাম কিছুই রেখে যাননি। যা কিছু তাঁর কাছে আসতো, তিনি দান করতেন। তিনি ছিলেন গরীব মিসকিনদের আশ্রয়স্থল।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হজরত আয়েশা ইফকের (মিথ্যা অপবাদের) ঘটনা প্রসঙ্গে হজরত যয়নাবের অনেক প্রশংসা করেছেন।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার মন্তব্য করেছেন, ধর্মনিষ্ঠার বিষয়ে আমি হজরত যয়নাবের চেয়ে উত্তম কোনো রমণী দেখিনি।



মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহানতম নবী পৃথিবীর দায়িত্ব শেষ করলেন। ডাক এলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা মহাপ্রভুপালকের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌র হাবীব সে ডাকে সাড়া দিলেন। লাভ করলেন চিরআকাঙ্ক্ষিত মাশুকমিলন।

উম্মতজননীগণ হলেন শোকাকুলা। তাঁদের প্রিয়তম স্বামী ও রসুল আর আসবেন না। পৃথিবী পীড়িত ও বিরহদগ্ধ হতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ উপস্থিত না হবে মহাপ্রলয়। ভাগ্যের অমোঘ লিখন মেনে নিতেই হবে। তিক্ত প্রতীক্ষার প্রতিটি পল ও পরত অতিক্রম করতে হবে চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে। বিচ্ছেদযন্ত্রণা যতোই প্রলম্বিত হোক, একসময় তা শেষ হয়ে যাবে। এসে পড়বে মহামিলনের ক্ষণ।

খলিফা ওমর তাঁর জন্য বারো হাজার দিরহাম বাৎসরিক ভাতা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা নিজের জন্য ব্যয় করতেন না। জীবিকা নির্বাহ করতেন নিজস্ব উপার্জন দ্বারা। আর মহানবী স. খায়বরে উৎপন্ন ফসল থেকে তাঁর জন্য একশত ওয়াসাক শস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

একবার খলিফা হজরত ওমর তাঁর কাছে এক বছরের ভাতা বারো হাজার দিরহাম পাঠালেন। তিনি দিরহামগুলো একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। বাযরাহ্ ইবনে রাফেকে নির্দেশ দিলেন, ওগুলো আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্র জনতার মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দাও। বাযরাহ্ বললেন, ওগুলোতে কি আমাদেরও কিছু হক আছে? তিনি বললেন, সবগুলোইতো তোমাদের। সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার পর তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এর পরে যেনো এসকল অর্থবিত্তের মুখ আমাকে না দেখতে হয়। এতো এক পরীক্ষা। বলাবাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো।

মহানবী স. বলে গিয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশী লম্বা, সে-ই আমার কাছে আসবে সকলের আগে। এই মহাবাণীখানি নিয়ে উম্মতজননীগণ জল্পনা-কল্পনা করতেন। নিজেদের হাত মাপামাপি করতেন। এভাবে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যে, যেহেতু জননী সওদা দীর্ঘাঙ্গিনী ও দীর্ঘহস্তবিশিষ্ট সেহেতু তিনিই প্রথমে মিলিত হবেন আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে। কিন্তু তা হলো না। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের শাসনকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন জননী যয়নাব। সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো 'যার হাত বেশী লম্বা' কথাটির প্রকৃত অর্থ— যে অধিক দানশীলা।

মহানবী স. এর প্রিয়তমা ঘরণী হয়েছিলেন আটত্রিশ বছর বয়সে। চলে গেলেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। হিজরী ২০ সনে। ওই বছরেই সংঘটিত হয় মিসর বিজয়।

নিজের কাফনের ব্যবস্থা নিজেই করে গেলেন। বলে গেলেন, খলিফা যদি কাফনের কাপড় পাঠায়, তবে যে কোনো কাফন যেনো দান করে দেওয়া হয়। তাঁর অসিয়ত প্রতিপালিত হয়। খলিফাপ্রদত্ত কাফন পরানো হলো তাঁকে। আর তাঁর নিজের কাফন দান করে দেওয়া হলো তাঁর বোন হাফসাকে।

আর একটি অসিয়ত করে গেলেন তিনি। বললেন, অন্তিম যাত্রাকালে আল্লাহ্র রসুলকে যে খাটিয়ায় শোয়ানো হয়েছিলো, সেই খাটিয়ায় যেনো আমাকে কবর পর্যন্ত বহন করা হয়। মহাপুণ্যবতী মায়ের এই অসিয়তখানিও পালন করা হলো। তাঁর সহচরী সপত্নীগণ তাঁকে গোসল করালেন। আর ওই বরকতময় খাটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হলো জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে। উল্লেখ্য, ওই খাটিয়ায় রসুলুল্লাহ্ স. এর পরে ওঠানো হয়েছিলো কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে।

খলিফা হজরত ওমর জানাযার নামাজ পড়ালেন। রবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি ওমরকে দেখলাম তাঁর একটি স্কন্ধে দুররা ঝুলছে। তিনি সামনে গেলেন। আর চার তকবীরের সঙ্গে জননী যয়নাবের জানাযার নামাজ পড়ালেন। কবরের পাশে অপেক্ষা করলেন কবরের উপর পানি ছিটানোর কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলাইত বলেছেন, আমি জননী যয়নাবের ভাই আবু আহমদ ইবনে জাহাশকে দেখলাম, তিনি খাটিয়া বহন করছেন আর কাঁদছেন। তিনি তখন দৃষ্টিশক্তিরহিত। শুনলাম, ওমর তাঁকে বলছেন, খাটিয়া থেকে সরে এসো, মানুষের ভিড়ে কষ্ট পাবে। আবু আহমদ বললেন, ওমর! আমরা সকল কল্যাণ লাভ করেছি তাঁরই ওসিলায়। আর আমার কান্না সিক্ত করছে অন্তর্জ্বালাকে। করতে দাও। ওমর বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

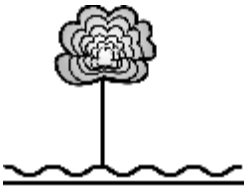
দাফনের সময় এক কুরায়েশ যুবক মিসরী রঙিন কাপড় পরে সেজেগুঁজে সেখানে উপস্থিত হলো। হজরত ওমর তাকে দেখে রেগে গেলেন। তার মাথার উপর ছড়ি উঠিয়ে বললেন, তুমি এমনভাবে এসেছো, দেখে মনে হচ্ছে এখানে আমরা খেলা করছি। আরে এখানে তো প্রবীণগণ তাঁদের মায়ের দাফনকর্ম সমাধা করছে।

দিবসটি ছিলো অত্যধিক উত্তপ্ত। তাই খলিফার নির্দেশে সেখানে শামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, কবরে কারা নামবে? উম্মতজননীগণ বলে পাঠালেন, পৃথিবীতে যে সকল নিকটজন তাঁর কাছে আসতো, তারা। তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক জননী যয়নাবকে কবরে নামালেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আহমদ ইবনে জাহাশ এবং মোহাম্মদ ইবনে তালহা।

উত্তরাধিকার হিসেবে শুধু একটি বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। অনেক পরে উমাইয়া খলিফা ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মূল্যে বাড়িটি তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে কিনে নেন এবং মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

মাতৃহারা মদীনার মিসকিন জনতা সেদিন শোকে আহাজারী শুরু করে দিয়েছিলো। জননী আয়েশা সিদ্দীকা দারুণ দুঃখ পেয়েছিলেন। ব্যথিত হৃদয়ের মর্মজ্বালাকে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে— হায়! তিনি অতুলনীয় প্রশংসাসহ প্রস্থান করলেন। আর এতিম ও বিধবাদেরকে করে গেলেন অসহায়।

হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



মদীনায় সংবাদ পৌঁছলো, বনী মুস্‌তালিকের গোত্রাধিনায়ক হারেছ ইবনে আবু জেরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। নিজ সম্প্রদায় এবং আরবের অন্যান্য লোককে সংঘবদ্ধ করে চলেছে। খোযাআ জনপদবাসীর একটি শাখা গোত্রের নাম বনী মুসতালিক।

সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করা প্রয়োজন। মহানবী স. বনী মুসতালিক জনপদের দিকে প্রেরণ করলেন হজরত বোরায়দা রা.কে। তাঁকে বলে দিলেন জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে যা খুশী তাই বলতে পারবে। তিনি সাধারণ পথিকের বেশে যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, শুনলাম যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। আমিও আমার এলাকার লোকজনকে নিয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। তাঁর কথা শুনে গোত্রপতি হারেছ উল্লসিত হলো। তাকে তার বাহিনীসহ যোগদান করতে বললো।

হজরত বোরায়দা মদীনায় ফিরে এসে সব ঘটনা জানালেন। মহানবী স. ঘোষণা দিলেন, নতুন অভিযানের জন্য সমবেত হও। সাহাবীগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে এলেন। মদীনার প্রশাসকের দায়িত্ব দিলেন হজরত আবু যর গিফারীকে। যুদ্ধযাত্রা করলেন রাতের বেলায়— শাবান মাসের দ্বিতীয় তারিখে। তখন চলছে হিজরী পঞ্চম সন। সঙ্গে নিলেন মুমিনজননী হজরত আয়েশা রা. ও হজরত উম্মে সালমা রা.কে।

পথে দেখা হলো গোত্রপতি হারেছ কর্তৃক প্রেরিত এক গুপ্তচরের সঙ্গে। মহানবী স. তাঁকে মুশরিকবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে মুখ খুললো না। ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। সে অস্বীকার করলো। মহানবী স. এর নির্দেশে হজরত ওমর রা. তাকে হত্যা করে ফেললেন।

গুপ্তচর নিহত হবার সংবাদ শুনতে পেয়ে গোত্রপতি হারেছ ভীত ও স্তম্ভিত হলো। প্রথমেই অশুভ সংকেত! তার দলের লোকেরাও ভয় পেয়ে গেলো। দূরাগত লোকেরা অতিদ্রুত পালিয়ে গেলো। রইলো কেবল স্থানীয় জনপদবাসীরা। মহানবী স. তাদের নিকটবর্তী হলেন। হজরত ওমরকে বললেন, ওদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর্ রসুলুল্লাহ্ স্বীকার করতে বলো। বলো, তাহলে তোমাদের জীবন-সম্পদ নিরাপদ রাখা হবে। হজরত ওমর উচ্চকণ্ঠে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালেন। তারা কথা বললো না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। উভয় পক্ষের তীর নিক্ষেপ চললো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। শেষে মহানবী স. আক্রমণের আদেশ দিলেন। বীর মুজাহিদগণ ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুসেনাদের উপর। শত্রুরা বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। তাদের পক্ষের ১১ জন নিহত হলো। অবশিষ্টরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। পুরুষ-রমণী ও শিশু মিলে বন্দী করা হলো ছয় শত জনকে। আর গনিমত হিসেবে পাওয়া গেলো দুই হাজার উট এবং পাঁচ হাজার ছাগল।

গনিমতের তত্ত্বাবধায়ক হলেন মহানবী স. এর গোলাম শোকরান রা.। আর বন্দীবণ্টনের দায়িত্ব পেলেন হজরত বোরায়দা রা.। তাদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হলো। যথানিয়মে ভাগ করে দেওয়া হলো মুজাহিদগণের মধ্যে।

গোত্রপতি হারেছ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। কিন্তু তার কন্যার জামাতা প্রাণ হারালো। আর কন্যা হলো যুদ্ধবন্দিনী। নাম বাররা। তিনি পড়লেন হজরত সাবেত ইবনে কায়েস এবং তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে।

গোত্রাধিনায়কের কন্যা তিনি। দাসত্ব স্বীকার তাঁর কল্পনারও অতীত। বাররা অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার আবেদন জানালেন। হজরত সাবেত সম্মত হলেন। মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারণ করলেন নয় উকিয়া স্বর্ণ। বাররা খুশী হলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি হলেন দুর্ভাবনাকবলিত। এতো অর্থ কোথায় পাবেন? ভেবে ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, মহানবী স.কে তিনি নবী বলে স্বীকার করবেন। মনে প্রাণে ইসলামসমর্পিতা হবেন। আর মুক্তিপণের অর্থ চাইবেন আল্লাহ্র রসুলের কাছে। লোকে বলে, তিনি মমতার মহাসাগর।

তিনি তাই করলেন। মহানবী স. সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন। মুক্তিপণের অর্থপ্রার্থিণী হলেন। মহানবী স. সম্মত হলেন। সেইসঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবও দিলেন। বাররা রাজী হলেন। শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী স. তাঁর নাম রাখলেন জুওয়াইরিয়া।

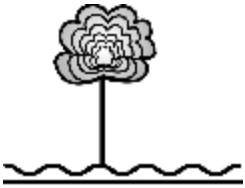
পুরো ঘটনাটি উম্মতজননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন এভাবে— জুওয়াইরিয়া ছিলেন মধুকণ্ঠী ও লাবণ্যময়ী। তার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করতো, সেই অভিভূত হতো। মহানবী স. একটি পানির কূপের কাছে বসেছিলেন। এমন সময় জুওয়াইরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে তার জন্য আর্থিক সহায়তা কামনা করলো। তার এভাবে এখানে আসাটা আমি মোটেও পছন্দ করলাম না। দেখলাম,

রসুলুল্লাহ্ তার দিকে অনুরাগের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, যে দৃষ্টিতে তিনি স. তাকান আমার দিকে। জুওয়াইরিয়া বললো, আমি বিশ্বাসবতী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি গোত্রপতি হারেছের কন্যা। এখন বন্দিনী। সাবেত ইবনে কায়েস ও তার চাচাতো ভাইয়ের অধীন। তাঁরা আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু মুক্তিপণ এতো বেশী ধার্য করেছেন, যা আমার পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব। তাই আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন। রসুলুল্লাহ্ বললেন, এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা যদি করা হয়, তবে তুমি কি তাতে রাজী হবে? জুওয়াইরিয়া বললো, বলুন। রসুলুল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবো। তারপর তোমাকে বিবাহবদ্ধ করবো। জুওয়াইরিয়া বললো, আমি রাজী। রসুলুল্লাহ্ সাবেত ইবনে কায়েসকে ডেকে আনালেন। তাঁকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। সাবেত বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আপনার উদ্দেশ্যে আমার জনক-জননী উৎসর্গীত হোক। হারেছতনয়া আপনারই। রসুলুল্লাহ্ চুক্তির অর্থ পরিশোধ করলেন। তারপর বিবাহবন্ধনাবদ্ধ করলেন জুওয়াইরিয়াকে।

মুসতালিক গোত্রের পুরুষ-রমণীরা দাস-দাসীরূপে মুজাহিদগণের ভাগে পড়েছিলো। রসুলুল্লাহ্ যখন জুওয়াইরিয়াকে বিয়ে করলেন, তখন তাঁরা বলে উঠলেন, বনী মুসতালিক গোত্র তো এখন আল্লাহ্র রসুলের শশুরকুল। সুতরাং তাঁদের কেউ তো আমাদের দাস-দাসী হতে পারেন না। একথা বলে তাঁরা একে একে সবাইকে মুক্ত করে দিলেন।

উল্লেখ্য, এরকম সিদ্ধান্তের ফল হলো আশাতীতরূপে বরকতময়। মহানবী স. এর মূল উদ্দেশ্যই তো ছিলো অবিশ্বাসী ও অসুন্দর মানুষকে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী বানানো। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে। মুক্ত বনী মুসতালিকের সকলেই চিরদিনের জন্য বক্ষাভ্যন্তরে স্থাপন করলো মহাবিশ্বাস— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্।

জননী আয়েশা আরো বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার ফল হয়েছিলো বিস্ময়ময় ও শুভ। তার কারণে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো মুসতালিক গোত্রের একশত পরিবার (ছয়শত লোক)। আপন সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়ার চেয়ে অধিক কল্যাণময়ী আর কেউ নেই।



সেই স্বপ্নটির প্রকৃত অর্থ কী, তা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু কাউকে বলেননি। বনী মুসতালিক জনপদে মহানবী স. এর আগমনের কথাও তাঁকে কেউ বলেনি। আর তাঁর শুভস্বপ্নটি এতো দ্রুত বাস্তবায়িত হবে, তা-ও তিনি বুঝতে পারেননি।

তিনি নিজে বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র অন্তঃপুরে আসার আগে আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, একটি পূর্ণ আলোকিত চাঁদ ইয়াসরেবের দিক থেকে আমার কোলে এসে পড়লো। আমি স্বপ্নের কথা কাউকে জানাইনি। যখন তিনি স. আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করলেন, তখন বুঝতে পারলাম স্বপ্নটির প্রকৃত মর্ম। সম্প্রদায়ের লোকদের মুক্তির কথাও আমাকে আগে জানানো হয়নি। মুসলমানেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ্‌ যখন আমাকে এই শুভসংবাদটি জানালেন, তখন আমি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জানালাম প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা।

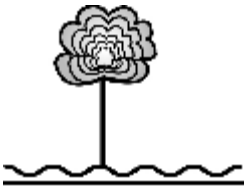
গোত্রপতি হারেছ কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন। আদরের কন্যাকে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা ছিলো, তাঁর প্রিয়পুত্রী মোহাম্মদের বন্দিনী হিসেবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। কন্যাকে মুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন পিতা।

এক বর্ণনায় এসেছে, জননী জুওয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে আবু জেরার মুক্তিপণ হিসেবে কয়েকটি উট নিয়ে মদীনা অভিমুখে চললেন। আকীক নামক উপত্যকায় পৌঁছে সবচেয়ে ভালো উট দু'টি এক স্থানে লুকিয়ে রাখলেন। অবশিষ্ট উটগুলো নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। প্রথমে কন্যার সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। মহানবী স. বললেন, ভিতরে যান। সে যদি আপনার সাথে যেতে চায়, তবে বাধা দেওয়া হবে না।

খুবই উৎফুল্ল মনে কন্যার সঙ্গে দেখা করলেন হারেছ। বললেন, মোহাম্মদ তোমাকে তোমার মর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এখন চলো। আমাকে লজ্জায় ফেলো না। জননী জুওয়াইরিয়া বললেন, আমি তাঁর কাছেই থাকতে চাই।

গোত্রপতি হারেছ এরকম কথা শুনবেন, তা আশা করেননি। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। বাইরে এসে মহানবী স.কে বললেন, মুক্তিপণ হিসেবে এই উটগুলো এনেছি। এগুলো নিয়ে আমার কন্যাকে আমার সাথে যেতে দিন।

মহানবী স. উটগুলোর দিকে তাকালেন। বললেন, ওই উট দুটো কোথায়, আকীক উপত্যকায় যে দুটোকে লুকিয়ে রেখে এসেছেন? হারেছ বললো, উট দুটোকে লুকিয়ে রাখার কথা তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনি জানলেন কীভাবে! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্রই রসুল। এভাবে হারেছ মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। শান্তি ও আনন্দে ভরে গেলো তাঁর মন। সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হলেন তখন, যখন জানতে পারলেন তাঁর কন্যা এখন আর বার্রা নন, জুওয়াইরিয়া— আল্লাহ্র রসুলের প্রিয়তমা পত্নী।



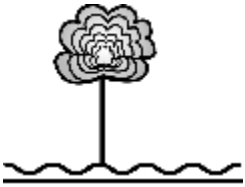
মহানবী স. তাঁর সকল পত্নীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। সেই পবিত্র ও সীমাহীন ভালোবাসার মহাসমুদ্রে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হলেন জননী জুওয়াইরিয়া। তাঁর মনোভাবে ও স্বভাবে ফুটে উঠলো মহানবী স. এর মূল আদর্শটি— বিশুদ্ধচিত্ত উপাসনায় সতত মগ্ন থাকা। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো এটাই– 'আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'

একদিন সকালে মহানবী স. দেখলেন, হজরত জুওয়াইরিয়া দোয়া-প্রার্থনায় নিমগ্ন। তিনি স. নীরবে স্থান ত্যাগ করলেন। দুপুরের কিছু আগে পুনঃউপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি তসবী-ওজীফা করেই চলেছেন। মহানবী স. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সব সময় এ অবস্থায় থাকো? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। মহানবী স. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু ভালো কথা শিখিয়ে দেবো না, যা তোমার এই নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম? জননী নীরবে সম্মতি জানালেন। মহানবী স. বললেন– সুবহানাল্লাহি আদাদা খলক্বিহি (তিনবার), সুবহানাল্লাহি রিদ্বা নাফসিহি (তিন বার), সুবহানাল্লাহি জিনাতা আরশিহি (তিনবার)। সুবহানাল্লাহি মাদাদা কালিমাতিহি (তিনবার)।

তিনি ছিলেন যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতীও। জননী আয়েশা প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একথাও তিনি বলেছিলেন যে, জুওয়াইরিয়ার রূপ ও নারীসুলভ আকর্ষণ গুণ দুটোই ছিলো। ইমাম জাহাবী বলেছেন, মাতা মহোদয়া জুওয়াইরিয়া ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন। ছিলেন

ব্যক্তিত্বসম্পন্না। পবিত্র আত্মমর্যাদাবোধের দ্যুতি সারাক্ষণ আলোকিত করে রাখতো তাঁর শুচিস্নিগ্ধ অবয়বকে। দাসত্বমুক্তির জন্য তাঁর ব্যাকুলতার মধ্যেও ফুটে উঠেছিলো তাঁর অনন্যসাধারণ মর্যাদাবোধ। আবার পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি ছিলেন নির্মোহ ও নিরাসক্ত। পতিতুষ্টি ও ইবাদত ছাড়া তাঁর অন্য কোনো লক্ষ্য ছিলোই না। এ সকল কারণে মহানবী স. তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতও করতেন প্রায় প্রতিদিন।

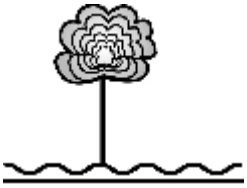
একবার তিনি স. তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কিছু কি আছে? জননী বললেন, আমার দাসী কিছু সদ্কার গোশত দিয়েছিলো ওগুলোই আছে শুধু। তিনি স. বললেন, তা-ই নিয়ে এসো। সদ্কা তো সদ্কার স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। কথাটির অর্থ সদ্কার গোশত দাসীর কাছে পৌঁছেছে, সে হয়েছে গোশতের মালিক। এখন সে মহানবী স. এর কাছে যা দিয়েছে, তা হাদিয়া। সদ্কা নয়। উল্লেখ্য, মহানবী স., তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন এবং বংশধরদের জন্য সদ্কা ভক্ষণ হারাম। হারাম সচ্ছল মুসলমানদের জন্যও।



তাঁর কাছ থেকে শরীয়তের কিছু বিধিবিধানের কথাও এসেছে। নফল রোজা রাখতে গেলে যে পরপর দু'টি রোজা রাখতে হয়, সে কথাটি তাঁর মাধ্যমেই জানা গিয়েছে এভাবে— এক জুমআর দিনে রসুলুল্লাহ্ স. হজরত জুওয়াইরিয়ার কক্ষে প্রবেশ করলেন। হজরত জুওয়াইরিয়া সেদিন রোজা রেখেছিলেন। মহানবী স. জিজ্ঞেস করলেন, গতকালও কি তুমি রোজা রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। পুনঃজিজ্ঞেস করলেন, আগামীকালও কি রোজা রাখবে? তিনি বললেন, না। মহানবী স. বললেন, তাহলে রোজা ভেঙে ফেলো।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, একবার জননী জুওয়াইরিয়া মহানবী স.কে বললেন, আমি এই ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করে দিতে চাই। তিনি স. বললেন, ওকে তুমি তোমার মামার কাছে পাঠিয়ে দাও, যিনি গ্রামে বসবাস করেন। এতে তুমি সওয়াব বেশী পাবে।

হজরত জুওয়াইরিয়া রসুলুল্লাহ্‌র সাতটি হাদিসের বর্ণনাকারিণী। তার মধ্যে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন একটি এবং ইমাম মুসলিম দুটি। তাঁর কাছ থেকে যাঁরা হাদিস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন— হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত জাবের, হজরত ইবনে ওমর, উবাইদ ইবনে আস্ সাবাক, তোফায়েল, মুজাহিদ, কুরাইব, আবু আইয়ুব মুরাগী, কুলসুম ইবনে মুসতালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ প্রমুখ সাহাবা ও তাবেয়ীন।



পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল সৌভাগ্যের মূল মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মহান সান্নিধ্য তিনি পেয়েছিলেন প্রায় ছয় বছর। সপত্নীগণের সঙ্গে তাঁর অম্লমধুর দ্বন্দ্বের কথা পাওয়াই যায় না। আর মহানবী স. এর মহাতিরোধানের পর তাঁর অন্যসকল জীবনসঙ্গিনী যেমন হতে চেষ্টা করেছেন অধিকতর ইবাদতগুজার, দান-ধ্যানে মশগুল, তিনিও জীবন যাপন করতে থাকেন তেমনি পবিত্র নিয়মে। অপেক্ষা করতে থাকেন শুভ সমাপ্তির আশায়।

রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর জন্য খায়বরের উৎপাদিত ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর ও বিশ ওয়াসাক যব জীবিকা হিসেবে নির্ধারণ করে দেন। পরে খলিফা ওমর তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। সকল মুমিনজননীদের জন্য বারো হাজার দিরহাম। আর হজরত জুওয়াইরিয়া ও হজরত সাফিয়ার জন্য ছয় হাজার দিরহাম করে। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এক সময় তাঁরা দাসত্বভূতা ছিলেন, সেই কারণে। কিন্তু উম্মতজননীদ্বয় তাঁর এমতো নির্ধারণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা সমতার দাবি তোলেন। অবশেষে হজরত ওমর নতি স্বীকার করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেন বারো হাজার দিরহাম করে।

মহাপুণ্যবতী উম্মতজননী যখন মহানবী স. এর অসংসারী সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর। এরপর রসুলমিলনের জন্য তাঁকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ৬৫ বছর বয়সে মিলিত হন প্রিয়তম স্বামী এবং ততোধিক প্রিয়তম নবীর সঙ্গে। ইন্‌না লিল্লাহি ওয়া ইন্‌না ইলাইহি রজিউন।

জানাযার নামাজ পড়ান তখনকার মদীনার প্রশাসক মারওয়ান। আর তাঁকে সমাহিত করা হয় জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে তাঁর অন্য সকল সখী-সহচরী-সপত্নীগণের পাশে।

হজরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



নতুন মুসলমানদের উপর কুরায়েশ কাফেরদের অত্যাচার বেড়েই চললো। দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত— সকল বিশ্বাসীর উপর তাদের অত্যাচার প্রায় একই রকম নিষ্ঠুর। মহানবী স. ছিলেন অন্যাপেক্ষা কিছুটা নিরাপদ। পিয় পিতৃব্য গোত্রপতি আবু তালেব ছিলেন তাঁর দৃশ্যমান রক্ষক। বরং স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালাই ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রধান সহায়। তিনি স. তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচারবিমুক্ত অবস্থায় দেখতে চাইতেন। কিন্তু পারতেন না। অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন তিনি সাহাবীগণকে হিজরতের (দেশত্যাগের) অনুমতি দিলেন। বললেন, আবিসিনিয়া শান্তির দেশ। সেখানকার নাজ্জাশী (রাজা) হৃদয়বান ও ন্যায়বিচারক। তোমরা সেখানে যেয়ে বসবাস করতে পারো, যতোদিন আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অধিকতর উত্তম ব্যবস্থা না হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত সংঘটিত হয় দু'বার। প্রথম বার অল্পসংখ্যক সাহাবী হিজরত করেন। দ্বিতীয়বার হিজরত করেন সাহাবীগণের বড় একটি দল। ওই দলে ছিলেন জননী যয়নাব বিনতে জাহাশের দুই ভাই— আবু আহমদ ইবনে জাহাশ এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ। মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যিনি কাফের কুরায়েশদের নেতা ছিলেন, সেই বিখ্যাত আবু সুফিয়ানের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তাঁরা। আবু আহমদ ইবনে জাহাশ ফারিয়াকে এবং উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রামলাকে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ও রামলার সংসার ছিলো সুখের। অন্যান্য মুহাজিরদের মতো তাঁরাও একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে সংসার করে যাচ্ছিলেন। সেখানে তাদের ঘরে এলো দুটি সন্তান— বড়টি মেয়ে এবং ছোটটি ছেলে। যখন মেয়ের নাম হাবীবা রাখা হলো, তখন থেকে তাঁর মায়ের রামলা নামটি ঢাকা পড়ে গেলো। সবাই রামলাকে ডাকতে লাগলো উম্মে হাবীবা (হাবীবার মা) বলে।

উম্মে হাবীবার সুখের সংসার হঠাৎ একদিন কেমন যেনো হয়ে গেলো। এক অজানা আতঙ্ক এবং বিষাদ ঘিরে ফেললো তাঁকে। ভিতরে ভিতরে শুরু হলো

অশান্তির ঝড়। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, উবায়দুল্লাহ্ বীভৎস আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকালে স্বপ্নের কথা বলতে যাবেন, কিন্তু তার আগে উবায়দুল্লাহ্ই বলতে শুরু করলো, শোনো হাবীবার মা! ধর্মবিষয়ে আমি গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে যেয়ে দেখলাম, সবচেয়ে ভালো ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টানধর্ম। আমি খ্রিস্টান ধর্মকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করলাম। উম্মে হাবীবা শিউরে উঠলেন। স্বপ্নের কথা জানালেন। উবায়দুল্লাহ্ যে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, সেকথা অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। উবায়দুল্লাহ্ চির হতভাগ্যতাকেই গ্রহণ করলো। ধর্মত্যাগ করলো। মুরতাদ হয়ে গেলো।

মুরতাদ হলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং বিশ্বাসবতী উম্মে হাবীবাও চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। একাকী হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ্ বেশী দিন বাঁচলো না। অত্যধিক মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো সে। সে কারণেই হয়তো অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

হজরত উম্মে হাবীবা কিসের আশায় যেনো উন্মুখ হয়ে রইলেন। একমাত্র সহায় আল্লাহ্। তিনি এবার তাঁর জীবনের তরী কোন দিকে ঘুরিয়ে দিবেন, উম্মে হাবীবা তা জানেন না। শিশুসন্তান দুটোর কী গতি হবে, তা-ও তিনি বলতে পারেন না।

তিনি নিজে বলেছেন, এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, কে যেনো আমাকে ডেকে চলেছে 'ইয়া উম্মুল মুমিনীন'! স্বপ্ন ভেঙে গেলো। আমার মন বললো, আল্লাহ্র রসুল আমাকে বিবাহ করবেন।



অল্প কিছুদিন পরেই শুভবিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হলো। বাস্তবের মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চললো হজরত উম্মে হাবীবার স্বপ্ন। সুদূর মদীনা থেকে শুভপরিণয়ের প্রস্তাব নিয়ে আবিসিনিয়া এলেন হজরত আমর ইবনে উমাইয়া আদ্ দামরী। রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। মহানবী স. এর চিঠিখানি হস্তান্তর করলেন। নাজ্জাশী মহান পত্রটি পাঠ করলেন। লেখা আছে— উম্মে হাবীবার সঙ্গে আমার বিবাহের কাজ আপনাকেই সমাধান করতে হবে।

নাজ্জাশী বিলম্ব করলেন না। তাঁর বিশিষ্ট দাসী অবরাহাকে হজরত উম্মে হাবীবার কাছে পাঠালেন। বললেন, বলে দিয়ো, রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে আপনার শুভ বিবাহ সম্পন্ন করার দায়িত্ব এখন আমার। আপনি শুধু আপনার পক্ষের উকিল নিযুক্ত করুন। হজরত উম্মে হাবীবা মহান প্রস্তাব পেয়ে এতো খুশী হলেন যে, শরীরের গহনাগুলো খুলে দাসীকে উপহার দিলেন— দুটো রুপার চুড়ি, কানের দুল এবং একটি নক্‌শাখচিত আঙ্‌টি। তারপর নিজের উকিল নিযুক্ত করলেন হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে।

নাজ্জাশী নিজে সকলকে বিবাহের নিমন্ত্রণ জানালেন। যথাসময়ে বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হলো প্রবাসী মুসলিম জনতা। দলনেতা হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব। শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। নাজ্জাশী নিজে বিবাহের মোহরস্বরূপ চারশত স্বর্ণমুদ্রা কন্যাপক্ষের উকিল হজরত খালেদ ইবনে সাঈদের হাতে তুলে দিলেন। তারপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন— সমস্ত প্রশংসা প্রশস্তি আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সর্বাধিপতি ও শান্তি ও নিরাপত্তাবিধায়ক, মহারক্ষক, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রবল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর দাস ও রসুল, যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও এমন সত্যধর্মসহকারে, যে ধর্ম অন্য সকল ধর্মের উপরে অবশ্যই বিজয়ী হবে— যদিও অংশীবাদীরা তা পছন্দ করবে না। উপস্থিত জনতা! আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে এই মর্মে আজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি যেনো তাঁর সঙ্গে পরম শ্রদ্ধেয়া উম্মে হাবীবার বিবাহ সুসম্পন্ন করি। আলহামদুলিল্লাহ্‌! আজ আমি তাঁর মহা আজ্ঞা পালন করতে পারলাম।

এরপর ভাষণ দিলেন হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ। বললেন, আমি কেবল মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি বর্ণনা করছি। সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি কেবল তাঁর। আর আমি এমতো সাক্ষ্যও প্রদান করছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো প্রভু-উপাস্য নেই— তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. তাঁর বান্দা ও বাণীবাহক। এই শুভসমাবেশ মহামহিম আল্লাহ্‌র রসুল এবং মহাসম্মানিতা জননী উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানের পবিত্র বিবাহের। আল্লাহ্‌পাক এই পবিত্র পরিণয় অনন্ত বরকতময় করুন। ভাষণদানপর্ব শেষ হলো। শুরু হলো ভোজনপর্ব। হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ বললেন, সকলে বসুন। ওলীমায় অংশগ্রহণ করুন। বিয়ের পর আহার করানো নবী-রসুলগণের রীতি।

পানাহার পর্বের পরক্ষণে দাসী আবরাহার মাধ্যমে জননী উম্মে হাবীবার কাছে মোহরের অর্থ চারশত দীনার পৌঁছানো হলো। তিনি পঞ্চাশ দিনার দাসীকে দিতে গেলেন। দাসী বললেন, না। নাজ্জাশী আমাকে কোনোকিছু নিতে নিষেধ করেছেন। এই বলে দাসী তাঁর আগের দেওয়া গহনাগুলোও ফেরত দিয়ে দিলো।

তারপর বললো, হে রসুলসঙ্গিনী! আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আপনি যখন রসুলসঙ্গ লাভ করবেন, তখন অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার মুসলমান হওয়ার কথা জানাবেন এবং বলবেন, আমি তাঁকে সালাম নিবেদন করেছি।

নাজ্জাশী মুমিনজননী হজরত উম্মে হাবীবাকে উপঢৌকন হিসেবে দিলেন অনেক মেশক আম্বর সুগন্ধি এবং মূল্যবান তৈজসপত্র। তারপর মহা জাঁক-জমকের সাথে তাঁর মদীনাযাত্রার ব্যবস্থা করলেন। সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর সঙ্গে চললো হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একদল মুহাজির সাহাবী। জননী মহোদয়ার জাহাজ যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলো আবিসিনিয়ার বন্দর থেকে। নির্বিঘ্ন জাহাজযাত্রা শেষ হলো মদীনার নিকটতম কোনো এক বন্দরে। সেখান থেকে মদীনায় যখন পৌঁছলেন, তখন মদীনা রসুলশূন্য। জানতে পারলেন, আল্লাহ্‌র রসুল এখন অনেক দূরে— খায়বরের যুদ্ধক্ষেত্রে।

হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, রসুলুল্লাহ্‌ যখন হজরত উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করেন, তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াতখানি— 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৭)।



হজরত উম্মে হাবীবার পিতা আবু সুফিয়ান তখন ইসলামের শত্রুপক্ষের প্রধান। তবে ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। যুদ্ধের উন্মাদনা আর নেই। কিন্তু উভয়পক্ষকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সন্ধির শর্তসমূহ মেনে চলতে হয়।

মক্কায় যখন তাঁর আদরের কন্যার সঙ্গে রসুলুল্লাহ্‌র বিবাহের সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি খুশীই হলেন। মন্তব্য করলেন, এমন এক সম্ভ্রান্ত সম্পর্ক যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আবু সুফিয়ান একথা ভেবেও পুলকিত বোধ করলেন যে, রামলা নিশ্চয়ই মোহাম্মদকে প্রভাবিত করতে পারবে। কারণ সে রূপবতী। আবু সুফিয়ান এরকম কথা বলেও বেড়াতেন সকলের কাছে। বলতেন, আমার তো মনে হয় উম্মে হাবীবা আরবের সেরা সুন্দরী, শ্রেষ্ঠ রূপসী।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির একটি ধারা ছিলো এরকম— আরবের গোত্রগুলো তাদের পছন্দমতো যে কোনো পক্ষে (মুসলমান অথবা কাফের) যোগ দিতে পারবে। এমতোক্ষেত্রে ধর্ম-অধর্মের কথা আসবে না। এরকম ঘোষণা দেওয়ার ফলে বহুসংখ্যক জনপদের লোকেরা দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। এভাবে সকলে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানকে মেনে নেয়।

খুজআ গোত্র বাস করতো মক্কার সন্নিকটে। কিন্তু তারা যোগ দিয়েছিলো মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে। কাফের কুরায়েশরা হঠাৎ একদিন তাদেরকে আক্রমণ করে বসে। তারা সাহায্য চেয়ে পাঠায় মিত্রশক্তি মুসলিমবাহিনীর কাছে। কুরায়েশরা ভুল বুঝতে পারে। আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, চুক্তিভঙ্গের কারণে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় কিনা। আবু সুফিয়ান ভাবেন মদীনায় গিয়ে এর একটা বিহিত করতেই হবে। চুক্তির এই ধারাটি হয় বদলাতে হবে, নয়তো আশ্বস্ত করতে হবে এই মর্মে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম হবে না। অন্য কোনো অসুবিধাও তো নেই। তিনি তো গিয়ে উঠবেন তাঁর কন্যাগৃহে। কন্যার কোনো সুপারিশ কি তিনি পাবেন না?

মদীনায় পৌঁছে তিনি প্রথমে প্রবেশ করলেন কন্যার ঘরে। হজরত উম্মে হাবীবা তাঁকে স্বাগত জানালেন ঠিকই, কিন্তু বসতে বললেন না। তিনি নিজেই বিছানায় বসতে গেলেন। হজরত উম্মে হাবীবা সঙ্গে সঙ্গে বিছানা গুটিয়ে নিলেন। বিস্মিত হলেন আবু সুফিয়ান। বললেন, বিছানা গুটিয়ে নিলে কেনো? আমি কি বিছানার উপযুক্ত নই, না বিছানা আমার উপযুক্ত নয়। হজরত উম্মে হাবীবা একটুও বিব্রত না হয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, পিতা! আপনি মুশরিক, অপবিত্র। আপনাকে আমি রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র শয্যায় উপবেশন করতে দিতে পারি না। আবু সুফিয়ান বিস্মিত হলেন। রাগত স্বরে বললেন, আমাকে পরিত্যাগ করার পর থেকে তোমার মধ্যে অনেক মন্দ স্বভাব ঢুকেছে। একথা বলেই তিনি মহানবী স. এর কাছে গিয়ে বসলেন।

খায়বর থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে এসেই মহানবী স. তাঁর নতুন স্ত্রীর সঙ্গে বাসর যাপন করেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁরা একে অপরের ঘনিষ্ঠতর হতে থাকেন। ভালোবাসা, উপাসনা ও দায়িত্ববোধ এই নিয়ে আবর্তিত হতে থাকে তাঁদের পৃথিবীপ্রসক্তিহীন সংসার। আবিসিনিয়ার দাসী আবরাহার কথাও তিনি ভুলেননি। মহানবী স. এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তাঁর কথা বলেছিলেন। তিনি স.ও দূরবর্তী ওই বিশ্বাসিনীর সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, ওয়া আ'লাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তাঁর মেয়ে হাবীবা এবং ছেলে আবদুল্লাহ্‌ মহানবী স. এর গৃহেই বড় হতে থাকেন। পরে হাবীবার বিয়ে হয় সাকিফ গোত্রের এক বড় নেতার সঙ্গে।



রসুলপ্রেমে পূর্ণ নিমজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণ বিশ্বাসবান অথবা বিশ্বাসবতী হতে পারে না। আর এ কথা উল্লেখ না করলেও চলে যে, মহানবী স. এর সকল জীবনসঙ্গিনীই ছিলেন তাঁর প্রেমে আসক্তা নিমজ্জিতা। মহানবী স. এর সর্বক্ষণের ভাবনা, বেদনা, মনোভাব ও স্বভাব সারাক্ষণ দ্যুতি বিকিরণ করতো তাঁদের কথায়, কর্মে ও অভিব্যক্তিতে।

মহানবী স. এর প্রতিটি কথা তাঁরা আত্মস্থ করতেন। বিবরণ দিতেন তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তির। এভাবে গড়ে উঠতো ধর্মবিধানচর্চার এক আলোকিত পৃথিবী।

৬৫টি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি। তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের মধ্যে সাহাবী ও সাহাবীয়া যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন অনেক প্রথিতযশা তাবেয়ীনও। উল্লেখ্যজনদের মধ্যে রয়েছেন— হজরত হাবীবা (কন্যা), হজরত মুয়াবিয়া, উতবা (আবু সুফিয়ানের দুই ছেলে), আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সাকাফী, সালেম ইবনে সাওয়ার, আবুল জাররাহ, সাফিয়া বিনতে শায়বা, যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা, ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, আবু সালেহ আস-সাম্মান, শাহর ইবনে হাওশাব, আনবাসা, শুতাইব, ইবনে সাকাল, আবুল মালীহ, আমের আল হুজালী প্রমুখ।

ইসলামের জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্য হিজরত করতে পশ্চাৎপদ হননি। স্বজন-বন্ধনহীন বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়েও শান্তি পাননি। দুটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে হয়েছিলেন দিশাহারা। তবুও ধৈর্যচ্যুত হননি। আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতার কারণে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে দুনিয়া আখেরাতে উভয় জগতে দিয়েছেন প্রভূত সম্মান। করে দিয়েছেন বিশ্বাসী জনতার মহাসম্মানিতা ও মহাপুণ্যবতী মা— জননী।

ইমান ও অংশীবাদিতার পার্থক্য কী ধরনের তা তিনি কতো সুন্দর ও সঠিক ভাবেই না বুঝেছিলেন। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন 'ইন্‌নামাল মুশরিকূনা নাজাসুন' (নিশ্চয় অংশীবাদীরা অপবিত্র)। তিনি পিতার প্রতিও এতোটুকু দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, মুশরিকেরা অপবিত্র। পিতৃসম্পর্ক মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ইমান ও কুফর। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস। মানুষের সঙ্গে মানুষের মূল চিরস্থায়ী সম্পর্ক নির্ণীত হতে হবে এই নিরিখেই।

মহানবী স. এর কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। উল্লেখ্য, মক্কাবিজয়ের পর তাঁর পিতা গোত্রপতি আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও দেখা গেলো, তিনি মহানবী স. এর নির্দেশ অনুসারে আমল করছেন। তিন দিন শোক পালন করেছিলেন তাঁর জন্য। তারপর সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে কপালে মাখতে মাখতে বলেছিলেন, আমি রসুলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, এমন নারী স্বামী ছাড়া অন্যদের জন্য শোক করতে পারবে তিন দিন। কেবল স্বামীর জন্য চল্লিশ দিন।

একবার তিনি রসুলুল্লাহ্কে বলতে শুনলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। জননী উম্মে হাবীবা বলেন, ওই কথা শোনার পর থেকে আমি প্রতিদিন বারো রাকাত করে নফল নামাজ পড়ি। উল্লেখ্য, তাঁর অনুসরণে ওই নামাজ পড়তেন অনেকে। যেমন— তাঁর ছাত্র ও ভাই উতবা, উতবার ছাত্র আমর ইবনে উওয়াইস এবং আমরের ছাত্র নোমান ইবনে সালেম প্রমুখ।

একবার তিনি মহানবী স.কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। তিনি স. বললেন, তুমি কি এরকম পছন্দ করো। তিনি বললেন, কেনো করবো না। যা উত্তম, তা আমি আমার বোনের জন্য চাইতে পারবো না কেনো? বলাবাহুল্য, মহানবী স. এরকম করেননি। কারণ, তা ধর্মসম্মত ছিলো না।

আল্লামা জাহাবী তাঁর মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, বংশীয় নৈকট্যের দিক থেকে মহানবী স. এর অন্য কোনো স্ত্রী হজরত উম্মে হাবীবার চেয়ে অগ্রগামিনী ছিলেন না। অন্য পবিত্র স্ত্রীগণের মোহরানাও এতো বেশী ধার্য করা হয়নি। আর মহানবী স. এভাবে অনেক দূরদেশে থেকেও কাউকে বিবাহ করেননি।



আনন্দ ও বেদনা— পৃথিবীতে কোনোটাই স্থায়ী হয় না। বিশ্বাস ও ভালোবাসার অনন্ত আনন্দ নিয়ে আর্ভিভূত হয়েছিলেন শেষ ও শ্রেষ্ঠ রসুল মহাবিশ্বের মহামমতার অপার পারাবার হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জেগে উঠেছিলো সুবর্ণ আলোর জোয়ার।

সুসজ্জিত ও সুবাসিত হয়েছিলো পথ-প্রান্তর-পৃথিবী। মহাসত্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে জীবন, সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করতে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তাঁর সহচরবৃন্দ। ভেবেছিলেন, ত্যাগের মহিমা প্রচারের সংঘর্ষ ও শান্তিময় এই আনন্দোৎসব কোনোদিন শেষ হবে না। প্রিয়তম রসুল তাঁদেরকে কখনোই ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু তা তো হলো না। তিনি তো চলেই গেলেন। বলে গেলেন, দুঃখ না করতে। সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, সকলের পৃথিবীর পরমায়ু এক সময় শেষ হবেই। মহামিলন সংঘটিত হবে ওই সময়েই। যতোদিন তা না হয়, ততোদিন একনিষ্ঠ ইবাদত সুসম্পন্ন করে যেতে হবে। আর পালন করে যেতে হবে সত্যধর্ম ইসলামের প্রচার দায়িত্ব।

চলে গেলেন প্রেমের মহাসম্রাট। আকাশ কাঁদলো। বাতাস কাঁদলো। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-নিহারিকা, নিসর্গের সকল মোড় ও মহল্লা ভরে গেলো শোকে ও রোদনে। রসুলশূন্য মদীনার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হলো বিষাদময়, বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত। হজরত বেলাল আর আজান দিতে পারলেন না। মনের দুঃখে মদীনা ছেড়ে গেলেন।

তুফান কবলিত নিমজ্জমান তরীর হাল ধরলেন সর্বঘনিষ্ঠ রসুল-সহচর হজরত আবু বকর। আল্লাহ্‌র বাণী আবৃত্তি করে শোনালেন। মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়ে সবাইকে দায়িত্বসচেতন করে রাখতে সক্ষম হলেন। সকলে সম্বিত ফিরে পেলেন। সুকঠিন বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইলো না।

উম্মতজননীগণও তাঁদের বিরহবিধুরতাপিষ্ঠ অস্তিত্বকে পরিধান করালেন ধৈর্যের পোশাক। বুঝলেন, শেষ ডাক আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদেরকে এই পরিচ্ছদেই সতত আবৃত থাকতে হবে। যাত্রার সময় তো সুনির্ধারিত। সে অমোঘ নিয়মের এতোটুকুও অগ্র-পশ্চাৎ হয় না।

তাঁদের অপেক্ষার অবসান হতে থাকে। ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকেন মমতাময়ী, মর্যাদাময়ী ও মহাপুণ্যবতী মাতা মহোদয়াগণ। প্রথমে জননী যয়নাব বিনতে জাহাশ। তারপর একে একে অন্যরা।

জননী উম্মে হাবীবাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। তাঁর সৎ ভাই আমীর মুয়াবিয়া রা. তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। হিজরী ৪৪ সন। উম্মে হাবীবা বুঝতে পারলেন, মহামিলনের সময় সন্নিকটবর্তী। পেছনে দৃষ্টিপাত করলেন ক্ষণকালের জন্য। ৩৬ বৎসর বয়সে বক্ষলগ্না হয়েছিলেন মহাসৃষ্টির সুন্দরতম পুরুষের। এখন বয়স ৭৩।

তিনি হজরত আয়েশা এবং হজরত উম্মে সালমাকে শয্যাপাশে ডাকলেন। তাঁরা এলেন। অন্তিম পথযাত্রী সুন্দর সপত্নীটির দিকে তাকালেন। হজরত উম্মে

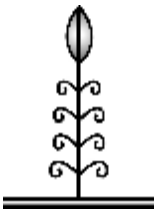
হাবীবা বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমি তো সেরকম আচরণই করেছি, যেরকম করেছো তোমরা। সপত্নীদের মধ্যে এরকম তো হয়েই যায়। এখন আমার চলে যাবার সময়। তোমরা আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। তাঁরা দোয়া করলেন, জননী উম্মে হাবীবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন, তোমরা আমাকে খুশী করেছো। আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে খুশী করুন।

চলে গেলেন শেষ উম্মতের মমতাময়ী মা-জননী। গোসল শেষে জানাযা প্রস্তুত করা হলো। জানাযার নামাজ পড়ালেন মদীনার প্রশাসক মারওয়ান। তাঁকে কবরে নামালেন তাঁর ভাই ও বোনের ছেলেরা।

অনেক পরের ঘটনা। ইমাম যয়নাল আবেদীন একবার মদীনায় এলেন। তাঁদের বাড়ী ছিলো বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত। তিনি বলেন, কী মনে করে আমি আমাদের বাড়ির একটা কোণ খনন করলাম। পেলাম একটি শিলালিপি। তাতে লেখা— এটা রামলা বিনতে সাখরের কবর।

সাখর ছিলো তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের আসল নাম। আর তার আসল নাম রামলা। সুতরাং ইমাম যয়নাল আবেদীনের এই বিবরণটির মাধ্যমে জানা যায়, জননী উম্মে হাবীবাকে সমাহিত করা হয়েছিলো তাঁর পিতামহ হজরত আলী রা. এর গৃহাঙ্গণে।

হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে বনী নাজির গোত্রের ইহুদীরা খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। স্থানটি ছিলো বৃষ্টিপ্রধান এবং বাগবাগিচাময়। জনপদটি মদীনা থেকে প্রায় দুই শত মাইল পূর্বে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে তারা নিকটবর্তী গাতফান জনপদবাসীদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলো। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগলো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। ইসলামের অন্য শত্রুরাও সেখানে আনাগোনা শুরু করে দিলো। খন্দকের যুদ্ধেও তারা ছিলো ইসলামের শত্রুপক্ষের সক্রিয় সমর্থক।

মহানবী স. যথাসময়ে তাদের ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ পেলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, খায়বরে পৌঁছে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। নয়তো তাদের ষড়যন্ত্র থামবে না। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তিনি স. যুদ্ধাভিযানের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন। ঘোষণা শুনে সাহাবীগণ বিপুলভাবে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হলেন। এই ভেবে সকলে আনন্দিত ও উল্লসিত হলেন যে, এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আক্রমণাত্মক একটি অভিযান।

মহানবী স. তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে অনেক দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে যখন খায়বরে উপনীত হলেন, তখন চরাচর জুড়ে নেমে এসেছে রাত্রি। খায়বরবাসীরা তাঁর আগমনের কথা জানতে পারলো না। সকালে দলে দলে যখন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো, তখন বিশাল মুসলিমবাহিনী দেখে খুবই আতঙ্কিত হলো। পশ্চাদপসরণ করে ঢুকে গেলো দুর্গমধ্যে।

অনেকগুলো দুর্গ ছিলো সেখানে। আর সেগুলো ছিলো সারিবদ্ধ ও গুপ্তপথ দ্বারা পরস্পরযুক্ত। মুজাহিদ বাহিনী প্রথম দিকে তেমন সুবিধা করতে পারলো না। কারণ দুর্গগুলো ছিলো সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য। পরে একে একে দুর্গগুলোর পতন ঘটতে থাকে। মুসলিম সেনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী শহীদ হন।

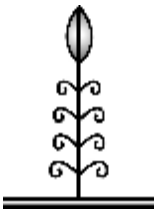
সবচেয়ে বড় দুর্গের নাম ছিলো কামুস। প্রায় বিশ রাত অবরুদ্ধ থাকার পর দুর্গটির পতন ঘটে বীরশ্রেষ্ঠ হজরত আলীর হাতে। অনেক ইহুদীর সঙ্গে ইহুদীদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব ও তার কন্যার জামাতা নিহত হয়। বন্দী করা হয় পরাভূত পুরুষ-রমণীদেরকে। বন্দিনী হন হুয়াইকন্যা যয়নাব। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই চাচাতো বোনও বন্দিনী হয়।

হুয়াই নন্দিনীর যয়নাব নামটি পরে হারিয়ে যায়। তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন সাফিয়া নামে। কারণ মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও দাস-দাসী) বণ্টনের সময় তিনি পড়েন মহানবী স. এর অংশে। তখনকার আরবের রীতি অনুসারে প্রধান নেতা বা রাজার অংশের মালে গণিমতকে বলা হতো সাফিয়া। আর সেই হিসেবে তাঁর নাম হয়ে যায় সাফিয়া। মহানবী স.ও তাঁকে এই নামেই ডাকতেন।

হজরত সাফিয়ার পিতা ও নানা ছিলেন ইহুদীদের সম্ভ্রান্ত দুই গোত্র— বনী নাজির ও বনী কুরায়জার মহামান্য নেতা। বনী নাজিরের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের নির্দেশ ও নেতৃত্বকে তাঁর গোত্রের লোকেরা বিনাবাক্যে মেনে নিতো। আর তিনি ছিলেন নবী হারুনের বংশধর।

তাঁর মাতার নাম ছিলো বাররা। তিনি ছিলেন বনী কুরায়জা অধিপতি সামাওয়ানের কন্যা।

হজরত সাফিয়ার প্রথম বিবাহ হয় বনী কুরায়জার নেতা ও বিখ্যাত কবি সালাম ইবনে মাশকামের সঙ্গে। কিন্তু ওই বিবাহবন্ধন অল্পদিনের মধ্যে ছিন্ন হয়ে যায়। পরে বিবাহ হয় আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও খায়বরের এক নেতা আবু রাফের ভ্রাতুষ্পুত্র কিনানা ইবনে আবুল হুকাইকের সঙ্গে। কিনানাও ছিলো বড় কবি এবং বিশাল কামুস দুর্গের নেতা। কামুস দুর্গের মধ্যেই মুসলিমবাহিনীর হাতে সাঙ্গ হয় তার জীবনলীলা।



মালে গনিমত বণ্টনপর্ব শুরু হলো। মহানবী স. এর ভাগে পড়লেন হজরত সাফিয়া ও তাঁর এক সহচরী। হজরত বেলাল তাঁদেরকে নিয়ে এলেন ওই পথ দিয়ে, যে পথের পাশে পড়ে আছে বনী নাজিরের নেতা ও জনতার রক্তাক্ত ও বীভৎস মরদেহ। তাই মহানবী স. প্রথমেই হজরত বেলালকে ভর্ৎসনা করে বললেন, বেলাল! তোমার অন্তরে কি মায়াদয়া নেই। তুমি তো অন্য পথেও

তাদেরকে নিয়ে আসলে পারতে। তাদের মৃত পিতা-ভ্রাতাদের লাশের পাশ দিয়ে না আনলেও তো পারতে।

হজরত সাফিয়ার সহচরীটি মহানবী স.কে দেখে চীৎকার শুরু করলো। নিজের মুখে নিজেই ধূলোবালি মাখতে লাগলো। আঘাত করতে লাগলো তার নিজের শরীরে। মহানবী স. বললেন, এই শয়তানীটিকে এক্ষুণি এখান থেকে নিয়ে যাও। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

ইত্যোবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত দাহিয়া কালাবী রা.। বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। মহানবী স. বললেন, যাকে পছন্দ হয় নিয়ে যাও। তিনি হজরত সাফিয়াকে পছন্দ করলেন। সেখানে উপস্থিত জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! বনী নাজির ও বনী কুরায়জার সর্বজনমান্য নেতার কন্যাকে তো কেবল আপনার জন্যই মানায়। মহানবী স. বললেন, ঠিক আছে। একে রেখে দাও। দাহিয়া! তুমি অন্য কোনো বন্দিনীকে নিয়ে যাও।

মহানবী স. এবার হজরত সাফিয়ার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন। নির্দেশ দিলেন, একে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যাও। নির্দেশ পালিত হলো। তিনি স. তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলেন। সাফিয়া তাঁকে দেখে দাঁড়ালেন। উঁচু একটি স্থানে বিছানা বিছিয়ে দিলেন। মহানবী স. সেখানে বসলেন। সাফিয়া বসলেন মাটিতে। তিনি স. বললেন, তোমার পিতা সবসময় আমার সাথে শত্রুতা করতো। শেষে আল্লাহ্‌ই চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিলেন। সাফিয়া বললেন, আল্লাহ্‌ তাঁর এক বান্দার পাপের জন্য অন্য বান্দাকে শাস্তি দেন না। তিনি স. বললেন, তুমি স্বাধীন। চলে যেতে পারো। অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে পারো। ইচ্ছা করলে হতে পারো আমার জীবনসঙ্গিনী।

হজরত সাফিয়া ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও ধীরস্থির স্বভাবের। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আগে থেকেই আপনাকে বিশ্বাস করি। এখন তো লাভ করলাম আপনার পবিত্র দীদার। আমি মুগ্ধ, স্বাধীনভাবে আপনি আমাকে আমার মতামত ব্যক্ত করতে বললেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলকে চাই।

মহানবী স. তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। আর তাঁর মুক্তিকে নির্ধারণ করলেন মোহরানা। তারপর তাঁকে পাঠালেন হজরত আনাস রা. এর মা উম্মে সুলাইমের তত্ত্বধানে।

এবার নতুন বধূ এবং বিজয়ীবাহিনী নিয়ে মদীনার পথ ধরলেন মহানবী স.। সাহবা নামক স্থানে পৌঁছে থামলেন। সেখানে হজরত উম্মে সুলাইম নতুন বধূর কেশবিন্যাস করে দিলেন। তাঁকে সাজালেন। রাতে পাঠালেন মহানবী স. এর তাঁবুতে। সেখানেই অতিবাহিত হলো নতুন বর-বধূর বাসর রজনী।

সারারাত কোষমুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে পাহারা দিলেন হজরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.। মহানবী স. পরদিন একথা জানতে পারলেন। তাঁকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এরকম করলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! এ মহিলার পিতা, স্বামী, ভাই ও নিকটজনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছিলো, তাঁর গোত্রের লোকেরা খারাপ কিছু করে বসে কিনা। তাঁর কথা শুনে মহানবী স. মৃদু হাসলেন। তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

মহানবী স. লক্ষ্য করলেন, সাফিয়ার চোখের পাশে একটি সবুজ দাগ। জিজ্ঞেস করলেন, দাগটি কিসের? তিনি বললেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি পূর্ণ আলোকিত চাঁদ আমার কোলে এসে পড়লো। সকালে কিনানাকে স্বপ্নটির কথা জানালাম। সে ভীষণ রাগ হলো। আমার মুখে খুব জোরে থাপ্পড় মেরে বললো, আরবের বাদশাহ্‌কে চাও, না? এ দাগ সেই আঘাতের।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, সকালের দিকে আমরা রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। এক সময় তিনি স. বললেন, তোমরা এখন তোমাদের মায়ের কাছ থেকে ওঠো। সন্ধ্যায় আবারও সেখানে গেলাম। তিনি স. তাঁর চাদরের মধ্য থেকে প্রায় দেড় মুদ পরিমাণ খেজুর বের করে বললেন, তোমরা তোমাদের মায়ের ওলীমা খাও।

বড় আকারের ওলীমাও তখন করা হয়েছিলো। এভাবে মহানবী স. নির্দেশ দিলেন, তোমাদের যার কাছে যা আছে, নিয়ে এসো। সকলে খেজুর, ঘি, পনির, আটা ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলেন। সেগুলোকে একত্র করে বানানো হলো হায়স (খিচুঁড়ি)। পরিমাণ বেশী ছিলো না। তৎসত্ত্বেও ওই খাদ্য সকলে আহার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। নিঃসন্দেহে ওটি ছিলো মহানবী স. এর মোজেযা। মহানবী স. সাহবায় তিন দিন অবস্থান করলেন।

চতুর্থ দিনে যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। যাত্রার সময় মহানবী স. এর হাঁটুর উপরে পা রেখে উঁটের উপরে উঠতে হলো হজরত সাফিয়াকে। কাফেলা চলছে। সকলের মনে বিজয়ের আনন্দ। নতুন জননী প্রাপ্তির প্রশান্তি। সেই অনাবিল পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি প্রকাশ পাচ্ছে অশ্ব-উষ্ট্রী-অশ্বতরগুলোর পদবিক্ষেপের ছন্দে। মরুভূমির পথে-প্রান্তরে, লু হাওয়ায়, সুমন্দ বাতাসে। পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক রাতের স্নিগ্ধতা ও দিনের উত্তাপ।

হঠাৎ মহানবী স. এবং হজরত সাফিয়াকে বহনকারী উটটি হোঁচট খেলো। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন দু'জনেই। হজরত আবু তালহা নিকটেই ছিলেন। তিনি তাঁর বাহন থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! ব্যথা পাননি তো? তিনি স. নিজে নিজে উঠতে চেষ্টা করলেন। বললেন, না। তুমি ওর দিকে দ্যাখো। হজরত আবু তালহা কাপড়ে মুখ ঢেকে জননীর দিকে এগিয়ে

গেলেন। তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন এক খণ্ড কাপড়। ওই কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন হজরত সাফিয়া। না। ভাবনার কিছু নেই। দু'জনেই রয়েছেন অক্ষত অবস্থায়।

হজরত আবু তালহা নিজের উটটি প্রস্তুত করলেন। তার উপরে ওঠালেন মহানবী স. ও হজরত সাফিয়াকে। কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। আবার পশুদের ক্ষুরের আঘাতে মৃদু-উষ্ণ শব্দে উত্থিত হতে লাগলো বালি ও প্রস্তরকণার আওয়াজ। নিকট, নিকটতর হতে লাগলো মদীনার মায়াবী মাটির সুবাস।

মসজিদসংলগ্ন কোনো প্রকোষ্ঠ শূন্য ছিলো না বলেই হয়তো মহানবী স. হজরত সাফিয়াকে নিয়ে গেলেন সাহাবী হারেছ ইবনে নোমানের বাড়িতে। গৃহকর্তা ছিলেন সচ্ছল ও বিত্তবান। তিনি তাঁর বাড়ির সবচেয়ে ভালো কক্ষটি হজরত সাফিয়ার জন্য ছেড়ে দিলেন। এরকম বিরল খেদমতের সুযোগ পেয়ে ধন্য হলেন।

মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জানালেন অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। বধূবরণ ও দর্শনের জন্য সেখানে হাজির হলেন অনেক আনসার রমণী। সকলের কাছে এই কথাটি প্রচার হয়ে গিয়েছিলো যে, হুয়াইদুহিতা সাফিয়া অসামান্য রূপবতী। তাই কৌতূহল নিবারণের জন্য এবং স্বচক্ষে কন্যাদর্শনের জন্য মদীনাবাসিনীগণ সেখানে ভিড় না জমিয়ে পারলেন না।

উম্মতজননীদের মধ্যে এলেন হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ, হজরত হাফসা ও হজরত জুওয়াইরিয়া। আর হজরত আয়েশা এলেন চাদরে মুখ ঢেকে, যাতে তাঁকে কেউ চিনতে না পারে। মহানবী স. তাঁকে ঠিকই চিনতে পারলেন। ফেরার সময় পিছু নিলেন তাঁর। মুখের আবরণ সরিয়ে বললেন, হোমায়রা! সাফিয়াকে কেমন দেখলে? হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, কী আর দেখবো? দেখলাম এক ইহুদিনীকে। মহানবী স. বললেন, এরকম বলছো কেন? সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। হয়েছে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসিনী।

মহানবী স. এর অসীম ভালোবাসার সমুদ্রে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হলেন হজরত সাফিয়া। বদলে গেলেন যেমন বদলে যান বিশুদ্ধচিত্ত নবীপ্রেমিকেরা। তিনি যেমন সবাইকে ভালোবাসেন, তেমনি তিনি ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করেন সকলের সঙ্গে। হাদিয়া, উপহার আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতি ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, একথা তিনি জানেন। চেষ্টাও করেন এরকম আমল করতে।

মহানবী স. এর কলিজার টুকরা হজরত ফাতেমাতুয্ যাহরাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন হজরত সাফিয়া । পরম স্নেহের নিদর্শন হিসেবে তাঁকে উপহার দিলেন নিজের কানের একজোড়া দুল। এরকম উপহার তিনি দিলেন তাঁর সপত্নীদেরকেও। আনসারী মহিলাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর কাছে আসা যাওয়া করেন, তাঁদেরকেও।

ভালো রান্না জানতেন। মহানবী স. তাঁর রান্না পছন্দও করতেন নিশ্চয়। কখনো এমন হতো, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা অথবা অন্য কোনো মুমিন রমণীর সঙ্গে রাত্রি যাপনের সময় তিনি তাঁর স. কাছে নিজ হাতে রান্না করা খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

ছিলেন কুসুমের চেয়ে কোমল মনের অধিকারিণী। 'ইহুদিনী' বলে কটাক্ষ করলে কষ্ট পেতেন। একবার মহানবী স. তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আয়েশা ও যয়নাব বলে, তারা আপনার অন্য স্ত্রীদের চেয়ে উত্তমা। কারণ, তারা আপনার স্ত্রী হওয়া ছাড়াও আপনার নিকটাত্মীয়া। মহানবী স. বললেন, আবার যদি এরকম বলে, তবে তুমিও বোলো, আমার পিতৃপুরুষ নবী হারুন, পিতৃব্যপুরুষ নবী মুসা, আর আমার স্বামী মোহাম্মদ।

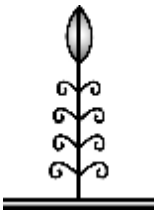
একদিন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা অভিমানভরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাফিয়াইতো আপনার সব। কিন্তু সে তো এরকম এরকম। এরকম বলে তিনি ইঙ্গিতে বোঝালেন হজরত সাফিয়া খর্বাকৃতিবিশিষ্ট। মহানবী স. বললেন, হে আয়েশা! তোমার একথা যদি সাগরে নিক্ষেপ করা যায়, তবে সাগরের পানিও বিবর্ণ হয়ে যাবে।

একবার মহানবী স. রমজান মাসে মসজিদে ইতেকাফ করছেন। হজরত সাফিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কিছুক্ষণ উপবেশন করলেন। কিছু কথাবার্তা বললেন। ফেরার সময় মহানবী স. তাঁকে হজরত উম্মে সালমার ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। দুজন আনসারী সাহাবী সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে শুনিয়ে মহানবী স. বললেন, এ হচ্ছে সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বলে উঠলো, সুবহান আল্লাহ্! আল্লাহু আকবর। মহানবী স. বললেন, শয়তান মানুষের রক্তপ্রবাহের মধ্যে চলাচল করতে পারে। সে তোমাদের অন্তরে খারাপ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে (তাকে সে সুযোগ দিলাম না)।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর মান অভিমানও হঠাৎ কখনো দেখা যেতো দু'জনের মধ্যে। তখন বিমর্ষমনা রসুলের পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তিনি কষ্ট পেতেন খুব। নিজেই অগ্রগামিনী হয়ে মহানবী স.কে তুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। অবশ্য এরকম ঘটনা কেবল একবারই ঘটেছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিষয়টি মিটিয়ে ফেললেন এভাবে— হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, তুমি তো জানোই নিজের পালা কেউ কখনো অন্যকে দেয় না। আজ আমার পালার রাত তোমাকে দিলাম এই শর্ত যে, তুমি রসুলুল্লাহ্‌কে আমার প্রতি প্রসন্ন হতে বলবে। হজরত আয়েশা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। রাতে ঘরে ঢুকে হজরত সাফিয়ার স্থলে হজরত আয়েশাকে দেখে মহানবী স. বললেন, আজ তো তোমার পালার রাত

নয়। কীভাবে পেলে? হজরত আয়েশা সে রাতে একটু অতিরিক্ত সাজগোজ করেছিলেন। জাফরান রঙে রঞ্জিত একটি সুবাসিত ওড়না দ্বারা মাথায় টেনে দিয়েছিলেন ঘোমটা। মহানবী স. এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী তাকে দান করেন'। এরপর তিনি সবকথা খুলে বললেন। মহানবী স. সবশুনে হজরত সাফিয়ার প্রতি খুবই খুশী হয়ে গেলেন।

দশম হিজরীতে মহানবী স. যখন হজ্বযাত্রা করলেন, তখন তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীর সঙ্গে হজরত সাফিয়াও ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁকে বহনকারী উটটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। হজরত সাফিয়া ভয়ে ও দুঃশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়লেন। কাঁদতে শুরু করলেন। খবর পেয়ে তিনি স. হজরত সাফিয়ার কাছে গেলেন। নিজের হাতে তাঁর চোখের পানি মুছে দিলেন। কিন্তু তাঁর কান্না থামলো না। বরং আরো বেড়ে গেলো। উপায়ন্তর না দেখে মহানবী স. যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যার সময় হজরত যয়নাবকে বললেন, জাহাশপুত্রী! তোমার তো অতিরিক্ত উট আছে। তুমি সাফিয়াকে একটা উট দাওনা। হজরত যয়নাব বললেন, আমি উট দিবো? ওই ইহুদিনীকে? তার এরকম কথা শুনে মহানবী স. রুষ্ট হলেন। দুই অথবা তিন মাস তাঁর সঙ্গে বাক্যলাপ করলেন না। পরে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মধ্যস্থতায় বিষয়টির একটি সুন্দর সুরাহা হয়ে যায়।



মহানবী স. এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের মতো হজরত সাফিয়াও ছিলেন এলেম ও মারেফতের কেন্দ্র। তাঁর গৃহাঙ্গনে জ্ঞানপিপাসুদের ভীড় লেগেই থাকতো। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতো তারা। জবাব পেয়ে পরিতুষ্ট হতো। সুহায়রা বিনতে হায়বার নামের এক মহিলা একবার হজ্ব সমাধা করার পর মদীনায় উপস্থিত হলেন। সেখানে মুমিনজননী হজরত সাফিয়ার কাছে যখন গেলেন, তখন দেখতে পেলেন, কুফা থেকে আগত বহু মহিলা সেখানে বসে আছে। তারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। আর তিনি সেগুলোর জবাব দিয়ে যাচ্ছেন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায়। সুহায়রাও ওই মহিলাদের মাধ্যমে নাবীজ (ফলের রস) সর্ম্পকে জানতে চাইলেন। হজরত সাফিয়া যথাজবাব দিলেন। বললেন, ইরাকীরা প্রায়শঃ এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে।

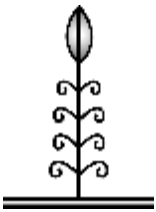
হজরত সাফিয়া থেকে দশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম যয়নাল আবেদীন, ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেছ, মুসলিম ইবন সাফওয়ান, কিনানা, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াত্তাব প্রমুখ।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ হজরত সাফিয়ার অনেক প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার বলেছেন, মাতা মহোদয়া সাফিয়া ছিলেন ধৈর্যশীলা, বুদ্ধিমতী ও বিদুষী। ইবনুল আসীর বলেছেন, তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী। আল্লামা জাহাবী বলেছেন, মাননীয়া মাতা হজরত সাফিয়া ছিলেন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশদ্ভূতা, রূপবতী ও ধর্মপরায়ণা। মহানবী স, এর হৃদয়ের রাণী তিনি হয়েছিলেন অল্প বয়সে। তিনি নিজে বলেছেন, রসুলুল্লাহ্র ঘরে যখন আমি আসি তখন আমার বয়স সতেরো পূর্ণ হয়নি। উল্লেখ্য, তাঁর সেই সুগভীর প্রেমভালোবাসার সংসার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র তিন বছর চার মাস ছিলেন মহানবী স. এর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ।

বিদায় হজ্ব সমাপন করার পর মহানবী স. কেমন যেনো হয়ে গেলেন। পৃথিবীর দিকে আগের মতো দৃষ্টিপাত করেন না। দিবস-রজনীর অধিকাংশ সময় উন্মুখ হয়ে থাকেন কেবল তাঁর প্রতি, যাঁর প্রেম ও সন্তোষ কামানায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন জীবন-সম্পদ-সময়। প্রচার করেছেন মহাসত্যের বাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। সেই মহাবাণী এখন উচ্চারিত হচ্ছে মানুষের মুখে, মনে ও অস্তিত্বে। ক্রমপ্রসারমান হচ্ছে সত্যের অক্ষয় আলোকরশ্মি মানুষের সকল মোড়ে, মহল্লায়, জটলায়, দেশে দেশে। যাদেরকে তিনি আলোকিত করেছেন, আলো বিতরণ করার দায়িত্ব এখন তাদের। আল্লাহ্র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল এখন আলিঙ্গন করবেন মহাপ্রস্থানকে। মহামিলনকে।

প্রথমে মাথাযন্ত্রণা। তারপর অন্যান্য উপসর্গ। মহানবী স. শয্যাগ্রহণ করলেন। একদিন একান্তে পেয়ে হজরত সাফিয়া জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র সর্বশেষ রসুল! আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণের আত্মীয়স্বজন আছে। আমার তো কেউ নেই। আপনি যদি চলে যান, তবে আমি কার আশ্রয়ে থাকবো? মহানবী স. জবাব দিলেন, আলীর আশ্রয়ে।

মহানবী স. এর এতোটুকু কষ্টও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতেন। তিনি স. যখন চলচ্ছক্তিরহিত এবং যখন শেষ অবস্থান গ্রহণ করেছেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রকোষ্ঠে, তখন তীব্র মনোকষ্টে অধীর হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আল্লাহ্র শপথ! আপনার রোগযন্ত্রণা যদি আমাকে দেওয়া হতো। একথা শুনে উম্মতজননীগণের কেউ কেউ মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। তাঁদের সকল দ্বিধা-সন্দেহের অবসান ঘটালেন মহানবী স.স্বয়ং। বললেন, আল্লাহ্র শপথ! সাফিয়া সত্যবাদিনী।



ইসলামী রাজ্যের প্রথম খলিফা হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। দুই বৎসরের কিছু অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনিও চলে গেলেন নেপথ্যে— মহানবী স. এর একান্ত সন্নিধানে। দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন হজরত ওমর ফারূক। তিনি সকল উম্মতজননীদের জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন— সকলের জন্য বারো হাজার দিরহাম, আর হজরত জুওয়াইরিয়া ও হজরত সাফিয়ার জন্য ছয় হাজার করে। যুক্তি দেখালেন, অল্পকিছু সময়ের জন্য হলেও একদা তাঁরা ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী সূত্রে দাসী। বলাবাহুল্য, হজরত ওমরের ওই যুক্তি ধোপে টিকেনি। বনী ইসরাইল কুলোদ্ভূতা জননীদ্বয় তাঁর এমতো নির্ধারণকে প্রত্যাখ্যান করলেন। হজরত ওমর মেনে নিলেন তাঁদের যথার্থ দাবী। প্রত্যেক উম্মতজননীর জন্যই নির্ধারণ করলেন একই রকম— বারো হাজার।

হজরত সাফিয়ার এক দাসী একবার এই মর্মে খলিফা ওমরের কাছে নালিশ করলো যে, এখনও তাঁর মধ্যে ইহুদী স্বভাব আছে। তিনি এখনও সর্বাধিক সম্মানিত দিন হিসেবে শনিবারকে মানেন, আর ইহুদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন। হজরত ওমর দাসীর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য জননীগৃহে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠালেন। তার মুখে সব শুনে জননী মহোদয়া জবাব দিলেন আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের কল্যাণে শনিবারের পরিবর্তে দিয়েছেন জুমআ। সুতরাং শনিবারকে মান্য করবো কেনো? আর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে তো ইসলাম নিষেধ করেনি। সত্য বটে, খুব নিকটের না হলেও কিছুসংখ্যক আত্মীয় তো আমার আছে। (ধর্মীয় নয়, তাদের সঙ্গে রক্ষা করি সামাজিক সম্পর্ক)।

এই ঘটনার পর তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এরকম অভিযোগ করতে কে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে? দাসী বললো, শয়তান। জননী সাফিয়া নির্বাক হয়ে গেলেন। তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন।

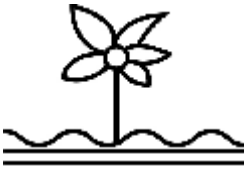
হজরত ওমরের শাসনকাল শেষ হলো। তৃতীয় খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রা.। বেশ কয়েক বছর শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে শাসিত হলো দেশ। অকস্মাৎ উপস্থিত হলো অশুভ পরিস্থিতি। একদল হতভাগ্য সৃষ্টি করলো ফেতনা। তারা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে হয়ে গেলো চরম উচ্ছৃঙ্খল। মহামান্য খলিফার বাড়ি ঘেরাও করলো তারা। মান্যবর খলিফার এ অবস্থা দেখে হজরত সাফিয়ার জননীহৃদয় কেঁদে আকুল হলো। তিনি খাদ্য-পানীয় সরবরাহবিচ্যুত খলিফাকে সাহায্য করবেন বলে দৃঢ়সংকল্প হলেন। তিনি একটি খচ্চরে আরোহণ করে খলিফার গৃহাভিমুখে চললেন। সঙ্গে নিলেন তাঁর এক দাসকে। সে জননী মহোদয়ার অনুগমন করলো। বিদ্রোহীদের একজন তাঁকে চিনে ফেললো। তাই তাঁকে কিছু বললো না বটে, কিন্তু মারতে শুরু করলো তাঁর খচ্চরটিকে। জননী বললেন, ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি। উপায়ন্তর না দেখে তিনি স্বগৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। মহানবী স. এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসানকে ডেকে খলিফার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে বললেন। তাকেই দিলেন খলিফার গৃহে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছানোর দায়িত্ব।

বিদ্রোহীদের হাতে অবরুদ্ধ খলিফা নিহত হলেন। ওই চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন হজরত আলী। মাত্র চার বছর পর তিনিও শহীদ হলেন এক খারেজী আততায়ীর তলোয়ারের আঘাতে। এরপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিলেন হজরত আমীর মুয়াবিয়া। হিজরী ৫০ সন এসে পড়লো। জননী সাফিয়ার বয়স হলো ৬০ বছর। তিনি শুনতে পেলেন অনন্তের আহ্বান। মহাপুণ্যবতী জননী হজরত সাফিয়া চলে গেলেন। চলে গেলেন সেখানে, যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ তাঁর প্রিয়তম স্বামী এবং ততোধিক প্রিয়তম রসুল।

জানাযার নামাজ পড়ালেন হজরত সাইদ ইবনে আস রা.। সমাধিস্থ হলেন জান্নাতুল বাকীতে।

তাঁর বসতবাটিটি তিনি অনেক আগেই দান করে গিয়েছিলেন। অসিয়ত করেছিলেন, রেখে যাওয়া অর্থকড়ির এক ভাগ দিতে হবে তাঁর ভাগ্নেকে। ওই ভাগ্নে ছিলো ইহুদী। লোকেরা অসিয়ত পালনের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হলো। জননী মহোদয়া হজরত আয়েশার কানে একথা পৌঁছানো হলে তিনি সাথে সাথে বললেন, লোকসকল! অল্লাহ্কে ভয় করো। তোমাদের জননীর অসিয়ত বাস্তবায়িত করো।

হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা



মদীনায় হিজরতের পর ঘটনাবহুল ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হলো। মহানবী স. কাবাদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ঘোষণা দিলেন, যারা ওমরায় যেতে চাও, তারা প্রস্তুত হও। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো চারিদিকে। ওমরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন প্রায় পনেরো শত সাহাবী।

মহানবী স. তাঁদেরকে নিয়ে ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ইহরাম বেঁধে নিলেন জুল হোলায়ফায়। 'লাবায়েক লাব্বায়েক' ধ্বনিতে মুখরিত হলো মরুভূমির মুক্ত আকাশ। কাফেলা এগিয়ে চললো। মক্কা থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়ায় যখন কাফেলা পৌঁছলো, তখন সংবাদ পাওয়া গেলো, কাফের কুরায়েশরা ওমরাযাত্রীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। কিন্তু যুদ্ধ করার ইচ্ছাও তাদের নেই। তারা সন্ধি করতে চায়। বিভিন্ন শর্ত আরোপ করলো তারা। প্রথম শর্তটি ছিলো, এবার ওমরা করা যাবে না। আগামী বছর আসতে হবে। সন্ধিচুক্তির অন্যান্য শর্তগুলোও ছিলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। মহানবী স. তবুও সেগুলো মেনে নিলেন কেবল একটি শর্তের দিকে লক্ষ্য রেখে— যুদ্ধ স্থগিত থাকবে দশ বৎসর। চুক্তিবদ্ধ হলে মানুষের রক্তপাত বন্ধ হবে, এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ধর্মপ্রচারের জন্য এরকম শান্তিময় পরিবেশকেই তো স্বাগত জানাতে হয়।

এবার ওমরা করতে পারবেন না বলে সাহাবীগণ দুঃখ পেলেন খুব। কিন্তু আল্লাহ্পাক এমতো ব্যবস্থাকে বললেন বিজয়— 'নিশ্চয় তোমাকে আমি প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম'। তাই হলো। ইসলামের প্রকৃত বিজয় শুরু হলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে।

মহানবী স. মদীনায় ফিরে এলেন। পরের বৎসর ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। চুক্তি ছিলো মুসলমানদেরকে ওমরা সম্পাদনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে দেওয়া হবে মাত্র তিন দিন। মহানবী স. তাই মেনে নিলেন। তখন ইহরাম অবস্থায় তিনি বিবাহ করলেন হজরত মায়মুনাকে। ওমরা সম্পাদন শেষে যখন ইহরাম খুলে ফেললেন, তখন মনস্থ করলেন কমপক্ষে আরো একটি রাত মক্কায় অবস্থান করবেন। বিবাহের ওলীমা করবেন। মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াবেন। নতুন স্ত্রীর সঙ্গে বাসর যাপন করবেন। কিন্তু হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যা আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মহানবী স. এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, হুদায়বিয়া চুক্তি অনুযায়ী আপনার অবস্থানের মেয়াদ আজই শেষ। সুতরাং আপনি মক্কা ছেড়ে চলে যান। তিনি স. বললেন, আমাকে আর একটু সময় কি দেওয়া যায় না? আমি বিবাহের ওলীমা করতাম। সবাইকে দাওয়াত দিতাম। তারা বললো, দাওয়াতের দরকার নেই। আপনি মক্কা ছাড়ুন। মহানবী স. আর দেরী করলেন না। সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনার পথ ধরলেন। প্রায় দশ বারো মাইল দূরে সরফ নামক স্থানে গিয়ে থামলেন। সেখানেই বাসর যাপন করলেন তাঁর নববধূর সঙ্গে।

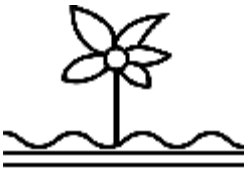
হজরত মায়মুনার স্বামী আবু রুহস ওই বৎসরই মারা গিয়েছিলেন। সে তাঁকে বিয়ে করেছিলো তাঁর প্রথম স্বামী মাসউদ ইবন আমরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর।

বৈধব্যপ্রাপ্তির পর হজরত মায়মুনা তাঁর নিকটজনদের কাছে থেকে পুনঃবিবাহের তাগিদ পেতে থাকেন। তিনি তখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেন তাঁর বড় বোন উম্মে ফজলকে। আর উম্মে ফজল দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাঁর স্বামী হজরত আব্বাসের উপর। তিনি ছিলেন মহানবী স. এর চাচা। তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয় মহানবী স. এর এই সর্বশেষ বিবাহ। মোহরানা নির্ধারণ করা হয় চারশত অথবা পাঁচশত দিরহাম। আর তাঁর কাছে বিবাহের পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলেন হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব। হজরত মায়মুনা তখন ছিলেন উটের পিঠে। শুভ পয়গাম পেয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন, উট এবং উটের উপরে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। বলা হয়ে থাকে, তাঁর এমতো মন্তব্যের পরিপেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াতখানি— 'এবং কোনো মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ।' এভাবে আত্মনিবেদিতা কোনো নারীকে মোহরানা ব্যতিরেকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে কেবল মহানবী স. এর। তাই এই আয়াতের

শেষে একথাটিও বলে দেওয়া হয়েছে যে— 'এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনের জন্য নয়।' (সুরা আহ্যাব, আয়াত ৫০)। কিন্তু দেখা যায়, মহানবী স. আত্মনিবেদনের ঘোষণা দানকারিণী হজরত মায়মুনাকে মোহরানা নির্ধারণ করেই বিবাহ করেছিলেন ।

জননী হজরত মায়মুনা ছিলেন কুরায়েশ বংশের মেয়ে। আরবের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে ছিলো তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁর বৈমাত্রেয় চার বোনের বিবাহ হয় চার বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে। যেমন— বড় বোন ছিলেন হজরত আব্বাসের স্ত্রী, যাঁর ছয় পুত্রও ছিলেন সুবিখ্যাত— ফজল, আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম ও আবদুর রহমান। তাঁর দ্বিতীয় বোন লুবাবা সোগরা ছিলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের মা। তৃতীয় বোন বারযাহ্ ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে আসামের মা। চতুর্থ বোনের নাম হুজালা। তাঁকে ডাকা হতো উম্মে হাফিদ বলে।

তার বৈপিত্রেয় বোনেরাও বিবাহবদ্ধ হয়েছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। যেমন আসমা বিনতে উমাইস ছিলেন হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের পত্নী। মুতার যুদ্ধে তিনি শহীদ হলে তাঁকে বিবাহ করেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তাঁর পরলোকগমনের পরে তিনি পরিণয়াবদ্ধ হন হজরত আলী রা. এর সঙ্গে। হজরত মায়মুনার আর এক বোন ছিলেন শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযা রা. এর সহধর্মিণী।



মহানবী স.কে তিনি যে কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তাঁর আত্মনিবেদনের স্বতঃস্ফূর্ত এই ঘোষণাটি থেকেই বোঝা যায়— উট এবং উটের উপরে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের। তীব্র নবীপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে রয়েছে আর একটি ঘটনা— মদীনার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় এই মর্মে মানত করলেন যে, সুস্থ হলে তিনি বায়তুল মাকদিস মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। বায়তুল মাকদিসে যাবার

প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। জননী মায়মুনা তাঁকে বিভিন্নভাবে বোঝালেন, মসজিদে নববীতে নামাজ যদি পড়ো, তাহলেও তোমার মান্নত আদায় হয়ে যাবে। কারণ এ মসজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের।

মহানবী স.ও তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসতেন নিশ্চয়। কারণ তিনি ছিলেন রূপবতী, দয়াবতী এবং ধর্মনিষ্ঠাবতী। তাঁর ঋতুগ্রস্ত অবস্থাতেও মহানবী স. তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর স্বামী কীরূপ আচরণ করবে, সে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান আমরা তাঁর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। যেমন— ১. হজরত ইবনে আব্বাস ছিলেন তাঁর বড় বোনের ছেলে। একবার তাকে চুল দাড়ি অবিন্যস্ত অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এরকম অবস্থা কেনো বাবা? হজরত ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, আপনার বউমা-ই তো আমাকে পরিপাটি করে রাখে। কিন্তু এখন চলছে তার মাসিক। তিনি বললেন, এ কেমনতরো কথা। রসুলুল্লাহ্ তো এরকম অবস্থাতেও আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকেন। কোরআন তেলওয়াত করেন। আবার আমরা মাদুর উঠিয়ে মসজিদে রেখে আসি। হাতে কি কিছু লেগে থাকে বাবা?

আর একটি ঘটনা— একবার তাঁর এক দাসী হজরত ইবনে আব্বাসের ঘরে গিয়ে দেখলেন, স্বামী স্ত্রীর বিছানা আলাদা করে পাতানো। দাসী মনে করলেন, দু'জনের মধ্যে বনাবনি হচ্ছে না মনে হয়। জিজ্ঞেস করে জানলেন, তা নয়। বরং ঘটনাটা এরকম— স্ত্রী ঋতুবতী হলে স্বামী পৃথক শয্যায় শয়ন করেন। দাসী ফিরে এসে উম্মুল মুমিনীন হজরত মায়মুনাকে কথাটা জানালেন। তিনি বললেন, যাও, তাদেরকে বলে এসো, রসুলুল্লাহ্র রীতিপদ্ধতির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছো কেনো? তিনি স. তো সব সময় আমাদের শয্যায় শয়ন করেন।

শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালন করতেন বিশুদ্ধচিত্ততা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে। এমতোক্ষেত্রে কারো শৈথিল্য প্রদর্শনকে তিনি সহ্যই করতেন না। একবার তাঁর এক নিকটাত্মীয় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তার মুখ থেকে শরাবের গন্ধ বের হচ্ছিলো। তিনি তাকে শক্ত ধমক লাগালেন। বলে দিলেন, আর যেনো সে কখনো তাঁর সামনে না আসে।

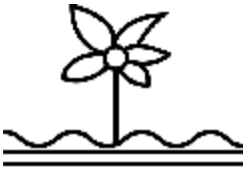
দাসমুক্ত করতে ভালোবাসতেন। একবার এক দাসী মুক্ত করে দিলে মহানবী স. তাঁকে বললেন, তুমি অনেক সওয়াব অর্জন করলে। স্বভাবতই ছিলেন দানশীলা। এজন্য ধারকর্জও করতেন। একবার বেশী পরিমাণে ঋণ করে ফেললেন। এক ব্যক্তি বললো, এতো বেশী ঋণ করলেন যে, শোধ দিবেন কীভাবে? তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে ঋণ পরিশোধের বিশুদ্ধ ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ্ই তাকে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য দান করেন।

জননী আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, হজরত মায়মুনাই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ভীরু এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সর্বাধিক সুসম্পর্ক রক্ষাকারিণী।

মাতা মহোদয়া হজরত মায়মুনা অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। সর্বমোট ৪৬টি, অথবা ৭৬টি। তাঁর কোনো কোনো বর্ণনার মাধ্যমে ঐ বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, তিনি ছিলেন শরীয়তের অনেক গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁর কাছ থেকে যাঁরা হাদিস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ, ইয়াজিদ ইবনে আসাম (এঁরা সবাই তাঁর বোনের ছেলে), উবায়দুল্লাহ আল খাওলানী, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা ইবনে ইয়াসার, নাদবা, কুরাইব, উবায়দা ইবনে সিবাক, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা, আলীয়া বিনতে সুবায় প্রমুখ।

মহানবী স. যখন হজরত মায়মুনাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন, হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ তখনও অমুসলিম। বলা হয়ে থাকে, এই বিবাহ তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে দেয়। এই বিবাহের ফলে মহানবী স. এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হন তিনি। আর নিকটাত্মীয়তার প্রশান্তিময় প্রভাবে তাঁর হৃদয় থেকে অতি দ্রুত নিভে যেতে থাকে শত্রুতার আগুন। এরকম আরো কিছুসংখ্যক কারণে একথা সকলকে স্বীকার করে নিতে হয় যে, মহাসম্মানিতা ও মহাপুণ্যবতী মাতা হজরত মায়মুনার বিবাহ ছিলো অত্যন্ত খায়ের ও বরকতে ভরা।

একবার মহানবী স. হজরত মায়মুনার গৃহে গিয়ে দেখলেন, সেখানে বসে আছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ। তাঁদের সামনে আনা হলো গুঁই সাপের গোশত। হজরত মায়মুনা বললেন, এগুলো পাঠিয়েছে আমার বোন হুযায়লা বিনতে হারেছ। রসুলুল্লাহ্ স. গুঁই সাপের গোশত খাবেন না জানালেন। কিন্তু বললেন, তোমরা খেতে পারো। অন্যরা খেলেন। কিন্তু হজরত মায়মুনা অনুকরণ করলেন মহানবী স. এর। তিনিও খেলেন না। এ ঘটনাটিও একথা প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সর্বক্ষেত্রে মহানবী স. এর একনিষ্ঠ অনুসরণকারিণী।



মাত্র তিন বৎসর চার মাস তিনি মহানবী স. এর পবিত্র রূপ-রস-গন্ধে ভরা প্রকাশ্য ও গোপন সন্নিধানে ছিলেন। হয়েছিলেন প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনী। এই সর্বশেষ নবীপ্রিয়া যখন নবীগৃহে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো ৩৬ বৎসর। আর পৃথিবী পরিত্যাগ করে তিনি চলে যান ৫১ হিজরী সনে ৮০ বৎসর বয়সে।

হজ্বে গিয়েছিলেন। হজ্ব সমাপনের পর সেখানেই ইন্তেকাল করলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের নির্দেশে তাঁকে সরফে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাধিস্থ করা হয় ঠিক ওই স্থানটিতে, যেখানে তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামী শেষতম নবীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিলেন। বাসর যাপন করেছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর জানাযার নামাজ পড়ালেন। খাটিয়া বহনকারীদের উদ্দেশে বললেন, সাবধান! ধীরে ধীরে নিয়ে চলো। মনে রেখো, ইনি ছিলেন নবীপ্রিয়া, তাঁর সহধর্মিণী। খবরদার! ঝাঁকি যেনো না লাগে। আদবের সাথে চলো। মনে রেখো ইনি তোমাদের মা।

তাঁকে কবরে নামালেন হজরত ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওলীদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে খাওলানী ও ইয়াজিদ ইবনে আসাম্ম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

তাফসীরে মাযহারী ২. বোখারী শরীফ ৩. তিরমিজি শরীফ ৪. মাদারেজুন্ নবুওয়াত ৫. শাওয়াহেদুন নবুওয়াত ৬. সাইয়্যেদুল মুরসালীন ৭. সীরাত বিশ্বকোষ ৮. মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা ৯. আসহাবে রসুলের জীবনকথা ১০. মহিলা সাহাবীগণের জীবনাদর্শ ১১. মহানবী ১২. বিশ্বনবী ১৩. বিশ্বনবী মোহাম্মদ ১৪. মহিলা সাহাবী ১৫. বিশ্বনবীর বিবিগণ ১৬. হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ১৭. সীরাতে ইবনে হিশাম ১৮. নাশরুততীব ১৯. সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া ২০. সীরাতে রহমাতুল্লিল আ'লামীন ২১. শানে হাবীবুর রহমান ২২. বিশ্বনবীর বিবিগণ ২৩. ওসওয়ায় রসুলে আকরম ২৪. ফাযায়েলে আমাল ২৫. নবীগৃহ সংবাদ ২৬. হাদিস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান ২৭. রসুলে রহমত ২৮. সিরাতুন্ নবী ২৯. খাছায়িছুল কোবরা ৩০. আর রাহীকুল মাখতুম ৩১. মোস্তফা চরিত।



JONONEEDER JIBONKOTHA

Written by Mohammad Mamunur Rashid
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka.170/- only. US$ 10.

ISBN : 984-70240-0064-3